সুকান্ত স্মৃতি

সুজিতকুমার নাগ
সম্পাদিত

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

সুকান্ত জন্মদিবস

৩০শে শ্রাবণ

১৩৭৭

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১৮-এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

শ্রীদিলীপকুমার চৌধুরী

সরস্বতী প্রেস

১২, পটুয়াটোলা লেন,

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

সূচীপত্র

সুকান্ত স্মৃতি

সুকান্ত ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন সর্বমানুষের জীবনযাত্রার মর্মকথাটিকে সহজভাবে উদ্‌ঘাটিত করিতে কবিকে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতেই হবে।
প্রাচীনের নির্বিকার স্বীকৃতি যখন সমাজের মনকে জড়তায় অসাড় করে তোলে তখন স্বপ্নের যোগনিদ্রা হতে কবিকে জাগাতে হবে।
শেষজীবনে বাংলা কাব্যের এই নবজন্মের জন্যে রবীন্দ্রনাথ প্রতীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তখন ভঙ্গিসর্বস্ব শৌখিন মজতুরি তাঁর প্রত্যাশাকে ব্যঙ্গ করেছিল। এ সম্বন্ধে আমার যেটুকু পড়াশোনা আছে তাতে আমার মনে হয়েছে যে সাধারণ মানুষের প্রাণের গ্লানি সহজ মর্যাদায় প্রথম বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সুকান্তের কাব্যে।
সাধারণ মানুষের জীবনকে সমবেদনায় অন্তর্দৃষ্টিতে দেখবার যে শক্তি সুকান্তের কাব্যের প্রতি ছত্রে অনুরণিত হয়ে উঠেছে সে শক্তি সুকান্ত লাইব্রেরী বিহারিণী সরস্বতীর কাছে পায় নি, সে শক্তি সুকান্ত লাভ করেছিলেন জীবনের পাঠশালায় যার অধিষ্ঠান মাঠে গ্রামে, বস্তিতে মিলে রাজপথে।
আমাদের মধ্যে জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে মুখর করে তোলার তপস্যায় সুকান্ত তাঁর বাঙ্ময় জীবনকে আহুতি দিয়েছেন।
আমি বিশ্বাস করি ইতিহাসের অমোঘ অস্ত্রশালায় এই কবি-দধীচির অস্থিমালা দিয়ে যে বজ্র তৈরী হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে বঞ্চিত মানুষের বুকে তার ক্ষমাহীন নির্ঘোষ শোনা যাবে।

ছোট থেকে বড়ো ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

একটা পাতলা এক্সাইজের বুকের পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা এক গোছা কবিতা।
শক্ত শক্ত ভারী শব্দ।
তার মানে সবাই জানে না। ছন্দে বিলক্ষণ পাকা হাতের ছাপ।

খাতাটা আমাদের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। যার কাছে যায় সেই অবাক হয়। বলে নিশ্চয়ই এর পেছনে বড়দের ক রা হাত আছে।

মনোজ লুকিয়ে লুকিয়ে বেনামীতে কবিতা লেখে নাকি? খাতাটা তার কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। মনোজ কিন্তু প্রবলভাবে মাথা নেড়ে অস্বীকার করে। বলে, দেখছো না নাম লেখা আছে। ও আমার খুড়তুতো ভাই। ক্লাস এইটে পড়ে।

শুনে আমরা বিশ্বাস করি নি।

হেদুয়ার ধারে এক চায়ের দোকানে ছিল আমাদের দিন-দুপুরের আড্ডা। মনোজ একদিন সেখানে সটান তার ভাইকে এনে হাজির করে।

শরীরে যত্ন নেই। রোগা ময়লা চেহারা। মোটা ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটা সলজ্জ হাসি। মুখচোরা হলে কি হয় তার চোখ দুটো যেন সমস্তক্ষণ ডেকে ডেকে কথা বলছে।

যে তার চোখের দিকে তাকাবে সেই বুঝবে এমন কিছু সে দেখতে পাচ্ছে যা আর কারো চোখে পড়ে না।

তাকে দেখলে ভালো না বেসে পারা যায় না।

আমরাও তাই সুকান্তকে সেইদিনই ভালোবেসে ফেললাম।

তখন সময়টা ছিল অন্য রকমের। সবে লড়াই বেধেছে। হাতের শিকল ভাঙার জন্যে সারা দেশ তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় তখন রোজই প্রায় ছাত্রদের মিছিল আর কথায় কথায় ব্যারিকেড্। ঘরের কোণে বসে থাকার সময় নেই।

আমরা ঘর ছেড়ে কেবলি রাস্তায় ঘুরি।

সুকান্তর সঙ্গে তারপর কদিন দেখা নেই। মাঝে মাঝে গোটা অক্ষরে লেখা তার কবিতার খাতাটা মনে পড়ে।

কবিতার ছত্রে ছত্রে তার বিষণ্ণ বেদনা। আমাদেরই মনের কথা। শুধু আমাদের কেন সারা দেশের মনের সুর তখন সেই পর্যায়ে বাঁধা। 'পূর্বাভাস' বইতে সেই কবিতাগুলি আছে।

কে জানতো ছোট্ট সুকান্ত সেদিন একটু দূরে ছোট পা ফেলে রাস্তায় রাস্তায় আমাদেরই অনুসরণ করছিল।

হঠাৎ একদিন অন্নদার পাশে সুকান্তকে আবিষ্কার করলাম। অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য তখন ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক।

বাংলাদেশে তারই উৎসাহে ছোটদের একটা বিরাট সংগঠন গড়ে উঠেছে—'বাংলার কিশোর বাহিনী'।

দেখতে দেখতে সুকান্ত হয়ে উঠল সেই কিশোর বাহিনীর প্রাণ।

সারা কলকাতা সে চষে বেড়ায়। ছোটদের নিয়ে শুধু দল গড়ে না, গান বাঁধে, নাটক লেখে।

দিকে দিকে উৎসাহের বান ডাকায়। দুর্গত মানুষের সেবায় ছোটদের দল নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সুকান্তর কবিতার সুরও সেই সঙ্গে বদলে যায়।

নিজেকে সে আর অসহায় মনে করে না।

দেশের কোটি কোটি মানুষ তার সঙ্গে আছে। তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হতাশার অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে নতুন আশার স্বপ্ন দেখে সে।

ছোটদের পথ দেখাতে গিয়ে বড়দেরও সে পথের নিশানা দেয়।

সুকান্ত ছোট থেকে বড়ো হয়।

একদিন দেখা যায়, সেই কবি কিশোর সারা দেশের হৃদয় জয় করে ফেলেছে।

লোকের মুখে মুখে ফিরছে তার কবিতা।

পৃথিবীর আর কে কোথায় দেখেছে—একটি কিশোরকে হারিয়ে আজও সারা দেশ কাঁদছে।

ভোলা যায় না সুকান্তকে ॥ সরলা বসু

সুকান্তকে জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, এই আজকার সান্ত্বনা।

ও ছিল আমার ছেলে অরুণাচলের অন্তরতম বন্ধু, অন্তরঙ্গতমের পরেও যেন বলতে ইচ্ছে হয়। দীর্ঘ নয়টি বছর ওকে আমরা পেয়েছিলাম, কত রকমে, কত ভাবে। আজ ওকে হারিয়ে সেই স্মৃতির মালা গেঁথে চলেছি।

প্রথম যেদিন ও আমাদের কাছে এল বেলেঘাটা গার্লস হাইস্কুলের বাড়িতে আমার ছেলের জন্মতিথি দিনে, ওকে আমি মিষ্টি দিয়ে কত প্রশ্নই করলাম। একটি কথারও উত্তর দিল না। ওকে অভদ্র মনে করে মনটা আমার বিগড়ে

গেল। সেই থেকে ও আসা-যাওয়া করতো, আমি ওর সঙ্গে আর কথা বলতাম না।

আমার ছেলে দেশবন্ধু স্কুলে একই ক্লাসে পড়তো ওর সঙ্গে। ওর নিত্য নতুন সুখ্যাতিতে ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো।

একদিন স্কুল থেকে এসে আমায় একটা কবিতা দেখালো—একছত্র সুকান্ত একছত্র অরুণাচল এমনি করেই কবিতাটি সম্পূর্ণ করেছে—নাম 'শতাব্দী'।

আমি আগে থেকেই বিগড়ে আছি। তখন বড় 'মিষ্টপন্থী' ছিলাম, ওর কবিতাটুকু কেমন শক্ত লাগল। আমার ছেলে বহু তর্ক করে আমার সাথে পারল না। ও আসা-যাওয়া করতো, আমি উদাসীন ছিলাম। আমার ছেলে একদিন জানালো—ওর মা নেই, আমি উত্তর দিলাম—তবেই মাথা কিনেছেন আর কি। কি যে কিনেছিলেন আজ্ বুঝতে পারছি। আমার দুর্বলতা আমার ছেলে জানতো। ওর বন্ধু সমাগমে বিরক্ত হয়ে উঠলে তাদের ঘরে 'মা' নেই জানিয়ে আমায় জব্দ করতো।

তারপর কলকাতার সাইরেন বেজে উঠল। কাজকর্ম বন্ধ করে পালিয়ে এলাম যশোর জেলার নিভৃত পল্লীতে। আমার ছেলেও এল আমার মধ্যে।

বোমার আতঙ্কে কলকাতা ছত্রভঙ্গ হল। ও চিঠি লিখল; তার একটু মনে আছে—"ওই ধ্বংসলীলার পরে পৃথিবীতে আবার বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে, শুধু তখন থাকবো না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবু জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম।…এই আমার আজকের সান্ত্বনা।

কিছুদিন পরে আমি একা আবার কলকাতায় গেলাম। আমার ছেলের কাছ থেকে ওর ঠিকানাটা নিয়ে গেলাম। ও থাকতো তখন ৩৪ হরমোহন ঘোষ লেনে, আমাদের স্কুল তখন উঠে গেছে অবিনাশ শাসমল লেনে।

সুকান্তকে ডাকলাম।

ছেলেমেয়ে সব বাড়ি রেখে এসেছি। মনটা বড় উদাস। হাসিমাখা প্রসন্ন মুখখানি তুলে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। এর আগে বাড়িতে কি কথায় আমি সুকান্তর অভদ্রতার কথা বলেছিলাম, অরুণ উত্তরে বললে—ও যে কানে শুনতে পায় না মা, তাই তোমার কথার উত্তর দেয় নি। ওর 'পরে বিদ্বেষ কোথায় উড়ে গেল। উজ্জ্বল মুখখানি নিয়ে ও যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, ছেলেমেয়ের বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলে গেলাম। সমস্ত অন্তরের স্নেহ নিঙড়ে দিলাম।

মাতৃহারা অযত্ন-পালিত ছেলেটি আমার স্নেহছায়াতলে। ও ছিল বড় স্নেহকাতর।

আমি 'ছ'টি ফাগুন সন্ধ্যা' নামে একটি গল্প লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওকে দেখালাম। ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। তারপর ওর 'প্রাত্যহিক' ও 'মধুমালতী' গল্প এনে আমাকে দেখালো। 'মধুমালতী' একখানা মলিন কাগজে লেখা; লেখার কাগজেরও ওর অভাব ছিল। 'মধুমালতী'কে গল্প বলা চলে না। ছড়া কাব্য বলতে হয়। আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমার 'ফাগুন সন্ধ্যার' প্রতিরূপ দেখে। মধু যখন বানের জলে ভেসে যাচ্ছে মালতী তখন ব্যাকুল হয়ে মধুকে ডাকছে; মধু স্রোতে ভেসে চলেছে। সেখানে গল্পটি নামের সার্থকতায় পূর্ণ মধুময়। দেখলাম সুকান্তও মধুচক্র রচনা করতে জানে। একমাস তিনদিন স্কুল বাড়িতে ছিলাম। একান্ত কাছে পেয়েছিলাম ওকে। দিনরাত আমার কাছে থাকতো, কতো গল্প করতাম।

বাংলাদেশের পাড়াগাঁ ও দেখে নি, বিহারের পল্লীগ্রাম দেখেছে ও তারই গল্প করতো।

আমি বাংলার পল্লীগ্রামের গল্প করতাম।

আমার মুখে শুনে ও এমন সুন্দর বাংলাদেশের বর্ণনা করতো আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। মা ছিল না। ভাইরা ছোট ছোট, তাই ওকে মাঝে মাঝে রান্না করতে হতো দেখতাম। কতো দুঃখের মধ্যে দিয়েই যে ও কবি হয়ে উঠেছিল। বড় মুখচোরা লাজুক—নিরীহ ছিল ও, কারো কাছে কিছু চাইতে দেখি নি ওকে। খেতে দিলে জোর না করলে ও খেতো না। আমাকে ও বড় ভয় করতো। কারও সঙ্গে চেঁচামেচি করছি দেখলেই ও পালিয়ে যেতো। কিছুক্ষণ পরে এসে বলতো—"আপনার মনটা কি এখন ভালো আছে।"

ওর হাতের লেখা ছিল নির্ভুল।

একটি অক্ষরও ওর কোনদিন পড়ে যেতে দেখি নি।

বেলা বারোটার সময় ও হয়তো এল, আমরা কয়েকজন দুষ্টুমী করে ভাগে গল্প লিখে চলেছি, কেউ সমাপ্ত করবে না। ওর কাছে ধরলাম, ও খস্‌খস্‌ করে লিখে চলল নির্ভুল, কিন্তু সমাপ্ত করলে না আমাদেরই মতো। ওর অসম্পূর্ণ লেখাগুলি সমাপ্ত করা বড়ই কঠিন কাজ।

ওরা চারজন বন্ধু মিলে একটি 'বারোয়ারী' উপন্যাস লিখতো। প্রতি শনিবার একজনের বাড়িতে সেই বইটি পড়ে শোনানো হতো, সেদিন শুনতে হতো আমায়। সব চেয়ে ভালো লাগতো সুকান্তের লেখা। অসুস্থ শরীরেও লিখতো। সে উপন্যাসের কতটা বাকী তাও জানি না।

মুখের ভাষাটি ছিল মার্জিত। স্বভাবটি ছিল বড় নিরীহ। ওর ভাইগুলোও ওর মতো নিরীহ। মাতৃহীনদের দেখলে কষ্টই হয়। সারাজীবন লিখলেও এই নয় বছরের কাহিনী লেখা যাবে না।

সুকান্ত থাকতো নারকেলডাঙ্গা মেন রোডে, আমি থাকতাম বেলেঘাটা মেন রোডে। দিনে তিনবার আমাদের কাছে আসতো। ওর সব কিছু লিখতে যেন আনন্দ হয়। মনে পড়ে ওর দুষ্টুপনার কথা, নিরীহ মুখচোরা সুকান্ত দুষ্টু ছিল এ কেউ বিশ্বাস করবে? ওর দুষ্টুপনা ওর দাদাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত। একবার আসানসোল না কোথায় ঘুরে এল। দাদাদের কাছে বলল ও শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। তাই এসে যখন অরুণের কাছে কি করে দাদাদের ঠকিয়েছে অভিনয় করে দেখাতো, হাসিতে ভেঙে খানখান হয়ে পড়তো। সে কি আনন্দ, সে কি হাসি, হাসির মিষ্টি টুকরোগুলো মিছরির টুকরোর মতো ছড়িয়ে যেতো।
আর একদিনের দুষ্টুপনা; ১৩৫২ সালের ২৬শে ভাদ্র বিকেলবেলা সুকান্ত আমার এখানে এল। আর অরুণের জন্মদিন শুনে চলে গেল। আমি সন্ধ্যাবেলা আসতে বলেছিলাম ও আসতে চায়লে। রাত যখন দশটা, বেশ বৃষ্টি পড়ছে এমন সময় ওর ভাই মুকুল এসে হাজির। হাতে তার একখানা লেনিনের জীবনী আর সুদৃশ্য সাবানের বাক্স। ও জিনিসগুলো আমার হাতে দিল। বইখানি রেখে বাক্সটি খুললাম। বাক্স মধ্যে কাগজ কুচিকুচি করে দেওয়া। কাগজগুলি তুলে দেখি তার তলায় শুয়ে আছেন রামচন্দ্রের সহচর হনুমান মূর্তি। মূর্তিখানি মাটির, দেহটি সোনার। আমি তুলে ধরে পিছনের কাটি দুটো ধরতেই হনুমানটি তিড়িং তিড়িং করে নাচতে ও কিচির-মিচির করে ডাকতে শুরু করল। সেকি হাসির তরঙ্গ বইল।
মুকুলের কাছে শুনলাম, অসুস্থ শরীরে জলে ভিজে কোন মেলা থেকে সংগ্রহ করে এনেছে।
ওর শেষ দুষ্টুমি করুণ। বারো মাসেই আমার প্রায় কাশির অসুখ। হঠাৎ একদিন আমার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে লাগল। মন খারাপ, 'এক্সরে করা হবে।' সিঁড়ির কাছে বসে আছি। সুকান্ত হন্‌হন্‌ করে উপরে উঠে এল। আমার কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করল—বললাম। তারপর আমার কাছ থেকে ওকে সরে দাঁড়াতে বললাম—থুতু লাগবে। ও আমার সঙ্গে দুষ্টুপনা করে পিছন পিছন ঘুরতে লাগল।

রাগ করে বারান্দায় রেলিং ধরে মুখ ফিরিয়ে থাকলাম। ও আমার গা ঘেঁষে মুখের কাছে মুখ তুলে থাকল, আমার কিছু হল না, ও চলে গেল।
কানে কম শুনতো, ছোট করে বাজে কথা বলে দুষ্টুমি করতাম। ও বুঝতে পারতো না। কেবল একটা কথা কতো ছোট করে বলতাম ও বুঝতে পারতো—
"সুকান্ত তুমি বড় কালা।" ও অভিমান করে বলতো "তা আমি জানি।"
সারাজীবন লিখলেও সুকান্তর কথা ফুরাবে না; তবু কয়েকটি কথা না লিখে যেন পারছি না। ও প্রায় দিন মেজদার কাছে শ্যামবাজারে থাকতো। সেখান থেকে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে গিয়ে রাত হয়ে যেতো, মিটিং থাকলে তো কথাই নেই। ওদের বাড়িতে রাত দশটার পর দরজা খোলার নিয়ম ছিল না। আমি বলে দিয়েছিলাম, 'রাত্রি যতই হোক সুকান্ত, আমার কাছে এসো।' ও প্রায় প্রতিদিন অরুণের কাছে রাত্রে থাকতো।
একটি ধারা শ্রাবণের রাত্রি।
একবার থামছে, আবার সজোরে বৃষ্টি আসছে। রাত বারোটা। আমি আর অরুণ ভাত খাওয়ার পর গল্প করছিলাম। সবাই ঘুমিয়েছে। ও বৃষ্টিস্নাত হয়ে ঘরে ঢুকল। অরুণ তাড়াতাড়ি করে ওর গা মুছে জামা ছাড়িয়ে মাথা মুছে দিল। এখন ওকে খেতে দেব কি? হাঁড়িতে মাত্র মুঠো দুই ভাত; আর কিছুমাত্র উপকরণ নেই। বড় চিন্তায় পড়লাম। কতকালের একটু ঘি ছিল, হয়তো কটু হয়ে গিয়েছিল, তাই দিয়ে মেখে দিলাম। দুটি দুটি করে কোন রকমে ও খেয়ে ফেলল। ওর মুখচোরা স্বভাবের জন্য একটুও যত্ন করতে পারি নি কোনদিন। তার পরদিন বৃষ্টি আর ছাড়ল না। ওকে অরুণ জোর করে রেখে দিল। কি যে গেয়েছিল মনে নেই। সুকান্ত রবীন্দ্রসংগীতের সুর বেশ জানতো। কিন্তু নিজের গলায় সুর ওর ছিল না। ও কেমন একরকম সুরে গাইতো, যেমন ছোট ছেলেরা গান করে। ওর গান শুনলে বড্ড হাসি পেতো।
সন্ধ্যাবেলা সুকান্ত গান ধরল রবীন্দ্রসংগীত। শ্রাবণ মেঘে ঘনায়মান; সন্ধ্যা নামছে। ও ওপরের দক্ষিণ ঘরের চৌকিতে বসে সময়োপযোগী গান গাইছে। বারান্দার একখানা কাপড় পতাকার মতো দখিন হাওয়ায় উড়ছে। কাপড়টার উপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়া। গানের সুর ঢেউয়ের মতো ভেসে চলেছে—সঙ্গে আমার মনও।
তার পরদিন দুপুরবেলা ও আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মনটা অ-জানা ব্যথায় ভরে গেল, ও একটু দূরে যেতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ল।

আমি ছুটে অরুণের কাছে গেলাম, বললাম—ও ভিজে গেল।

অরুণ উত্তর দিল—'আমি ভিজে তো ওকে রক্ষা করতে পারব না মা, ও কোথাও দাঁড়াবে।'

আমি ব্যাকুল হয়ে ছুটে উপরের বারান্দার দিকে গেলাম।

সুকান্ত তখন রাস্তার মোড় ঘুরছে। নীল জামা পরা রোগা ছেলেটি।

তারপর কতদিন দেখা হয়েছে। দিনরাতই সে আমাদের কাছে থাকতো, তবু সে স্মৃতিগুলি ঝাপসা কতো বেদনাময় স্মৃতির টুকরো আজ ভেসে ওঠে। অরুণেরও যেমন আর্থিক অসচ্ছলতা ওরও তেমনি। যদি কোনক্রমে ওদের চারটি পয়সা হতো দু'পয়সার চানাচুর ভাজা সে বন্ধুকে খাইয়ে খুশী হতে হতো, নয় চার পয়সার বাস ভাড়া। এমনি তাদের আদান প্রদান, তাতেই ওরা খুশী। সাড়ে তিন বছর ধরে সুকান্ত নানা রোগেই ভুগছিল। একটু যত্ন করবারও কেউ ছিল না। ভাইগুলোকে উপদেশ দিতাম ওর খাবারটার 'পরে নজর করবে। যখন অরুণের মুখে শুনলাম ওর টি. বি. হতে পারে ডাক্তাররা শঙ্কিত হয়েছেন, তখনি জেনেছিলাম ও আর বাঁচবে না।

এগারোই ফাল্গুন দেশে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। অরুণ একখানা পোস্টকার্ডের একাংশ আমার কাছে ধরল, বলল, মা তুমি ওকে কিছু লিখবে ?

ও আমাকে চিঠিতে 'মা' বলেই সম্বোধন করতো ; মুখে কিছুই বলতো না।

আমি ওকে বলতাম 'সাজানো চাচা'—'সংবাবা' বলতাম। ছোট ছেলেপুলে নিয়ে ওদের কাছে বিপন্ন মেয়েটির মতোই লাগতো। পোস্টকার্ডের একাংশে লিখলাম—'বাবা, তোমার রোগশয্যার পাশে আজ মায়ের মতোই যেতে মন চাইছে।' ও আমায় দু'খানি শেষ চিঠি দিয়ে গেছে।

চলায়মান জীবনে পাওয়া শ্রেষ্ঠ মণিটি হারিয়ে গেল। এ যে বনস্পতি মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিল বড় সাধ ছিল বড় আশা ছিল তার বিপুল সম্ভাবনার সম্পূর্ণতা দেখবার।

সরলা বসুকে লিখিত সুকান্তর দুইখানি চিঠি

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

মা, প্রথমেই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখা ভালো। কারণ, অপরাধ আমার অসাধারণ—বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে আপনার-সপক্ষে। আজ আমার প্রতিবাদ করবার কিছুই যখন নেই, তখন এই উক্তি আপনার কাছে মেলে ধরেছি যে, পারিবারিক প্রতিকূলতা আমাকে এখানে আবদ্ধ করে রেখেছে, নইলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার অপরাধ যে হয়েছে, সেটা অনস্বীকার্য। তবু উপায় যখন নেই; তখন ক্ষমা ভিক্ষা করা ছাড়া আমার গতি রইল না। বাড়ির কেউ আমার এই দুর্দিনে চোখের আড়াল করতে চায় না। অথচ এখানটাও যে নিরাপদ নয়, সেটা ওরা বুঝতে পারে এবং পেরেও বলে, মরতে হলে সবাই একসঙ্গে মরবো। কী যুক্তি? আসল ব্যাপার হচ্ছে সমূলে বিনাশ হলেও আমি যেন না এই সংসার-বৃক্ষচ্যুত হই।

······যেখানে যাই, সেইখানেই দেখি কুশ্রীমলিনতা—এক দুর্নিবার গ্লানিতে আমি ডুবে আছি। আপনাকে এতো কথা বলছি, এর কারণ আপনার কাছে সান্ত্বনা, আরাম চাই বলে; আপনার আশীর্বাদ চাই যাতে এই দূষিত আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারি। আজকাল আপনাকে খুব বেশী করে—এই সময়ে আপনার পবিত্র সান্নিধ্য পেলে আমি নিজেকে এতোটা অসহায় মনে করতুম না—এই কথা ভেবে মনে পড়ে। চিঠি লেখার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই।

বাস্তবিক, আমি কোথাও চলে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে মিলিয়ে যেতে চাই··· কোন গহন অরণ্যে কিংবা অন্য যে-কোন নিভৃততম প্রদেশে; যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট-মনা হিংস্র আর নিরীহ জীবেরা. আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এতোরও দরকার নেই, নিদেনপক্ষে আপনাদের ওখানে যেতে পারলেও গভীর আনন্দ পেতাম, নিষ্কৃতির বন্য আনন্দ। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার—নিবিড় অসহযোগ চলেছে। এই পার্থিব কৌটিল্য আমার মনে এমন বিস্বাদনা এনে দিয়েছে, যাতে আর আমার প্রলোভন নেই জীবনের ওপর।···অননুভূত অবসাদ আমায় আচ্ছন্ন করেছে। সমস্ত পৃথিবীর উপর রুক্ষতায় ভরা বৈরাগ্য এসেছে বটে, কিন্তু ধর্মাভাব জাগে নি। আমার রচনাশক্তি পর্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে মনের এই শোচনীয় দুরবস্থায়। প্রত্যেককে ক্ষমা করে

যাওয়া ছাড়া আজ আমার অন্য উপায় নেই। আচ্ছা, এই মনোভাব কি সবার মধ্যেই আসে এক বিশিষ্ট সময়ে ?
যাক, আর বাজে বকে আপনাকে কষ্ট দেবো না। আমার আবার মনে ছিল না আপনি অসুস্থ। আপনার ছেলে কি পাবনায় গেছে ? তাকে একটা চিঠি দিলাম। সে যদি না গিয়ে থাকে, তবে সেখানা দেবেন এই বলে যে, 'এ-খানাই তোমার প্রতি সুকান্তর শেষ চিঠি।'
আচ্ছা কিছুদিন আগে একখানা চিঠি (postcard) এসেছিল। চিঠিখানার জায়গায় কাগজ মেরে দেওয়া হয়েছিল আর তার ওপর ঠিকানা লেখা ছিল। সেই চিঠিখানা বেয়ারিং হয়। সে-খানা কি আপনাদের কারুর চিঠি। বেয়ারিং করার মূর্খতার জন্য চিঠিটা আমি না-রেখে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ; তবে সে-খানা আপনাদের হলে অনুতাপের বিষয়। আপনাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা আছে সর্বক্ষণ, তবে সুযোগ পাওয়াই দুষ্কর। আর সুযোগ পেলেই আমায় দেখতে পাবেন আপনার সমক্ষে। চিঠির উত্তর দিলে খুশী হবো ! না দিলে দুঃখিত হবো না। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। এখানকার আর সবাই ভালো।

ইতি।

শ্রদ্ধাবনত—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সর্বাগ্রে আপনার ও অপর সকলের কুশল প্রার্থনীয়।—

সুঃ ভঃ

২

কলকাতা

শ্রদ্ধাস্পদাসু
মা, আপনার ছোট্ট মৌচাকটি আমার হস্তগত হল। কিন্তু কৃপণতার জন্য দুঃখ পেলাম।
আপনি আমায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন। আপনার আগ্রহ আমায় লজ্জা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি যেতে পারছি না বলে। আপনার আগ্রহ উপেক্ষা করতে পারবো বলে মনে হয় না। আমার মুর্শিদাবাদে যাবার ইচ্ছা নেই। তবে ঝাঁঝায় যাবার কথা হচ্ছে দাদা-বৌদির—সেখানে যেতে পারি। তবে আপনাদের ওখানকার আমন্ত্রণ সেরে। সেদিন আপনাদের ট্রেইনখানা আমার

সামনে দিয়ে গেল, পিছন থেকে অমূল্যবাবুকে দেখেছিলাম আর দেখেছিলাম আপনার কয়েকজন সহযাত্রীকে, কিন্তু আপনাকে দেখলাম না দুঃখের বিষয়।… কিছুদিন মনে হতো, আজ সন্ধ্যায় কোথাও যেতে হবে না! আজকাল সে-ভাব থেকে মুক্ত। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন? আপনি আমার—যাক কিছুই জানাবো না।

…এমন একজন যে আপনার বাবা হতে পারবে না; কারণ তার বড় ভয়, পাছে সে বাবা হলে বাবার কর্তব্য হতে বিচ্যুত হয়। আর আপনার 'অরুণ'—বাবাটি তো মেয়ের আবদারে নাকি কলের পুতুল ব'নে আছে। সুতরাং উল্টোটাই হোক। আপনার কৃপণতার প্রতিশোধ নিলুম ছোট চিঠি দিয়ে। ইতি—

—সুকান্ত

সুকান্ত কথা ।। মৃণাল সেন

"বুকের ব্যথায়, চোখের জলে মাতৃহীনের কর্মক্লান্ত মুখখানা এঁকে রেখেছি। কতদিনের কত কথা। কতটুকুই বা মনের কোঠায় ধরে রাখতে পেরেছি।"

ওপরের কটি কথা শ্রদ্ধেয়া সরলা বসু 'আমার কাছে সুকান্ত' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

সুকান্তকে তিনি কাছে থেকে দেখেছেন, সরলা বসু নিজেই বলেছেন, 'সুকান্তকে জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—এই আজকের সান্ত্বনা। ও ছিল আমার ছেলে অরুণাচলের অন্তরতম বন্ধু।'

কিশোর কবি সুকান্তকে আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু তাঁকে আমরা না দেখলেও, তাঁকে জেনেছি তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে। তাঁকে চিনেছি তাঁর বিস্ময়কর জীবনের ঘটনা দিয়ে।

ছন্নছাড়া এক বাউল কিশোর সুকান্ত তাঁর জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন সত্য আর সুন্দরকে। তাই বুঝি কবি নিজেই নিজেকে চিনতে পেরে বলেছিলেন:

"আজন্ম দেখেছি আমি আশ্চর্য নতুন এক চোখে
আমার সোনার দেশ, আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।

আমার সম্মুখে ক্ষেত, এ প্রান্তরে উদায়স্ত মাটি
ভালবাসি এ দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি।"

কিংবা,

"ভারতী তোমার লাবণ্য দেহ ঢাকে,
রৌদ্র তোমায় পরায় সোনার হার ;
সূর্য তোমার শুকায় সবুজ চুল,
প্রেয়সী, তোমার কত না অহংকার।"

অথবা তাঁর সেই প্রতিধ্বনি, যা দেশ কাল স্থানকে অতিক্রম করে ধ্বনিত হল কিশোর কবির কণ্ঠে :

"অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে,
জানি তারা মুখরিত হবে না অরণ্যের গানে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ় প্রাণ প্রত্যেক শিকড়
শাখায়-শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়,
ফল দেবো, ফুল দেবো, দেবো আমি পাখীরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।"

সুকান্তর সেই জীবন-চেতনার মূলে ছিল তাঁর বিশাল মন। সহজ সরলতার এক ছবি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দেখা গিয়েছে।

কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করি :

দেশ থেকে ফিরে এসেছেন সরলা বসু। সুকান্তর সঙ্গে আবার দেখা হল। সরলা দেবী সুকান্তকে ছেলের মতোই দেখতেন। সুকান্ত ঘুরে ফিরে সারাদিনই সরলা দেবীর বাড়িতে আসতেন। প্রত্যেক সন্ধ্যায় কত গল্প করে কাটিয়ে গেছেন সুকান্ত। সুকান্ত তার নিজের লেখা পড়তেন। সরলা দেবী পড়তেন তাঁর গল্প। মা ও ছেলের এই সাহিত্য সাধনা আগামীকালের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। সরলা বসু নিজেও একজন বিশিষ্ট মহিলা কথা-সাহিত্যিক। তাঁর রচিত কিশোর গ্রন্থ ও বড়দের জন্য উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

যাক প্রসঙ্গে আসা যাক…।

সরলা বসু একদিন সুকান্তকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সুকান্তকে খেতে দিলেন সরলা দেবী। সুকান্ত খেয়ে যাচ্ছে, দেখেন সুকান্তর ফরসা কাপড়টার ভাঁজে ভাঁজে সুরকির গুঁড়ো মাখা।

সরলা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, ও কি সুকান্ত ?

বিনয়ের সঙ্গে মাথা নীচু করে সুকান্ত বললেন, কিছু না। রাস্তা থেকে লেগে গিয়েছিল।

ঐ ঘটনাটা কেন্দ্র করে সরলা বসু লিখেছেন : 'মাঝে মাঝে সুকান্ত বড় নম্র ও বিনয়ী হতো।'

সুকান্ত তখন বেলেঘাটার দেশবন্ধু স্কুলে পড়তেন। সুকান্তর পরীক্ষার খবর জানতে চাইলেন সরলা দেবী। সুকান্ত সব নম্বর বললেন, একমাত্র অঙ্কের নম্বর ছাড়া।

শেষ পর্যন্ত সুকান্তকে বলতেই হল, অবশ্য মুখ নীচু করে বিনয়ের সঙ্গে 'ফাইভ'। সুকান্তর এই সরলতা এই সহজতা সরলা দেবীকে মুগ্ধ করেছিল তাই তাঁকে তিনি নিজে চেনামাত্রই ছেলের আসনে বসিয়েছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুকান্তও তাঁদের কথাও ভেবেছিলেন।

১৩৫০ সালের মাঘ মাস। বেলেঘাটা মেন রোডে সরলা দেবী থাকতেন। আর সুকান্ত আসতেন নারকেলডাঙ্গার বাড়ি থেকে। সরলা দেবীর নিজের কথায় শুনুন :

"সেই মাঠকোঠায় তিনটি বছরের ওর অনেক স্মৃতি ধরা আছে মনের পাতায়। অরুণাচল অনেক সময় বাসায় থাকতো না। ও আমার কাছেই বসতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওর নিরুদ্বিগ্ন শান্ত স্বভাবটি বড় ভালো লাগতো।

আমার মেয়ে নাচতো। তার জন্যে কাব্যে নৃত্য কথিকা রচনা করতাম। সুকান্ত আমাকে তাই দেখে গদ্য-কবিতা লেখা শেখাবেই। নানারকম উপদেশ, কতরকম লেখানো পড়ানো···

আমার লেখা এমনি একটা নৃত্য কথিকা কবিতা করে সাজাবার জন্য সুকান্ত নিয়ে গেল। কিছুদিন পরে ভাবলাম, ও মনভোলা মানুষ, হয়তো ছেঁড়া কাগজের টুকরোটুকু হারিয়ে ফেলেছে।

একদিন হঠাৎ এসে ওর হাতের সেই সুন্দর সাজানো লেখাটি ফেরত দিয়ে গেল। আজও লেখাটি তেমনই আছে আমার কাছে।

সুকান্তর একটি বিশেষ পোশাক ছিল। সেটি প'রে প্রায়ই শ্যামবাজার বা বাইরে কোথাও যেতো। নইলে কোঁচায় সুরকি, আধময়লা নীল জামাতেই চলতো।

একবার সুকান্তর 'অভিযান' নাটকটি অভিনয় হবে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন হলে। বেলেঘাটার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অভিনয় করবে। আমাকে যাওয়ার জন্য ও বলে গেল। সেদিন আমি আবার করেছি তালের পিঠে। খাওয়া-দাওয়া

সেরে তালের পিঠে বার্লির কৌটোয় ভরে নিয়ে অরুণাচলের সঙ্গে চললাম ওদের নাটক দেখতে।
গেটের সামনেই সুকান্তকে পাওয়া গেল; সেই বিশেষ পোশাকটি পরা ওর আনন্দিত কিশোর মূর্তি। তালবুরি খাওয়ালাম ওকে…"

ভাদ্র মাসের একটি দিন। প্রথম দাঙ্গার কয়েকদিন আগে মাঠকোঠার উপরে বসে সরলা দেবী নারকেল নাড়ু তৈরি করছেন।
নিচে নেমে এসে দেখেন তাঁর ছেলে অরুণাচল চেয়ার টেবিলে বসে ছবি আঁকছে আর সুকান্ত তক্তাপোশের উপর চুপচাপ বসে রয়েছে। সুকান্ত যে কখন এসেছে তা কিছুই জানতেন না সরলা দেবী। নারকেল নাড়ুটি সযত্নে হাতে তুলে দিলেন। সুকান্ত পরম আগ্রহে খেতে শুরু করলেন।
এ প্রসঙ্গে সরলা বসু লিখেছেন, "এমনি সাগ্রহে ওকে কোন খাবার নিতে দেখি নি কোনদিন।…আমার হাতে সুকান্তকে এই শেষ খাবার।"
সুকান্তর সঙ্গে শেষ দেখা প্রসঙ্গে সরলা বসু বলেছেন :
"আমি মাঠকোঠা ছেড়ে রাস্তার ওপাশের একতলা বাড়িটা ভাড়া নিলাম। প্রথম দাঙ্গার পর দ্বিতীয় দাঙ্গা শুরু হল ওই বাড়িটায় যাওয়ার পর। 'আল্লা হো আকবর' 'বন্দেমাতরম্' মুখরিত তখন কলকাতা শহর। যত না দাঙ্গায় মরছে মানুষ, তার চেয়ে বেশী মরছে মানুষ মিলিটারী গুলিতে।
বেড়াল-কুকুরের মতো রাস্তায়, অলিতে-গলিতে মৃতদেহ। ভয়ে পালিয়ে গেলাম বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে।
পরে দাঙ্গার অবস্থা কিছুটা শান্ত হল। আমরা আবার বাসায় ফিরবো মনস্থ করছি, এমনি দিনে সুকান্ত এল। 'রেড এড্ কিওর হোমের' হাসপাতাল থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেল।—রোগা, পা-জামা পরা ঢেঙা চেহারা। মুখখানা একফালি লম্বা, বিবর্ণ…এই আমার শেষ দেখা।
আমরা দেশবন্ধু স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরলাম। তখন দাঙ্গা থেমে গেছে, কিন্তু সন্ধ্যা ছ'টা থেকেই কারফিউ। এই সান্ধ্য আইনের জন্য বেলা থাকতে বেলেঘাটা মেন রোডে যাতায়াত বন্ধ।
কি জানি, কি রান্না নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত আছি। দরজায় যেন কে জোরে কড়া নাড়ল। খানিকক্ষণ চুপচাপ। তখনো আমাদের বাড়ির লোকেরা ঘরে ফেরে নি। কড়া নাড়াটা ভালো মনে করলাম না।

অনেক সময় দুষ্টু ছেলেরা অমনি কড়া নাড়তো।
আবার ছোট্ট কড়া নাড়ার শব্দ। এবার মেয়ে দরজা খুলে দিল।
কে যেন খুব ছোট্ট গলায় কি বললে, তারপর বাইরের ঘরটায় এসে ঢুকল।
একটু পরেই কিন্তু আমার মেয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে এল।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ?
ও বললে, সুকান্তদা।
আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না ?
ও উত্তর দিল, সুকান্তদার শরীর খারাপ মা, দাদাকে একটা চিঠি লিখে রেখে গেল।"

রোগশয্যায় শায়িত সুকান্ত।
সরলা বসু লিখছেন, "আজ মায়ের দাবি নিয়েই তোমার রোগশয্যার পাশে যেতে মন চাইছে, বাবা।…"
যাদবপুর হাসপাতালে সুকান্ত।
প্রহর গুণছেন। মুক্তির না মৃত্যুর, কে জানে ?
কিশোর কবির চোখে তখন কি ভেসে ওঠে :

> "আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ উড়িয়া যায়
> তবুও পড়িবে মনে,
> চঞ্চল হাওয়া যদি ফেরে হৃদয়ের আঙিনায়
> রজনীগন্ধা বনে
> তবুও পড়িবে মনে।"

অথবা কে জানে কি ভেবেছিল সে ?
মৃত্যুপথযাত্রী সুকান্ত।
অরুণাচল লিখলেন মাকে—"মা, অযত্ন পালিত, মাতৃহারা ছেলেটি আজ চলে গেছে। টি.বি. হাসপাতালে আর যেতে হবে না।"

ভাগ্যের পরিহাসে সরলা বসু এলেন যাদবপুরে।
জীবনের সমস্ত স্মৃতিকে সঞ্চয় করে সুকান্তর কথা লিখতে গিয়ে তিনি বলেন :
"তারপর আমিই এলাম যাদবপুরে। এত বছরের ভ্রাম্যমাণ জীবনে যত জায়গায় ঘুরেছি সেখানেই আমার সুকান্ত। শুধু আসে নি যাদবপুরের এই নূতন

বাড়িতে। তবু এখানকার বাতাসেই মিশে আছে তার সুকোমল প্রদীপ্ত নিঃশ্বাস আর ঐ নীল ঘন আকাশে ফুটে আছে কিশোর কবির অন্তহীন চাহনি।”

২৫।৩।১৯৪৭ তারিখে শ্যামবাজার থেকে সুকান্ত একটা চিঠি লিখলেন সরলা দেবীকে, লিখলেন :……“দিন সাতেকের মধ্যেই হাসপাতালে যাবো।”

৮।৪।১০৪৭ তারিখে যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল থেকে বন্ধু অরুণাচলকে সুকান্ত চিঠি লিখলেন : সাতদিন হয়ে গেল এখানে এসেছি। সারাদিন চুপ চুপ কাটাতে হয়।……এখানে লেডি মেরি হার্বার্ট ব্লক এ নম্বর বেডে আছি।

এ চিঠি লেখার এক মাস পাঁচদিন পর ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে বেলা ১০টার সময় যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে সুকান্তর জীবনলীলা শেষ হয়।

সুকান্ত চলে গেলেন।

কিন্তু যে কিশোর কবি একদিন এ মাটির পৃথিবীতে এসে আমাদের মনের কাছাকাছি এসেছিলেন, তিনি চলে গেলেও হারিয়ে যান নি।

আমরা তাই সুকান্তর কাছাকাছিই আছি।……

সুকান্তর সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ সাতটা বছর সুকান্তকে কাছে পাবার সুযোগ হয়েছিল অরুণাচল বসু ও তাঁর মা শ্রদ্ধেয়া সরলা বসুর। তাঁরা তাঁদের স্মৃতিকথা লিখে গেছেন ‘কবি কিশোর সুকান্ত’ নামক গ্রন্থে।

সেই গ্রন্থের এক জায়গায় সরলা বসু লিখেছেন : চলায়মান জীবনের পাওয়া শ্রেষ্ঠ মণিটি হারিয়ে গেল। যে বনস্পতি মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিল, বড় আশা ছিল তার বিপুল সম্ভাবনার সম্পূর্ণতা বোঝার।

তাই সুকান্ত আজ সকলের, সমস্ত জনতার কাছে আজ সুকান্ত এক হয়ে গিয়ে, আমরাও সুকান্তের কাছাকাছি আছি, থাকবও চিরদিন।……

সুকুমার আর সুকান্ত ॥ অশোক গুহ

কুণাল আগে কখনো কবি দেখে নি।

সেই প্রথম দেখলে।

ক্লাসে বসে আছে। আসেন নি তখনও অধ্যাপক। এমন সময় ফুটফুটে ফরসা

একটি ছেলে এসে ঢুকল। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, বোতাম সবগুলো খোলা। গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে। সালোয়ার ধরনের কাপড় পরা, উস্কখুস্ক এক মাথা চুল। চোখে টেপা চশমা আর মুখে ক আছে কুণাল ভেবে পেলে না। বুঝিবা সে তরুণ মনেরই আলো। সবাই বলে উঠল, আরে কবি যে এস। এস। আজ কি ক্লাসে থাকবে?

ছেলেটি বললে, না ভাই, এখুনি পালাব।

এই বলে প্রক্সির বন্দোবস্ত করে হন্‌হন্ চলে গেল।

কুণাল পাশের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলে, কে?

সে অবাক হয়ে বললে, জান না? ও আমাদের কবি সুকুমার।

কে—সুকুমার সরকার?

হ্যাঁ।

কুণাল কবি আর কবিতার ভারী ভক্ত। সুকুমারের কবিতা সে 'প্রবাসী'তে পড়েছে, 'বিচিত্রা'য় পড়েছে। আরো কত জায়গায় যে পড়েছে তার কি ঠিক আছে? চমৎকার লোক। সেই সুকুমার কিনা তার সহপাঠী। সেদিন বাড়ি ফিরে সে রাঙাদিকে বললে, জান রাঙাদি, আমাদের সঙ্গে পড়ে কবি সুকুমার।

সুকুমার ক্লাসে কালে-ভদ্রে আসে। এক মিনিট থাকে; আবার চলে যায়। তবু কুণাল আলাপ করে নিলে। আলাপ জমে উঠল। কলেজে দেখা হোক না হোক, একদিন সুকুমার ঝোড়ো হাওয়ার মতো হাজির হয় গিয়ে ওর বাড়িতে। তারপর কত গল্প। কুণালও সহজ হয়ে গেছে। সে বলে, কেন ওসব কবিতা লেখ? কেন কামনার কথা বল—কেন নিজেকে কামনার কাপালিক বলে জাহির কর সুকুমার?

সুকুমার বলে, আমাদের জীবন তো কামনা দিয়ে গড়া, তাই বলি।

কুণাল বলে, তা নয়, ওটা তোমাদের ফ্যাশন। জীবনের মানে ও নয়।

সুকুমার উদাস হয়ে বলে, অন্য মানে তো জানি না ভাই।

এই মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের বন্যা বয়ে গেল সারা ভারতে। কলকাতায় ও বন্যায় গা ভাসিয়ে দিলে। শিক্ষা নিকেতন না গোলামখানা। তাই কলেজে কলেজে শুরু হল পিকেটিং। পার্কে পার্কে আইন অমান্যের পালা। নিষিদ্ধ বই পড়ে আইন ভাঙছেন নেতারা, ছাত্রেরা মিছিল করে চলেছেন জেলে। সুকুমার এমন সময় কুণালের বাড়িতে এসে একদিন হাজির।

এসেই বললে, কুণাল, আমি জেলে যাব।

কুণাল অবাক হয়ে গেল, জেলে যাবে কেন ?

সুকুমার যেন জ্বলে উঠল, কেন যাব ? কেন তোমরা যেতে পার, আমি পারি না ? তারপর উদাস হয়ে বললে, আমি জীবনের মানে খুঁজতে চাই।

এই বলে চলে গেল।

কুণাল কাগজ পড়লে, সুকুমার জেলে গেছে। জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, সে শহরেও একদিন গেল। কিন্তু সুকুমারের খোঁজ নেই। একদিন এক বন্ধু এসে বললে, জান, সুকুমার জেলে বসে দেশের কথা নিয়ে কবিতা লিখতো।

কুণাল বললে, তাতো লিখবেই। ও যে জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে জেলে গিয়েছিল। পেল কিনা কে জানে ?

তারপরেও ক'বার দেখা হয়েছে।

চরম অভাব তখন সুকুমারের। কবিতা লিখছে। মাসিক পত্রের অফিসে অফিসে ফেরি করতে যাচ্ছে। কবিতার কেউ তো পয়সা দিতে চায় না। কেউ বা এক টাকা, আট আনা দিচ্ছেন। কুণালও ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে যেত।

একদিন সুকুমার বললে, এবার আমি গল্প লিখব, তাহলে টাকা পাব। গল্প একটা লিখেও ফেললে।

তারপর আর দেখা নেই।

শেষে কুণাল খবর পেল, হাসপাতালে সুকুমার মৃত্যুশয্যায়।

কুণাল দেখতে ছুটল, কিন্তু সব শেষ হয়ে গেছে।

সুকুমার জীবনের মানে খুঁজতে চেয়েছিল, সময় পেলে না।

অনেকদিন পরের কথা। এই তো সেদিনের কথা।

কুণাল তখন আর ছাত্র নয়, মস্ত কাজের মানুষ না হলেও কাজ করে এক পত্রিকায়। আবার পত্রিকাটিও প্রগতিপন্থী। একদিন সেইখানেই এক বন্ধু নিয়ে এলেন একটি ছেলেকে।

বয়সে একেবারে কচি। নিরীহ ছেলে। জামা কাপড়ে কোন পারিপাট্য নেই।

তাকে দেখিয়ে বন্ধুটি বললেন, একে চেন ? এ আমাদের কবি সুকান্ত।

চমক লাগে কুণালের, এই-ই কবি সুকান্ত। এমন ছেলেমানুষ।

ওর কবিতায় তো জীবনের মানে ফুটে উঠেছে। আর বেজে উঠেছে বলিষ্ঠ সুর। সে সুর আশার। আবার এই সমাজব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করেছে, ব্যঙ্গ করেছে, এমন কবি কিনা এমনি ছেলেমানুষ।

কুণাল জিজ্ঞেস করে জানলে, সুকান্ত, ম্যাট্রিক দেবে। ছাত্র আন্দোলন করে।
কুণালের মনে পড়ল সুকুমারের কথা।
সুকুমারও জীবনের মানে খুঁজতে চেয়েছিল কিন্তু পায় নি। আজ তা পেয়েছে সুকান্ত। বেশী করেই তা পেয়েছে। নামের আদি অক্ষরে তো ওদের মিল আছেই আবার নামের মানেতেও তফাত বড় নেই।
কুণাল সেদিন বালক কবির দিকে বড় আশা নিয়ে চেয়ে রইল।······মাঝে মাঝে আসত সুকান্ত। বড় মুখচোরা, বড় লাজুক। কথা হয় কম, কিন্তু মাসিক পত্রে ওর কবিতা পড়ে কুণাল অবাক হয়।
এই তো কবি।
তিরিশ সালের কবি যে কথা ভাবত না, সে কথা ভাবে। কবিপনা নেই পোশাকে, আচারে, ব্যবহারে। কবিতায় উচ্ছৃঙ্খল মনের উদ্দামতা নেই, আছে আশার সুর। মনের আলোয় ঝলমলে কবিতা জীবনের সত্যে ভরা কবিতা। আগে ছিল বিদ্রোহ, এবং সেখানে বিপ্লবের সুর বেজে ওঠে। আবার এই সমাজের মাঠকোঠার উপর বিদ্রূপ ছুঁড়ে ছুঁড়ে যায়। বালক কবি গায় মোরগের পালা। বলে মোরগের—

"আশ্রয় যদি মিললো
উপযুক্ত আহার মিললো না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো সেই মোরগ,
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত
তবুও সহানুভূতি জানালো সেই বিরাট ইমারত
তার পরে কি হল?
সে খাবার পেল না, নিজেই হ'ল খাবার।"

কুণাল ভাবে, এই ছেলেটি কোথায় পেল এমন প্রতিভা, কোথা থেকে এল এই সহানুভূতি?
এই বিদ্রূপের কথাই বা কি করে ওর হাতে এমন তীব্র হয়ে উঠল?
নিজে নিজে ভেবে উত্তর পেল, তাই-ই হয়।
জীবনের মানে যে খুঁজে পায়, তার মন এমনি করেই দল মেলে দেয়।
হোক না সে বালক, হোক না সে কিশোর?
তাই তো কিশোর কবি উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে না, বলে—

"কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

দিন যায়, কুণাল একদিন খবর পেল সুকান্ত হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায়। আর একদিন খবর এল সুকান্ত আর নেই।……সুকুমার এসেছিল উদ্দামতা নিয়ে, বিদ্রোহ করেছিল, জীবনের মানে খুঁজতে চেয়েছিল, কিন্তু জীবনের মানে মিলল না।

সে চলে গেল অকালে।

আবার তার অনেক দিন পরে এক সুকান্ত যে জীবনের মানে খুঁজে পেল, জীবনের যে তিক্ততা সে ফুটিয়ে তুলল ব্যঙ্গে বিদ্রূপে—এক মহাজীবনের আশার ইংগিত দিয়ে গেল। কিন্তু সেও রইল না।

কুণাল তাই ভাবে, সুকুমার বেঁচে থাকলে একদিন জীবনের মানে খুঁজে পেত, সে হত সুকান্ত।

আর সুকান্ত থাকলে সে হত কবিগুরুর সেই কবি, তিনি যাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করোগো উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার।
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি।
রসে পূর্ণ করে দাও তুমি,
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌গারি।"

সুকান্ত : জীবন ও কাব্য ॥ অরুণাচল বসু

ব্ল্যাক আউটের সময়ে দাদার বিয়ে উপলক্ষে নতুন বৌদিকে উপহার দেবার জন্যে একটি ছোট কবিতা লেখে সুকান্ত, শেষ পর্যন্ত কি জন্যে যেন উপহারটা

আর দেওয়া ঘটে ওঠে না। সেখানি আপাতত হাতের কাছে নেই, কেবল কটা লাইন মনে আছে :

"এ শহর নিষ্প্রদীপ ; নিষ্প্রদীপ আমাদের ঘর।
জমেছে উদাস ধুলো অনাদৃত বৎসর বৎসর।
এখানে কখনো কেউ পায় নিকো বসন্তের হাওয়া,
তাইতো এখানে ব্যর্থ সহৃদয় চাওয়া আর পাওয়া।"

'দারিদ্র্য অনবগুণ্ঠিত' এবং এখানে কৃপণ বায়ু, এখানে চাঁদও কুণ্ঠিত। এই জীর্ণ অন্ধকার ঘরে আসবার আগে নতুন বধূকে তাই সে আবেদন জানিয়েছিল :

"একটি প্রদীপ এনো, এখানে, কখনো যদি আসো।"

সুকান্তর সংসারে মোটামুটি চেহারা এই। অবশ্য সংসারের এমনি হাল হবার জন্য দারিদ্র্যই যে পুরোপুরি দায়ী এটা বললে সত্যের অপলাপ হবে। অন্ন আর বস্ত্রের সাধারণ অভাব এবাড়িতে কখনো ছিল না, আর ওই দুটোই বেঁচে থাকার পক্ষে সবচেয়ে দরকারী,—এ-বিষয়ে কেউ বোধ হয় দ্বিমত নন। এবাড়িতে তাই সবচেয়ে বড় অভাব যার ছিল, তা একজন গৃহকর্ত্রীর। সুকান্তর মা মারা যান তার অতি শৈশবে। তাই বেঁচে থাকার সাধারণ রীতিগুলো এবাড়িতে কেউ জানবার সুযোগ পায় নি যা শিখিয়ে থাকেন মা। আর ওরও নিচে ছিল চারটি ভাই : বালক থেকে একেবারে শিশু পর্যন্ত। আগে ওদের বাড়িতে একটু সকালে এলেই দেখতে পেতাম, ওরা পাঁচ ছটিতে ঘুমুচ্ছে মেঝেয় পড়ে—ছারপোকা আর মশার ঝাঁক পরমানন্দে ওদের ফলার করছে ;—যদিও খাট, চৌকি বা মশারীর অভাব এবাড়িতে কখনও ছিল না কারণ সুকান্তর বাবা প্রাচীন পূজারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, এতো খাট চৌকি বাসন তৈজসপত্র উপঢৌকন হিসাবে জড়ো হয় যে মাঝে মাঝে বিক্রি করে দিতেও দেখেছি। সুতরাং 'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি' এবং 'তবুও নিশ্চিত উপবাস। আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস' ইত্যাদি লাইন পড়ে যাঁরা ভাবেন অনাহারই হয়তো তার মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাঁরা স্বভাবতই একটু ভুল করেন। কারণ প্রাচীন প্রকাশনা ও বইয়ের দোকানটি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাদের সংসার চালানোর দায়িত্বটা বেশ সুষ্ঠুভাবেই পালন করে আসছে। অন্তত তার কল্যাণেও দুর্ভিক্ষের সময়ে অর্থাভাবে অন্ন সংগ্রহের খুব অসুবিধা ঘটা সম্ভব নয়।

ব্যক্তিগত জীবনের অভাব অনটনই তাই আসলে তাকে জনতার কবি করে নি।

করেছিল: তার কাব্যজীবনের প্রতি নিষ্ঠা। সুকান্তর জীবনের আশৈশব ছন্নছাড়া পারিপার্শ্বিক, তাকে সাধারণের জীবনকে বোঝবার পথ খানিকটা সহজ করে দিয়েছিল। এমন কর্ত্রীহীন হালছেঁড়া সংসারে বেঁচে থাকতে হ'লে, সব কাজই নিজেদের করতে হয়, জীবন-সংগ্রামের যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে সমানতালে চলতে হয় সমাজের অন্যান্য গৃহীদের সঙ্গে। এতে অপরের জীবন জানাটা ঘটে যায় স্বাভাবিকভাবে। তাই নিজের বাল্যকাল ও কৈশোরকে সুকান্ত উপভোগ করতে পারল না কখনো। কিশোর কবি আখ্যা দেওয়াতে তাই ক্ষুব্ধ হতো সে রীতিমতো। সে কিশোর-কবি কখনো ছিল না। এই প্রসঙ্গে তার একেবারে বালক বয়সের কবিতার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

"দুর্বল পৃথিবী কাঁদে জটিল বিকারে,
মৃত্যুহীন ধমনীর জ্বলন্ত প্রলাপ;
অবরুদ্ধ বক্ষে তার উন্মাদ তড়িৎ—
নিত্য দেখে বিভীষিকা পূর্ব অভিশাপ।" ইত্যাদি।

এই পাকাহাতের কবিতা লিখতে তাকে কিন্তু হাত পাকাতে হয় নি কখনো। কারণ, বাস্তব জীবন তার বুদ্ধিকে পাকা করে দিয়েছিল। আর ছিল তার আশ্চর্য সংবেদনশীল হৃদয়। লক্ষ্য করার বিষয় ওপরের কবিতাটিতেও সে ব্যক্তিগত নয়, বৃহত্তর সমাজের কথাই বলছে। যদিও এ সময়ে সে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক সংগঠনের সংস্রবে আসবার সুযোগ পায় নি; কারণ এ সব কবিতা লেখা তার তের থেকে চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে, ইংরেজী চল্লিশ সালে। প্রশ্ন উঠতে পারে এমন ভাষা, আঙ্গিক শেখার সে সুযোগ পেল কী ক'রে!—সুকান্তর বাড়িতে গোড়াগুড়ি থেকেই ছিল একটা সাহিত্যিক আবেষ্টনী। মায়ের স্মৃতি সম্বন্ধে তার কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি—তাঁর পড়াশুনায় ছিল অসাধারণ অনুরাগ। সাংসারিক কাজের চাপে শেষে পড়াশুনা বন্ধ হ'লেও দৈনিক ঘর পরিষ্কার করার সময়ে নাকি এটা ওটা কুড়িয়ে পড়তেন। তার বাবা প্রাচীন প্রকাশক। অনেক প্রাচীন সাহিত্য সেখান থেকে প্রকাশিত বা বিক্রি হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত সে পড়েছিল অতি শৈশবে এবং মনেও রেখেছিল। তার অনেক কবিতায় তার স্বাক্ষর আছে, বিশেষ করে প্রথম বয়সের কবিতায়। তা ছাড়া এক-আধটু লেখার শক্তি তার দাদাদের প্রায় সকলেরই আছে। তাঁরা তাকে প্রভাবিত করেন। আধুনিক কবিতা পড়ায় অনুপ্রাণিত করেন তার অন্যতম দাদা মনোজ ভট্টাচার্য। তাঁর কথা তার মুখে অনেক শুনেছি। আবার

রাজনৈতিক ভাবাদর্শের দিক থেকে তার দাদা বা দাদার বন্ধুরা তাকে প্রভাবিত করেছিলেন।

এই নানা সংস্রবের নানা ঐতিহ্যে তার প্রথম জীবন পুষ্টিলাভ করে। পরবর্তী জীবনে সে মার্কসবাদী আন্দোলনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে—এতো সকলেই জানেন।

অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন তার প্রায় কোনো কবিতাই একান্তভাবে ব্যক্তিগত নয়—এক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া প্রায় সব কবিদের লেখাতেই আছে যার প্রাচুর্য। একবার এক চিঠিতে লিখেছিল,—'প্রেমে পড়ে কবিতা লেখা আমার কাছে লজ্জারজনক।' তার একটি কি দুটি মাত্র কবিতায় একটু ব্যক্তিগত আমেজ আছে। 'কবিতা' পত্রিকা থেকে যখন বুদ্ধদেব বসু তার 'কনভয়' কবিতাটি 'ঠিক কাব্যের সুর লাগাতে পারোনি' বলে ফেরত পাঠালেন; তার 'ঘুম নেই'তে প্রকাশিত 'মীমাংসা' কবিতাটিকে তখন একটু প্রেমের আমেজ লাগিয়ে নতুন ক'রে লিখে পাঠায় এবং তা 'ব্যর্থতা' নামে 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়। অপর 'স্মারক' কবিতাটি ('পূর্বাভাসে' প্রকাশিত) বোধহয় ছন্দের দোলাতেই লিখে ফেলে, নতুবা এতে কিছু ব্যক্তিগত জীবনের উঁকিঝুঁকি নেই :

> "আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ উড়িয়া যায়
> তবুও পড়িবে মনে,
> চঞ্চল হাওয়া যদি ফেরে কভু হৃদয়ের আঙিনায়
> রজনীগন্ধা বনে
> তবুও পড়িবে মনে।" ইত্যাদি।

অবশ্য প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে তার বিরাগের কারণক বিতার নামে সে সময়কার আমাদের মধ্যবিত্ত কবিদের অত্যধিক মেয়েলি আত্মমর্ষণ। নচেৎ বিপ্লবী জীবনের সার্থক প্রেমকে সে অশ্রদ্ধা করতো না। 'প্রিয়তমাসু' তার দৃষ্টান্ত। আসলে কবিতাকেও সে উৎসর্গ করেছিল মানুষের মহত্তর জীবন আনবার কাজে, সমাজ বদলাবার কাজে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়—

> "প্রণয়ের কাহিনীকে প্রবৃত্তির হাতে বেঁধে মুহূর্তের জরে
> মহৎ প্রচ্ছদ দেওয়া, তারপর পিঠ রেখে সম্মুখ জীবনে
> বিশ্বস্ত হৃদয় খোঁজা।"

তার কাছে ছিল নেহাত গ্লানিকর। প্রেমের কবিতা বাদ দিলেও তার অন্যান্য কবিতায় যে সুখ-দুঃখের সুর আছে, তাও নৈর্ব্যক্তিক। এর কারণ, সে সমাজ

থেকে পালাবার সুযোগ জীবনের গোড়া থেকেই পায় নি। ব্যক্তিগত কবিতা লিখল না বলে ব্যক্তিগত জীবনের সব ব্যাপারেও সে হয়তো উদাসীন ছিল, এ ধারণা অনেকের হ'তে পারে। কিন্তু তা একেবারেই সত্য নয়। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে সে ছিল অতি সাধারণ মানুষদের একজন। তার আচরণে কখনোই অতি মানবত্বও প্রকাশ পেত না। স্বাভাবিক একটি সহজ হৃদয় ছিল তার—স্নেহ, ভালোবাসায় পরিহাসপ্রিয়তায়, সারল্যে সে ছিল এক চমৎকার মানুষ। অল্প জর হয়েছে, ওর ওখানে যাবার কথা ছিল যেতে পারি নি। হঠাৎ এক শিশি ওষুধ আর দীর্ঘ চিঠি এসে হাজির হল ওর এক ছোট ভাইয়ের মারফত। চিঠিতে আমার জরের ব্যাপারে বিরাট উদ্বেগ এবং নিশ্চিত আশ্বাস, এই অমোঘ ওষুধ খেলে নাকি একদিনের মধ্যে নিরাময়তা অবধার্য। ওর বাবা এ ওষুধে নাকি আশ্চর্য ফল পেয়েছেন। অবশ্য এ ওষুধ যখন পাঠিয়েছে তখন সে নিজেই টি. বি. রোগে আক্রান্ত; রোজ বিকেলে জর হয়। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ওর মৃত্যুর পর সেই এলোপ্যাথিক ট্যাবলেটের শিশিটি কথাটা বার বার মনে পড়িয়ে দিতো। পথে হয়তো বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একটা সিগারেট কিনে নিয়ে এল; অবশ্য ও নিজে খেতো না, আমার জন্যে। প্রশ্ন করলাম, ব্যাপারটা কী—"সিগারেট খেলে তোর গাঁজাখুরী গল্প জমে ভালো!" আসলে আমার পকেটে পয়সা নেই; তাই দরদটা লুকোবার জন্যে পরিহাসের আশ্রয় নেওয়া। আবার আমার হাতে কখনো পয়সা এলে ওকে দু'এক আনা দিতাম, তাই আমার নাম রেখেছিল 'দীনবন্ধু'। সৌন্দর্যপ্রিয়তা ছিল তার অসাধারণ। ভালো কিছু দেখলে, যে করে হোক দেখাবেই। অবশ্য এ ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গীটা ছিল সম্পূর্ণ নির্মল শিল্পী-জনোচিত। এই সুষ্ঠু রুচির পরিচয় তার সর্বত্র ছিল। অধুনা সুপরিচিত কয়েকজন রবীন্দ্রসংগীত গাইয়ের একেবারে প্রথম গান রেডিয়োয় শুনে তাদের সম্বন্ধে তার ভবিষ্যদ্বাণী কাঁটায় কাঁটায় ফলেছে। যদিও গান সম্বন্ধে তার কোনোই অ্যাকাডেমিক জ্ঞান ছিল না, নেহাত কানে শুনে যা বোঝা যায়।

"এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।"

কথাটি মিথ্যে নয়। নিজে রবীন্দ্রনাথের প্রায় পাঁচ ছশো গান জানতো। গলায় সুর ছিল না; উচ্চারণ, তাল, ওঠা-পড়া ইত্যাদি নিখুঁতভাবে বজায় রেখে যেটুকু পারতো সুরে আবৃত্তি করতো। বেশ শোনাতো সে গান।

সুকান্তর সারল্য আর শিশুমনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। যে বীরপুঙ্গব নিজেকে তুলনা করলেন 'আগ্নেয়গিরি' এবং সিংহের সঙ্গে; যিনি বজ্রগর্ভস্বরে ঘোষণা করলেন :

"বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন"

তার কুকুরের ডাকে কি হাল হ'তো তাতো অনেকেই জানেন না। রাস্তায় একবার কুকুর দেখলেই আমায় আঁকড়ে ধরতো, (অবশ্য আমি সঙ্গে থাকলে)। যে জীবনে কোনোদিন গ্রামে না গিয়েও চিরদিনের মতো নিখুঁত গ্রামের ছবি আঁকতে পেরেছে, যে শুধু অনুমান আর নিবিড় অনুভূতি দিয়ে সেই কঠোর বাস্তব জানতে পেরেছিল, কী গভীর আগ্রহে বছরের শেষে "প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখে ধান কাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে" সেই অন্তর্দর্শী একান্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিটি জানতেন না নিজেকে কী ক'রে পরিষ্কার রাখতে হয়!

সুকান্ত নিজের প্রশংসা আদৌ সহ্য করতে পারতো না। কারো সঙ্গে কবি বলে পরিচয় করাতে গিয়ে কয়েকবার তাড়া খেয়েছি। ওর কোনো দূরের ভক্ত একবার ওকে দেখতে চেয়ে চিঠি লেখেন, তার জবাবে আমাকে বলেছিল,— "আমাকে দেখে কী হবে? আমার কবিতা আরো মনোযোগ দিয়ে দেখলেই তো আমাকে পেয়ে যান।" অবশ্য দুর্বিনীত ছিল না কখনো। কারো কাছে একটু অন্যায় করলে ক্ষমা চাইতেও তার বাধতো না। তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। সাত বছরের সংস্রবে তার নিজের সম্বন্ধে বলতে মাত্র দু'বার শুনেছি।

আর একবার তার 'চট্টগ্রাম' ও অন্যান্য কয়েকটি যুদ্ধ কবিতা বেরোবার পর ইলিয়া ইরেনবুর্গের একটি দীর্ঘ যুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতা বাংলায় তর্জমা হয়। উভয় কবিতায় ঘনিষ্ঠতম শক্তি ও ভাব-সাদৃশ্য দেখে ওকে বলেছিলাম ইরেনবুর্গ লিখেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আর তুই কিছু না জেনে এখানে বসে এই একই রকমের কবিতা কি ক'রে লিখলি? জবাবে অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলেছিল, "পারি পারি, ভবিষ্যতে যদি পারি দেখবো।"

পরিহাসপ্রিয়তা, বিনয় ইত্যাদির পাশাপাশি তার ছিল কঠোর আত্মমর্যাদাবোধ, তার ব্যক্তিত্বে আঘাত দিয়ে কেউ কখনো নিস্তার পায় নি। অতি শৈশবে তার বাবার সঙ্গে বাসে চলেছিল কোথায়। সঙ্গে তার দু-এক বছরের ছোট এক ভাই। কণ্ডাকটর পয়সা চাইলে, বাবা নিজের টিকিট নিলেন ও ছোটভাইকে দেখিয়ে বললেন, ও আমার ছেলে, অতটুকু ছেলের টিকিট লাগবে কি? সুকান্তকে দেখিয়ে কণ্ডাকটর টিকিট চাইলেন। সুকান্তর বাবা পরিহাস ক'রে

বললেন—ওকে ধ'রে নাওনা, এইতো বাসে এতো লোক যাচ্ছেন, এদের কারো সঙ্গে চলেছে ও! পরবর্তী স্টপেজ আসতেই বছর ছয়েকের বালক সুকান্ত হঠাৎ নেমে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল। ওর বাবা ওকে নেমে ধরে জিজ্ঞাসা করতেই বিপুল ক্রোধের সঙ্গে বললে—"ও তোমার ছেলে আর আমি অপরের ?..." বহুকষ্টে বুঝিয়ে তাকে পরের বাসে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত্যুর কিছুকাল আগে ও তখন শয্যাশায়ী। 'একুশে নভেম্বর, ১৯৪৬' কবিতাটি লেখার পর কোনো সভায় পড়ার জন্যে ওর জনৈক বন্ধু সেটি নিয়ে যান। কবিতাটির শেষে ছিল :

পতাকায় পতাকায় ফের মিল আনবে ফেব্রুয়ারী
এ নভেম্বরে সংকেত পাই তারি।

লাইন দুটির ছন্দ বুঝতে না পেরে বন্ধুটি অপর দু'জন কবি ও সাহিত্যিককে সেটি দেখান। তারাও ছন্দপাত বলে দৃঢ় অভিমত দেন, এবং 'পতাকায়' 'পতাকায়'-এর একটি পতাকায় কেটে দেন। কবিতাটি সে ভাবেই পড়া হয়। সুকান্তর কানে এ খবর পৌঁছোলে রাগে ক্ষোভে সে ফেটে পড়ে। এবং লাইন দু'টির ছন্দ ঠিক আছে কিনা দেখাবার জন্য তৎক্ষণাৎ ভালো ছান্দসিক হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। বুদ্ধদেববাবু এইভাবে কবিতাটির যতি বিভাগ করে ছন্দ ঠিক আছে বলে জানান :

পতাকায় পতা | কায় ফের মিল | আনবে ফেব্রু | য়ারী
এ নভেম্বরে | সংকেত পাই | তারি।

সুকান্ত এই ছন্দ বিচার দেখিয়ে যে অনভিজ্ঞ লেখকরা তার লাইন কেটেছিলেন (এবং বোধ হয় কিছু তর্কও করেছিলেন) তাদের জবাব দিয়ে মুক্তি পায়।
এমনি ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক দিয়ে তার চরিত্র অনুকরণযোগ্য। ঘটনার সাহায্যে সবদিক তুলে ধরার পরিসর এখানে নেই। বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, সুকান্ত কবি হ'তে পারতো, রাজনীতি করতে গিয়ে পারল না! জানি, এর সঙ্গে অনেকের অল্প-বিস্তর মতের মিল আছে। কিন্তু কথাটি জলন্ত মিথ্যা। রাজনৈতিক জীবনের আগে তার লেখার পরিমাণ, উৎকর্ষ, সার্বজনীনতা সবই ছিল অত্যন্ত অল্প। রাজনীতির সংস্রবে এসে তার কাব্যশক্তির অন্ধকূপ যেন হঠাৎ বন্যা হয়ে ফেটে পড়ে। তার কারণ, সে যে গোড়াগুড়ি থেকেই ছিল সমাজমুখী কবি : সমাজজীবনের আকৃতিই তার প্রতিটি লেখায় ফুটে উঠতো, (তার

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'পূর্বাভাস' এ জন্যে সকলকে পড়ে দেখতে বলি) কিন্তু সেই আকৃতির প্রকাশ সব সময়ে হয়তো ঠিক বিপ্লবী আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটতো না। আসতো হতাশা, আসতো প্রশ্ন, আসতো একক আত্মবিক্ষোভ, তবু এর প্রত্যেকটিরই উৎপত্তি সামাজিক চেতনা থেকে, ব্যক্তিগত ঘটনা থেকে নয়। তার সেই একক বিক্ষোভের যন্ত্রণা থেকে তাই সে মুক্তি খুঁজছিল, যে আলো খুঁজছিল, যে আলো আলেয়া নয়, সূর্যের মতো যা সত্য। সে-আলো তাকে দিল মার্কস্‌বাদী জনতার সংগঠন। সে যা চাচ্ছিল ঠিক তাই পেল। বেরিয়ে এল তার প্রথম দিকের লেখা এই কবিতা থেকে :

"·········বেদনা বিদ্যুৎ-শিখা
জ্বালাময় আত্মার আকাশে ঊর্ধ্বমুখী
আপনারে দগ্ধ করে প্রচণ্ড বিস্ময়ে।
জীবনের প্রতি পদক্ষেপ তাই বুঝি
ব্যথাবিদ্ধ বিষণ্ণ বিদায়ে।
·········নিভৃত ক্রন্দনে তাই
পরিশ্রান্ত সংগ্রামের দিন। বহ্নিময়
দিনরাত্রি চক্ষে মোর এনেছে অন্তিম,—
ধ্বংস হোক লুপ্ত হোক ক্ষুধিত পৃথিবী
আর সর্পিল সভ্যতা।

পরিপূর্ণ সভ্যতা সঞ্চয়ে, আজ যারা
রক্তলোভী বর্ধিত প্রলয় অন্বেষণে
তাদের সংহার করো, মৃতের মিনতি।
বিদায় পৃথিবী আজ, তারুণ্যের তাপে
নিবদ্ধ পথিক-দৃষ্টি উদ্বুদ্ধ আকাশে
সার্থক আমার নিত্য-লুপ্ত পরিক্রমা
ধ্বনিময় অনন্ত প্রান্তরে। দূরগামী
আমি আজ উদ্বেলিত পশ্চাতের পায়ে
উদাস উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি রেখে যাই
সম্মুখের ডাকে

হে দেবতা, আলো চাই সূর্যের সঞ্চয়
তারুণ্যের কী নিঃসীম জ্বালা
অন্ধকারে অরণ্যের উদ্দাম উল্লাস
লুপ্ত হোক আশঙ্কায় উদ্ধত মৃত্যুতে।"

বেরিয়ে এল উদ্ধত মৃত্যুর তলায় নিশ্চিত বিলুপ্ত থেকে সূর্যোদয়ের পথে। নিজের ঠিকানা জানিয়ে দিল 'বিদ্রোহের পথ দিয়ে' 'মুক্ত স্বদেশ'।

অনেকে আপত্তি তোলেন তার প্রথম দিকের কবিতায় রাজনৈতিক স্লোগান সম্পর্কে। বিয়াল্লিশ সালে তার রাজনীতির অনেক স্লোগান সাজানো আছে 'বিবৃতি' 'বোধন' কী অন্যান্য কবিতায়। কিন্তু 'বিবৃতি' চট্টগ্রাম' কী 'মণিপুর' না লিখলে লেখা হ'ত কি 'রানার'? আর 'রানার' না লিখতে জানলে কী ক'রে লিখতো 'আগ্নেয়গিরি' 'ছাড়পত্র' 'চিল' কি 'প্রার্থী'র মতো কবিতা,—যা বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে স্থান পাবে? এ জাতের কবিতা লিখতে গেলে চাই ঘনিষ্ঠ জনসংস্রব, আর পরিষ্কার রাজনৈতিক দৃষ্টি। তাই বলতে হয় রাজনীতি করতে গিয়ে 'সে কবি হ'তে পারল না' নয়, রাজনীতি করেই সে সার্থক কবি হল।

সুকান্ত নিছক রাজনীতি করার জন্য কবিতা লেখা ছেড়ে দেবার কিন্তু ছিল দারুণ বিপক্ষে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা লেখা বন্ধ করবেন এটা সে বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারতো না। প্রথম দিকে বলতো, বোধ হয় কোনো নতুন পথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, তাই প্রকাশ করছেন না। শেষে তিনি অন্য কাজের জন্য আর লেখেন না জেনে, খুশী ছিল না মোটেই। কবিতাই তো কবির জীবন। আর জীবনের বাইরে রাজনীতি বা আদর্শগত কাজ বলে কবির কিছু থাকতে পারে না! এই কঠোর সত্যটি সুকান্ত উপলব্ধি করেছিল।

কবিতা লিখতে গিয়ে তাই সে জীবনের সঙ্গে যোগ রেখেছে সুদৃঢ়ভাবে। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাজের বাইরেও তাকে দেখেছি কোনো সাধারণ রেল-মজুরের সঙ্গে গিয়ে ব্যক্তিগত গল্প করতে, কতো মফঃস্বলের সাধারণ কর্মীর সঙ্গে পত্রালাপ করতে। শ্রমজীবী গরীব মানুষের সংস্রব ছাড়া সে থাকতে পারতো না কিছুতেই। সুকান্ত কখনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতো না, কিন্তু একবার বলেছিল অত্যন্ত নিবিড় স্বরে—"জীবনটা দেবো পার্টির জন্যে, জীবনটা দিয়ে দেবো।" তার কথা সে পালন করেছে। পালন করেছে তার অঙ্গীকার:

"চলে যাবো, তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি—
অবশেষে সব কাজ সেরে।
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে ক'রে যাবো আশীর্বাদ
তারপর হবো ইতিহাস।"

আজ ইতিহাসে সুকান্ত। সুকান্তর কাব্য আর ব্যক্তিগত জীবনকে তাই উদ্‌ঘাটিত করা দরকার ঐতিহাসিকের ঔৎসুক্য আর নিষ্ঠা নিয়ে।
দেশবাসীর কাছে স্বচ্ছ ক'রে তুলে ধরা দরকার তার জীবন, আর আদর্শকে, কারণ আরো শত শত সুকান্ত তৈরি করবার দায়িত্ব আমাদের।

সে কবির বাণী ॥ মিহির সেন

সুকান্তর এবার বই বেরুনো প্রয়োজন। অনেকেই উপলব্ধি করল কথাটা। দু'একজনের মনে অবশ্য একটু সন্দেহও ছিল, কবিতার বই কাটবে এ দেশে? নাম-করা কবিদের বইয়ের দ্বিতীয় সংকলন বেরুলে রীতিমতো ঘোষণা করার মতো ঘটনা যে দেশে। তবে আশা করবার মতো নজীরও তাদের হাতের সামনে ছিল। বয়সে সর্ব কনিষ্ঠ হলে কি হবে প্রতিভার শক্তিতে সে তো ইতিমধ্যেই অগ্রজদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে।
স্কুলের ছাত্র অবস্থায় এমন দেশ-জোড়া খ্যাতি বাংলাদেশে আর ক'জনের ভাগ্যে ঘটেছে। এ বয়সে দেশ-বিদেশে অনুবাদই বা হয়েছে কার এত কবিতা?

সুকান্ত তখন অসুস্থ।
তবু কবিতাগুলো সে নিজেই বেছে ঠিক করল রোগশয্যায় শুয়ে। পুরো পরিকল্পনা করে ফেলল তার বইয়ের।
কিন্তু নামকরণ? নাম কি রাখা যায় বইয়ের? এবার রীতিমতো চিন্তিত হল সুকান্ত। অবশ্য এ চিন্তায় একবার না একবার সব লেখককেই পড়তে হয়

বইয়ের নামকরণের সময়। পছন্দমতো নাম যেন কিছুতেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

শুধু সুকান্তই নয়, বন্ধুবান্ধবরাও চিন্তা করতে শুরু করল এবার।

কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগেই সুকান্তর অসুখ বেড়ে গেল।

হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সুকান্তকে।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল। বইয়ের কাজ তখন শুরু হয়ে গেছে।

সুকান্তর অসুস্থতার জন্য কয়েকজনের ওপর পুরো দায়িত্ব দেওয়া হল বইটা বের করার।

সুকান্তর একজন বিশেষ উৎসাহী-হিতৈষী ও অগ্রজ সহযাত্রী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁদের ভেতর একজন।

বই প্রেসে দেওয়া হল। নাম বাদেই। সুকান্ত তখনও বইয়ের নাম ঠিক করে উঠতে পারে নি। কদিন বাদে সুকান্ত এত বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে যে নামকরণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সে। অগত্যা বই বের করার ভার ছিল যাঁদের ওপর তাঁদেরই ওপর নামকরণের ভারটাও এসে পড়ল। কিন্তু তাঁরা হয়রান হয়ে গেলেন একটা মনোমতো নাম বের করতে।

বইয়ের কাজ তখন অনেক এগিয়েছে···। অস্থির আগ্রহে দিন গুণছে সুকান্ত, কতদূর আর কত দূর বইয়ের ?

প্রায় হয়ে এল।

ছাপানো ফাইল নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় একদিন তুলে দিলেন সুকান্তের হাতে। আনন্দে উত্তেজনায় উঠে বসল সুকান্ত : ওঃ হয়ে এল দেখছি, সুভাষদা।

—হ্যাঁ, আর সপ্তাহখানেক। তার বেশী দেরি হবে না। এক সপ্তাহের ভেতর তোমার হাতে ছাপানো বই তুলে দেব সুকান্ত। আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমরা— সুভাষ মুখোপাধ্যায় আশা দিলেন রুগ্ন সুকান্তকে।

কিন্তু নামকরণ যে এখনও হল না।

আর তো দেরি করা সম্ভব নয়। সুকান্ত দিন দিনই খারাপের দিকে যাচ্ছে। ছাপার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এল। অগত্যা জোড়াতালি দিয়ে একটা নাম করা হল। প্রচ্ছদপটও আঁকতে দেওয়া হল।

ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল কাজ।

কিন্তু আচমকা থেমে গেল সে ঝড় অপ্রত্যাশিত এক দুঃসংবাদে। থমকে থেমে গেল মেশিন। প্রচ্ছদশিল্পীর তুলি কেঁপে উঠল আতঙ্কে! সংবাদ এল : সুকান্ত নেই!···

'নবজাতকের কাছে' 'দৃঢ় অঙ্গীকারের' ছাড়পত্র তুলে দেবার আগেই মৃত্যুর ছাড়-পত্র এসে পৌঁছাল কিশোর কবির হাতে।

সুকান্তর প্রথম বই তাই সে দেখে যেতে পারল না। ক্ষোভে দুঃখে অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যাঁদের ওপর ভার ছিল এ বইয়ের। তবু শোকার্ত পদক্ষেপে প্রস্তুতির পালা শেষ করলেন তাঁরা। অপ্রকাশিত আরো কিছু কবিতা সুকান্তর ঝুলি থেকে বেরিয়েছে। একবার কথা হল, সেগুলোও এ-বইয়ে ছেপে দিলে কেমন হয়? কিন্তু দেরি হয়ে যাবে তাতে আরো। আকৃতি আরও স্ফীত হবে। বরং দ্বিতীয় সংকলনের বা দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থে সেগুলো দেওয়া যাবে।…

বইয়ের কাজ শেষ হল। আগের নাম বদলে বইয়ের প্রথম কবিতার নামে নাম-করণ হল বইয়ের 'ছাড়পত্র'। প্রচ্ছদপট এঁকে দিলেন বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়।

ছাড়পত্র প্রকাশিত হল—১৩৫৪; আষাঢ় মাসে।

বছর দেড়েকের ভিতর নিঃশেষ হয়ে গেল ছাড়পত্র। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল ১৩৫৫; অগ্রহায়ণে।

সুকান্তর ভক্তরা উৎসাহিত হল আর অবাক হল বিরোধী পক্ষ, এর ভিতরেই দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে গেল!

তাও আবার কবিতার বইয়ের।

কিন্তু তাদের অবাক হবার আরো বেশ কিছু বাকি ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণও ফুরিয়ে গেল। তৃতীয় সংস্করণ বেরুল এবার ১৩৫৭: বৈশাখে। তাও ফুরিয়ে গেল। চতুর্থ সংস্করণ এবার ১৩৫৯: শ্রাবণ। পঞ্চম ১৩৬০: ফাল্গুন। ষষ্ঠ ১৩৬২: জ্যৈষ্ঠ। সব সমেত পনের হাজার বই শেষ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলাদেশে কবিতা বইয়ের এত ঘন ঘন ও এত সংস্করণ বোধ হয় সুকান্তরই প্রথম।

অবশ্য সুকান্তর অপ্রকাশিত কবিতার কিছু নিয়ে দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থটিও বেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে ১৩৫৭এর জ্যৈষ্ঠে। 'ঘুম নেই' নামে।

'ছাড়পত্রে'র সাথে 'ঘুম নেই'ও এবার এগিয়ে চলল সংস্করণের পাল্লায়। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল ১৩৫৭, চৈত্রে। দু'মাসের ভেতর বেরুল তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫৯; জ্যৈষ্ঠ। তাও শেষ। এবার চতুর্থ সংস্করণের

পালা ১৩৬১ ; বৈশাখে। সে সংস্করণও ফুরিয়ে গেল। তিন হাজার তিন শ’-তেও কুলাল না। আবার ছাপা হচ্ছে ‘ঘুম নেই’। এবার পঞ্চম সংস্করণ। কিন্তু ‘ঘুম নেই’এর পরও দেখা গেল আরো কিছু কবিতা থেকে যাচ্ছে সুকান্তর, যা নিয়ে আরো একটা বই বেরুতে পারে। অবশ্য তার ভেতর সুকান্তর অতি অল্প বয়সে লেখা কবিতাও অনেকগুলো। তুলনামূলকভাবে সেগুলোকে হয়তো কিছুটা কাঁচা মনে হবে পাঠকদের।

“তবু প্রায় অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই প্রতিভার দীপ্তি আছে। কিশোর মনের সৌন্দর্য সুষমামণ্ডিত নিষ্ঠা আছে। সুকান্তর কবিতার ক্রমপরিণতি জানতে হলে এই কবিতাগুলির সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন।”

শ্রদ্ধেয় কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের ভূমিকা নিয়ে তাই তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ বেরুল সুকান্তর ‘পূর্বাভাস’। প্রকাশ মাস—জ্যৈষ্ঠ : ১৩৫৭। অনেকের মনেই একটু ‘কিন্তু’ ছিল এই বইটির কাটতি সম্বন্ধে। কিন্তু সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে চৈত্র ১৩৫৮তে দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল ‘পূর্বাভাসে’র। ফাল্গুন; ১৩৬১তে প্রয়োজন হ’ল তৃতীয় সংস্করণের। কিন্তু সুকান্ত শুধু বড়দের জন্যই কবিতা লেখে নি, ছোটদের জন্যও যে সমান দরদ ছিল তার।

তাদের কাছেই তার প্রথম দৃঢ় অঙ্গীকার ছিল—

> “চলে যাবো, তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
> প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
> এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি—”

আর এ শুধু কবির কল্পনা বা কবিতার কথা নয়। সৈনিক কবির পরিকল্পিত কর্মসূচিরই ভাবরূপ।

কর্মক্ষেত্রে তার প্রমাণ রেখে গিয়েছে সুকান্ত কিশোর বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। কিশোর পাতার পরিচালক হিসাবে। আর কাব্যক্ষেত্রে ছোটদের জন্য অবিশ্রান্ত লিখে। গান, কবিতা, ছড়া। হ্যাঁ ছড়াও।

“আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ীর ছড়া নয়, একেবারে এ কালের টাটকা হাতে গরম ছড়া। হাসতে হাসতে হঠাৎ হাত মুঠো হয়ে যাবে রাগে চোখ দুটো জ্বলে উঠবে লাল টকটকে, সূর্য ওঠা দিনের বেলা ভেবে। এমন ছড়া বাংলাদেশে আর কেউ লেখে নি। এমনি সব মিঠে রসে ভেজা কড়া পাকের ছড়া।”

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন এ কথা ‘মিঠে কড়া’র ভূমিকায়।

'মিঠে কড়াই' সুকান্তের প্রথম ছোটদের বই। এ বইখানা ১৩৫৮ : শ্রাবণে প্রকাশিত হলেও এ বইয়ের পুরো পরিকল্পনা সুকান্ত তার জীবিতকালেই করে গিয়েছিল। এমন কি নামকরণটিও অবশ্য এ পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন আর একজন, যাঁর নাম 'মিঠে কড়া'র পাতায় জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে। তিনি শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। আগে থেকেই শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় ছিল সুকান্তর। ছড়াগুলো লিখে তাই দেবুদার হাতে সঁপে দেয় সে ছবি আঁকার জন্য। তারপর দু'জনে মিলে পরিকল্পনা করে ফেলে বইটির। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বইটি প্রকাশিত হতে অনেক দেরি হয়ে যায়।

'মিঠে কড়া' প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। এবার দ্বিতীয় সংস্করণের পালা। বইটা যে ছোটদের ভালো লেগেছে তারই প্রমাণ এটা। শুধু ছোটদের কেন, বড়রাও খুশী না হয়ে পারে না। 'মিঠে কড়া'র ছড়াগুলো পড়ে, আর শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মন-মাতানো ছবিগুলো দেখে।

শুধু ছড়া নয়, নাটকও লিখেছে সুকান্ত ছোটদের জন্য। বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়েছে তা। ছোটদের উৎসাহিত করেছে, প্রেরণা যুগিয়েছে। সুকান্তর জীবিতকালেই তার নাটিকা 'অভিযান' শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের একটি নাটিকার সঙ্গে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। যে কোনো কবির পক্ষে এটা নিঃসন্দেহে সম্মানের ও উৎসাহিত হবার মতো ঘটনা। খুব সম্ভবত সে সংকলনটি বাজারে পাওয়া যায় না আর।

জ্যৈষ্ঠ ; ১৩৬০-এ সেই 'অভিযান' ও 'সূর্য প্রণাম' নিয়ে ছোটদের জন্য দ্বিতীয় বই বেরোয় সুকান্তের 'অভিযান'।

আরও কিছু অপ্রকাশিত আছে সুকান্তর, বই বেরুনোর মতো ? কথায় কথায় একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম সুকান্তর দাদাকে, সারস্বত লাইব্রেরীতে বসে। (বর্তমানে সুকান্তর সব বইয়ের প্রকাশক 'সারস্বত লাইব্রেরী')।

—না। মাত্র ২০।২১ বছর বয়সে মারা গিয়েছিল যে কবি তার কাছ থেকে এর বেশী আর কত প্রত্যাশা করা যায়। তবে গান আছে কিছু। ভদ্রলোক বললেন।

গান।

আশান্বিত হলাম। তবে আরো কিছু পাব, আরও সুযোগ আছে সুকান্তর সঙ্গে পরিচয় হবার, সুকান্তর কাছ থেকে প্রেরণা পাবার।

সুকান্তর গান অবশ্য আগেও শুনেছি। শুনছি। কিন্তু সেগুলো গান নয়, সুকান্তর কবিতাই।

সুকান্তর কবিতা নিয়ে যখন রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছে দেশে, জীবন-যুদ্ধের প্রতি পদক্ষেপে সে কবিতা থেকে প্রেরণার উত্তাপ নিচ্ছে মাঠে ময়দানে পথে কারখানায় সুকান্ত-সাথী সৈনিকরা, তখনি তাদের একজন প্রথম উপলব্ধি করেন সুকান্তর বক্তব্যকে সুরের ভেতর দিয়ে আরো তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়া যায় সবার ভেতর। সুকান্তর উদ্দেশ্যকে আরো তীব্র ও সার্থক করে তোলা যায় গানের মাধ্যমে। তিনি বিখ্যাত সুরকার গণনাট্য সঙ্ঘের শ্রীসলিল চৌধুরী। সুকান্তর কবিতা 'অবাক পৃথিবী'কে সুর করে দিলেন তিনি। প্রচুর সংবর্ধনা পেলেন শ্রোতাদের কাছ থেকে। এরপর রানার। শ্রোতাদের কাছ থেকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হল এবার। রানার সংগীত। দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল রানারের জীবনের আশা বেদনার কাহিনী। সন্দেহ ও আতঙ্কের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ওপার থেকে এবার হাত বাড়ায় গ্রামোফোন কোম্পানি।

সুকান্তর 'রানার' রেকর্ড হল।

এরপর একে একে সুর দেওয়া হল 'অবাক পৃথিবী', 'দেশলাই কাঠি', 'বিদ্রোহের গান' ও ছোটদের জন্য 'পুরানো ধাঁধা'।

কবিতা থেকে গান, গান থেকে নাচ। রানারের আশা বেদনার কাহিনী শুনতে শুনতে দেহের প্রতিটি পেশীতে, অণুপরমাণুতে অনুরণন অনুভব করলেন গণনাট্য সঙ্ঘের নৃত্যশিল্পী শ্রীশম্ভু ভট্টাচার্য। রানারের সে জীবন কাহিনীকে নৃত্যের ছন্দে মূর্ত করে তুললেন তিনি। নতুন করে রোমাঞ্চিত হল এবার দর্শকরা। যে কোনো অনুষ্ঠানে 'এবার রানার নৃত্য' আজও ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে হাততালি আর উদ্দাম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রাঙ্গণ।...

দর্শকরা মুখরিত হয়ে ওঠে, শ্রোতারা অনুরণিত, পাঠকরা অনুপ্রাণিত সুকান্ত আজ আমাদের প্রেরণার উৎস।

আজ শুধু আমাদেরই নয়, আরো অনেকের। পৃথিবী জোড়া সাধারণ মানুষের।

তাই আজ সুকান্ত শুধু বাংলার সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষায় সুকান্ত অনূদিত।

সুকান্ত আদৃত।

সুকান্ত জীবিতকালেই ইংরেজী ও যতদূর জানি, ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক যুব সঙ্ঘের মুখপত্রে অনেক কবিতা অনুবাদ হয়েছিল তার।

১৯৫১তে বাংলা প্রগতিশীল কবিতার একটা চেক অনুবাদ প্রকাশিত হয় চেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রবোজোনী (PROBUZENI)। প্রবোজোনীর বাংলা মানে বোধন।

সুকান্ত 'বোধন' কবিতাটির নামানুসারেই সংকলনটির নামকরণ হয়। সে সংকলনে সুকান্তরই সবচেয়ে বেশী কবিতা স্থান পেয়েছিল।

'প্রবোজোনী'র কবিতায় সুকান্ত ওখানে এত জনপ্রিয় হয় যে ১৯৫৩-তে সুকান্তর নিজস্ব কবিতার একটা চেক অনুবাদ বেরোয়—ক্ষুধা ও বিদ্রোহের গান (Piscne Nladu a Revolnoc)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশির চট্টোপাধ্যায় 21 Poems by Sukanta Bhattacharyya নামে একটা বই প্রকাশ করেছেন ১৯৫৪ : আগস্ট মাসে। কবিতা অনুবাদও করেছেন তিনি। বইটির বৈশিষ্ট্য এই যে, বইটির কোনো দাম নেই।

বইটির প্রথম পৃষ্ঠাতেই ঘোষণা আছে, For Private Circulation only, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় This book is not for sale ; requests for Copies may be made to the Translater…

এই বইয়ের ভূমিকায় অনুবাদক বলেছেন he belonged this earth. He was intimately connected with the Soil. কথাটি নতুন নয়, কিন্তু সত্যি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

সুকান্ত ছিল সেই মাটির কবি, তাই তার বাণী আজ এত মর্মস্পর্শী। ক্রমপ্রসারী।

তাই আজ সুকান্ত ইতিহাস।

পরিবারের একজন ॥ অশোক ভট্টাচার্য

আজকাল কে ক'কাপ চা খায় তার কি কেউ কিছু হিসাব রাখে।

অথচ কৈশোরে কবি সুকান্ত ইচ্ছেমতো আরাম করে চা-ই খেতে পেতেন না মোটে। তার প্রথম কারণ বাড়িতে চায়ের কোনো পাট ছিল না। আর

দ্বিতীয় কারণ বাড়ির পরিবেশ। যদিও ঘরের দেওয়ালে কোনো লেখা ছিল না চা খাইলে মার খাইবে। কিংবা 'চা খাওয়া মহাপাপ' তবুও বাবার সাত্ত্বিক জীবনযাত্রার স্পর্শে চারিদিকেই যেন নানা অদৃশ্য নিষেধাজ্ঞা ছড়ানো ছিল। সুতরাং কবির আর জুত করে চা খাবার উপায় ছিল না।

অথচ যে কবি শুধু মাত্র কবি নন বিদ্রোহী কবি, তিনি কি কখনও এমনিভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে দিতে পারেন ?

এ প্রসঙ্গে মনে আছে এক বিভ্রাটের কথা। বোধ হয় সেদিন কোনো ছুটিছাটা ছিল। আমরা ক ভাই দুপুরে ঘরেই বসে আছি। এমন সময় মেজদা (অর্থাৎ কবি) আর তাঁর এক বন্ধু এসে ঢুকলেন হঠাৎ। বন্ধু এসে আমাদের কাছে বসে কার কতটা পড়া হল না হল তার খবর নিতে আরম্ভ করলেন অযাচিতভাবেই। তখনও বোঝা যায় নি ব্যাপারটি। একটু পরেই মেজদা এক পাত্র গরম জল নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার উঁচু চৌকাটে পা আটকে পড়ে গেলেন। আর সেই গরম জল আমার আর মেজদার গায়ে ছড়িয়ে পড়ে হৈ-হুল্লোড় আর্তনাদের সৃষ্টি করল।

দুই বন্ধুর মুখ ততক্ষণে পাংশু হয়ে গেছে।

যাই হোক, নারকেল তেল চুনের ব্যবস্থা হল। আমার অঙ্গেও তা মাখানো হল। কিন্তু মেজদা চুন মাখতে রাজী হলেন না। কারণ তিনি একটু গোঁড়া ছিলেন—অর্থাৎ চা খাওয়া পছন্দ করতেন না—মোটেই। তাই মহা ক্রুদ্ধ হয়ে বসে রইলেন চুপচাপ।···

বিদ্রোহী কবি পরিবারের মধ্যেও এমনিভাবে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে ছিলেন। ইতিপূর্বেই কলেজের ছাত্র হয়ে বড়দা হয়তো অনেক নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন, কিন্তু সে সমস্ত বাড়ির বাইরে। ক্রমে ক্রমে মেজদার দৌলতে বাবাকে লুকিয়ে পেঁয়াজ—ডিম চালু হয়েছিল। কাজেই বলা যেতে পারে শুধু কথায় নয় কাজেও কবি ছিলেন বিদ্রোহী।

যখনকার কথা বলছি তখন আমরা বেলেঘাটার হরমোহন ঘোষ লেনে দেশের কায়দায় তৈরি জেঠামশায়ের শখের টিনের বাড়িতে থাকি। সে বাড়ির দোতলা ছিল কাঠের পাটাতনের ওপর। সেখানে স্তূপীকৃত থাকতো আমাদের প্রকাশিত রামায়ণ, ভাগবত, মহাভারত প্রমুখ ধর্মগ্রন্থের ফর্মা। এ সব ফর্মার দিকে চোখ ফেললেই বাংলার আদি ও অকৃত্রিম পয়ার ছন্দের সঙ্গে মোলাকাত ঘটতো। ফলে অজ্ঞাতেই কেমন যেন তারা আপন আপন প্রভাব বিস্তার করে যেত মনের মধ্যে।

তাই সেই সব ফর্মার স্তূপের আড়ালে চোর চোর খেলতে খেলতেই মিল আর ছন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল মেজদার।

এই দোতলার ওপরেই এক মজার কাণ্ড ঘটেছিল। তখন ব্ল্যাক আউট চালু হয়েছে। আর সেই সঙ্গে চোরের উৎপাতও বেড়েছে পাড়ায় পাড়ায়। মেজদা এখন জনরক্ষা সমিতির কাজকর্ম চালিয়ে চলেছেন পুরোদমে। এ সময়ে দেশ থেকে আমাদের এক স্বাস্থ্যবান খুড়তুতো দাদা আশ্রয় নিয়েছিলেন ঐ দোতলারই একটা অব্যবহৃত খাটের ওপর। রাত্রে তিনি এখানে শুতেন। একদিন অনেক রাত্রে সেখান থেকে আর্ত চীৎকার ভেসে এল নিচে, 'চোর! চোর ধরেছি চোর!' বড়দা আর আমাদের দোকানের জনৈক কর্মচারী পড়ি কী মরি করে ছুটে গিয়ে আলোয় আবিষ্কার করলেন চোর নয়, সুকান্ত। দেশের দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আর একটু হলেই মেরেছিলাম।

কিন্তু প্রশ্ন উঠল, এখানে সুকান্ত এল কেমন করে?

হয়েছে কী, নানা কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাওয়ায় বাবা দাদাকে জাগিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে সাহস হয় নি মেজদার। দোতলার একটা আলগা গরাদ তাঁর জানা ছিল তাই একটা টগর গাছে চ'ড়ে বারান্দার চালে উঠে সেই গরাদটাকে সরিয়ে তিনি ঢুকেছিলেন। ভেবেছিলেন চুপি চুপি নিচে নেমে রাঁধুনির ঢাকা দেওয়া ভাত খেয়ে নির্বিবাদে ঘুমিয়ে পড়বেন, কিন্তু বরাত ছিল মন্দ; তাই তিনি যখন গরাদ সরাতে ব্যস্ত তখন আমাদের দেশের দাদা অন্ধকারে ফর্মার আড়াল থেকে বিড়ি খেতে খেতে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন।

অনেক দিন পরের কথা।

এতো দিনে আমরা নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের একটা দোতলা বাড়িতে উঠে গেছি। তখন সবে দেশবন্ধু হাইস্কুলে ছাপা পত্রিকা প্রকাশ হতে চলেছে। প্রাক্তন ছাত্র বলে মেজদার কাছ থেকে নানা রকমের সাহায্য নিতে আসতেন সম্পাদক মশাই। সবাই, লিখতে পারুক আর না পারুক, লেখক হতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। বাড়িতে এক খুড়তুতো ভাই ছিল আমাদের। সেই বা পিছুপাও হবে কেন?

তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক নাতিদীর্ঘ পদ্য লিখে সে এসে বলল, মেজদা দেখে দাও। মেজদা কিন্তু বুঝতেন কার লেখা হবে কার হবে না,

তাই মনে মনে হাসলেন। তারপর খুড়তুতো ভাই-এর প্রথম লাইনের তলায় নিজের দ্বিতীয় লাইনটি জুড়ে ফেরত দিলেন। জিনিসটা দাঁড়ালো এমনি :

ভারতবর্ষ যেন রে আজিকে তপ্ত বারুদখানা,
কোনক্ষণে যেরে ডাকিয়া উঠিবে একটি ছাগল ছানা।

রসিকতা একটু গুরুতর হয়ে পড়েছিল। ফলে বেচারার কাব্য-জীবনের এইখানেই ইতি।

মেজদার প্যাঁচ থেকে কেউই বড় একটা রেহাই পেত না। আমাদের ছোট ক'ভায়ের একটি করে চরিত্রোপযোগী নামকরণ করেছিলেন তিনি। সেজদার ছিল গুরুগম্ভীর স্বভাব আর উপদেশ দেবার ধাত; তাই তার নাম দিলেন বিবেকানন্দ বিস্তাবাচস্পতি। তাঁর পরের জনের নাম দিলেন গুলমহম্মদ পি, আর, এস্ অর্থাৎ বিস্তর রাবিস সাপ্লায়ার (দাঙ্গার আমলে এঁর গুলের ঠেলায় টেকা ভার হয়েছিল)। ছোট ভাই একটু রাগী, তার নাম হল পি, পি, চোপরা (বিবি প্যাঁচা বদন ?)। বাকী আমার নামটা চেপে গেলাম।

যেচে কে আর হাস্তকর হয় ?

এতেই কী বাঁচোয়া।

একদিন মেজদা আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে একটি রূপক গল্প লিখে বসেছিলেন। একদফায় সেজদা বাদ পড়ল। বোধহয় তিনি এতদিনে যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েছিলেন বলে। পরে যথাক্রমে তিন ভাই বলদ, গর্দভ আর পাঠার রূপ ধারণ করে যাত্রা শুরু করলেন। কত রকমের ঝামেলাই সহ্য করতে হল তাঁদের !

তারপর তিনজনের মধ্যে কনিষ্ঠেরই হল জয়। তার একটি কারণ, নচেৎ সে কাঁদবে (যেন এমনই কাঁদতে বাকি ছিল)! আর অপর কারণ হল মহাপুরুষদের মতোই তাঁর পাঠাদের খানিকটা করে দাড়ি থাকে।

এমনি সহজ সরলভাবে দাদা হিসাবে আমাদের সঙ্গে মিশে থাকতেন তিনি। অবশ্য যখন তাঁর শরীর কাহিল হয়ে পড়তো কিংবা যখন কাজের চাপ থেকে কিছুটা রেহাই পেতেন তখনিই তাঁর সান্নিধ্য জুটতো বেশী। হয়তো সারাটা দিন নানা রাজনৈতিক কাজে বাড়ির বাইরে কাটত তাঁর।

সে কাজের অন্ত ছিল না।

আর সে কাজও ছিল বুঝি সারাটা শহর চষে বেড়ানো।

পরিবারের জন্য কোনো চিন্তা করতেন না তিনি। সারাটা দুর্ভিক্ষে স্বেচ্ছাসেবক

হয়ে খেটেছেন অথচ কোনোদিন স্বেচ্ছাসেবকের প্রাপ্য একখানা চালের টিকিট নিয়েও ফেরেন নি।

এমনিই আত্মহারা ছিল তাঁর কাজ।

এ গেল একটা দিক। অন্যদিকে বাড়িতে উন্নততর চিন্তায় আর রুচির সমাবেশ ঘটানোর দিকে ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। আমাদের সেই মা হারা ছন্নছাড়া দিনগুলোকে সুন্দর আর সজীব করে তোলার কত না চেষ্টা ছিল তাঁর। আর বড় আদর্শকে সামনে রাখতে শেখা তাও তাঁর কাছ থেকেই। তাই না প্রত্যেক ভাইয়ের একটা দুরন্ত ঝোঁক রাজনৈতিক জীবনের প্রতি। কলাশিল্প যে একটা বড় জিনিস তাও তাঁর কাছ থেকেই জেনেছি।

বাড়িতে নিজের হাতে বাঁধিয়ে বড় বড় শিল্পীর ছবি টাঙিয়ে ছিলেন তিনি। বড়দার বিয়েতে মেজদার বন্ধু অরুণাচল বসু একটা ছবি এঁকে উপহার দিয়েছিলেন বৌদিকে। মনে পড়ছে মেজদা ছবির মাথায় লিখে দিয়েছিলেন।

বৌদি তাকে শুনিয়েছিল দুটো কথার গান,
সে-ও দিলো তার দুটো রঙের টান।

এ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে আজকের মতো এ লেখা শেষ করবো। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মেজদার চরিত্রটা হয়তো একটু পরিষ্কার হবে। ছেলেবেলায় আমি পেন্‌সিল দিয়ে নানারকমের ড্রইং করতুম। এতে মেজদার উৎসাহ ছিল খুব। তিনি তখন 'স্বাধীনতা'র কিশোর সভার সম্পাদক।

একদিন বললেন, চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে একটা কিছু এঁকে দে, ছাপিয়ে দেবো। আমি খেটে-খুটে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি এঁকে তাঁকে দিলাম। তিনি দেখে খুশি হয়ে বললেন, বেশ হয়েছে। তারপর কদিন বাদে ধরলাম ছবি ছাপার কতদূর হল।

তিনি দুঃখিত স্বরে বললেন, না রে হল না। সুভাষদাকে (মুখোপাধ্যায়) দেখিয়ে তোর কথাটা বলতেই তিনি এমন বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে তুই ভাই বলেই তোরটা আর ছাপাতে পারলেম না।

শ্লোক ॥ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশের বেড়ার ভেতর লম্বায় চওড়ায় কয়েক হাত মাত্র জায়গা। করুণ স্নেহের মতো শ্যামল আচ্ছাদনে ঢাকা। আজ আর এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন নেই। সময় সেখানে সবুজ সমারোহে সলজ্জ ঔদ্ধত্যে মাথা তুলতে চায়।

আমরা চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ালাম। আমরা পুব আর পশ্চিম বাঙলার অনেকগুলি ভাইবোন। কলকাতার সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ফুলে মালায় সেই একটুকরো জমিকে অপরূপ সাজিয়ে দিলেন। যেন সুরের ছোঁয়ায় কবিতা গান হয়ে উঠল। বাঁশের বেড়াটা শক্ত দু-হাতে চেপে ধরলাম। ঝাপসা দুটো চোখ বার বার গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে বুলেটের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত সামনের মেডিকেল হস্টেলের দেওয়ালটায়।

ওরা বলেছিল—আমাদের মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে দেবে না; আলাওল আর রবীন্দ্রনাথ, পদ্মাতীরের মাঝি আর গঙ্গাপারের কৃষকের গানকে দেবে না স্তব্ধ করতে। তাই গুলি।

মেডিকেল হস্টেলের প্রাঙ্গণে মুখ থুবড়ে দু-হাতে মাটি আঁকড়ে ধরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল বরকত সালাম, আরও কতজন। পুলিসের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে রাতারাতি সেইখানে মাথা তুলল শহীদের স্তম্ভ। আবার দিনের আলোয় সেই পবিত্র স্মৃতি-মন্দির সৈন্যদের বুটের লাথিতে মাটিতে মিশে গেল।

কিন্তু।

বেয়নেটের ফলা উঁচিয়ে দস্যুরা যে-প্রতিজ্ঞাকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল, জীবনের তরঙ্গে সেই প্রতিজ্ঞা আসন্ন বিদ্রোহের সঙ্কেত রক্তপদ্মের মতো ভেসে বেড়াল দিকে দিগন্তে, এমন কি দেশ থেকে দেশান্তরে। হলো আন্দোলন। তারপর নির্বাচন। ওরা জিতল। ওরা—যারা পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বস্তরের সচেতন মানুষকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়েছিল। বাঁশের বেড়ার ভেতর লম্বায় চওড়ায় কয়েক হাত মাত্র জায়গা।

ইতিহাস।

রাধারাণী দেবী বলেন—তিনি মা, তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাই তিনি এই ছেলেদের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারেন।

তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে থেমে গেলেন হঠাৎ।

কোনো কথা বলল না আর কেউ।
পারল না বলতে।
আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।
সন্তানের রক্তে মায়ের চোখের জল মিশেছে। আর বক্তব্য কিইবা থাকতে পারে?
ফিরে যাব ভাবছিলাম।
কিন্তু তার আগেই হঠাৎ চট্টগ্রামের উর্দু কবি, নাজ পারভেজ, খুলে ধরলেন তাঁর কবিতার খাতাখানা—একটু আগে সেই ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনে যে-খাতা থেকে তিনি সকলকে পাবলো নেরুদার অনুবাদ-কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন।
হাল্কা ঘি রঙের প্যান্ট আর বুশ শার্টে মোড়া সেই আশ্চর্য ঋজু চেহারা কোনোদিন ভুলব না। বাঁ হাতে খাতা ধরে ডান হাতে মুঠি পাকিয়ে হৃদয়ের প্রবল যন্ত্রণা, প্রচণ্ড আক্রোশ আর অপরিসীম ভালোবাসা দিয়ে তিনি শুরু করলেন কবিতা পড়তে।
আমার গৌরব, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের আমি সাক্ষী। আমার প্রেরণা, সেই আশ্চর্য সেতুবন্ধের আমিও এক দ্রষ্টা।
উর্দুতন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙলাভাষার আন্দোলনে যারা বুকের রক্ত ঝরিয়েছে, তাদের স্মৃতি-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে এক উর্দু কবি পড়ছেন আমাদের সুকান্তের কবিতা।
মনে হলো, শোক এবার শ্লোক হয়ে উঠেছে।
শুধু রক্ত নয়, শুধু অশ্রু নয়। আরো কিছু, অন্য কিছু!

বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ॥ ধনঞ্জয় দাশ

রবীন্দ্রোত্তর বাঙলাকাব্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় নাম। মাত্র একুশ বছর বয়সে ১৩৫৪ সালের ২৯শে বৈশাখ, রাজব্যাধির কঠিন আক্রমণে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। সুকান্তের মৃত্যুর পর বাইশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতিক্রান্ত এই বাইশ বছরের মধ্যে আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছি যে, বাঙলাদেশ সুকান্তকে বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁর কবিতাকে অধিকতর ভালোবেসে তাঁকে হৃদয়ের সিংহাসনে ক্রমান্বয়ে আরও

দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। সংস্করণের পর সংস্করণ সুকান্তের কাব্যগ্রন্থগুলি যেভাবে নিঃশেষিত হয়েছে, সে-দিকে লক্ষ্য করলে তাঁর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

অথচ কত স্বল্পায়ু ছিল সুকান্তর জীবন। তাঁর কবি-জীবনের পরিধিও ছিল সময়ের হিসেবে কত ছোট। এই ক্ষীণায়ু জীবনে সুকান্ত হয়তো তাঁর কাব্যসাধনার শ্রেষ্ঠতম ফসল আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাঙলার কাব্যগগনে পূর্ণ পরিণতির স্বীকৃতি নিয়েই সুকান্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার মধ্যে শুধু ভবিষ্যতের সম্ভাবনাই লুকিয়ে ছিল না, ছিল সুনিশ্চিত পরিণতির সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। সুকান্তের মতো অল্প বয়সে দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সুধী-সমাজের কাছ থেকে এতখানি সাফল্যের স্বীকৃতি এ-দেশের অন্য কোনো কবি আজও অর্জন করতে পারে নি বলে আমার বিশ্বাস।

সত্যিই, বাঙলার কাব্য-সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই সুকান্ত এসেছিলেন। তাঁর অলৌকিক কবিত্বশক্তি চল্লিশের দশকে একটা নতুন যুগেরই সূচনা করে। তিরিশের দশকে তাঁর পূর্বসূরী কবিরা ম্লান মানবিক মূল্যবোধ জীবনসম্পর্কে সংশয় ও নৈরাশ্য, আত্ম-সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে শ্লেষ ও ব্যঙ্গকে আশ্রয় করে প্রায় নেতিবাদী এক কাব্য-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন। সুকান্ত প্রায় এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে চল্লিশের দশকে ইতিবাচক জীবন-দর্শনের আলোকে নতুন পথেই যেন যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর কাব্যে ইতিহাস-সচেতনতা, মানবিক আবেগ, হতাশার পরিবর্তে আশা, গ্লানি ও কুশ্রীতার বিরুদ্ধে শাণিত ব্যঙ্গ, আত্মসমালোচনা, বিশুদ্ধ মনন নির্ভরতার পরিবর্তে পারিপার্শ্ব ও সমাজ-সচেতনতা, দেশজ কাব্য-ঐতিহ্য গ্রহণের সদিচ্ছা, আঙ্গিকগত উৎকর্ষতা অপেক্ষা বিষয়-গৌরবের প্রাধান্য ইত্যাদি—চল্লিশের কাব্য-আন্দোলনের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি সবচেয়ে সার্থকভাবে জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করল। এই সব ক্ষেত্রে সুকান্ত তাঁর সমসাময়িক কবিদের যে শুধু অতিক্রম করেছেন তা নয়, অনেক সময় তাদের পথ-নির্দেশকের ভূমিকাও পালন করেছেন। মোটকথা, আমরা দেখলুম, সুকান্তের সমাজ-সচেতন দৃষ্টি, সদাজাগ্রত মন, গণমুখী সাধনা আর বজ্রকঠোর লেখনী বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে সংযোজন করল একটি নতুন অধ্যায়।

সুকান্তের কবি-মানসকে বুঝতে হলে এই সময়কার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাস্রোতকেও কিঞ্চিৎ অনুধাবন করা প্রয়োজন। কারণ আমরা জানি, সাহিত্যে চিরকাল একটি নির্দিষ্ট যুগের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

জীবনের ভাবাদর্শই প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। সুকান্তের কাব্যেও আমরা তাঁর যুগের ভাবাদর্শগত প্রতিফলন স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পারি। বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব, পৃথিবীব্যাপী ফ্যাশিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনতার সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশে গণ-অভ্যুত্থান, দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন বাঙলার হাহাকার, সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী মানুষের মধ্যে নতুন সংগঠন ও চিন্তা ভাবনার বিস্তার—এর সব কিছুই সুকান্তের কবিমনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই একদিন শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক চেতনা যেমন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশভূমির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনাতেও তাঁর কবি মন বারংবার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠ করলে যে-কোনো সহৃদয় কাব্য-পাঠক বুঝতে পারবেন যে তৎকালীন বাঙলার মর্মান্তিক বেদনা তাঁর কণ্ঠে ভাষা যুগিয়েছিল, শাসকগোষ্ঠী, মজুতদার আর মিলমালিকের হৃদয়হীন বর্বরতা সেই ভাষায় দিয়েছিল বজ্রের কাঠিন্য এবং বর্বর পাপের ও শ্রেণী-বৈষম্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেঙে নতুন সমাজব্যবস্থা পত্তন করার দুর্জয় বিশ্বাসই তাঁকে করে তুলেছিল বিদ্রোহী। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে যে শ্রমিক-কৃষক অমৃতময় ভবিষ্যৎ রচনা করতে চায় সুকান্ত ছিলেন তাঁদেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁর কবিতাতেও তাই ধ্বনিত হয় :

> 'প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
> দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;
> তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
> তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।'

সুকান্ত কাব্য-বিলাসের সহজ-সরল প্রচলিত পথে মূক জনতাকে কোনোদিন প্রবুদ্ধ করতে চান নি। তাদেরই একজন হয়ে, তাদেরই ভাষায়, তাদের কথা, তাদের দাবি তিনি মহাকালের দরবারে বজ্রমন্দ্রস্বরে ঘোষণা করে গিয়েছেন। সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের নকল সৌখিন মজদুরী নয়, তাজা বুকের লাল রক্তে সুকান্ত লিখে রেখে গেছেন নতুন যুগের নতুন ইতিহাস। সুকান্ত-পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে যে প্রয়াস ক্ষীণধারা ফল্গুর মতো বদ্ধ মরু-মৃত্তিকায় প্রকাশের পথ খুঁজছিল, সত্যি-কথা বলতে কি, সুকান্তই তাঁকে দিলেন নতুন পথের সন্ধান। তাঁর কবিতা যেন সেই ক্ষীণতোয়া স্রোতধারায় নবজীবনবন্যার দুর্বার কলকল্লোল নিয়ে উপস্থিত হল। ব্যাপ্তিতে সামান্য হলেও সুকান্তের কাব্য-সাধনা তাই তাৎপর্যদীপ্তিতে ভাস্বর ; বিরাট তার আবেদন, বিপুল তার সম্ভাবনা।

আমরা জানি, বাঙলা-কাব্যে সুকান্তের এই আবির্ভাব আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশকাল ও সাহিত্য-পারম্পর্যের অবিচ্ছিন্ন সূত্র ধরেই সুকান্তের মৃত্যুর পর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাই বলতে হয়েছিল : 'যুগের দাবিকে কেন্দ্র করিয়া সুকান্তের কবি-প্রতিভা জন্মলাভ করিয়াছিল ; তাই রবীন্দ্রযুগে নজরুল প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির আবির্ভাবের ন্যায় সুকান্তপ্রতিভাও অত্যন্ত স্বাভাবিক, মোটেই আকস্মিক নয়। বাঙলার আত্মিক-প্রতিভার ইহা এক নতুন স্ফুরণ।' শান্তি ও সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন শ্যামল বাঙলার অপর্যাপ্ত সমুদ্রের শীর্ষচূড়ায় দাঁড়িয়ে বুকভাঙা বেদনায় সুকান্ত বলেছিলেন :

'এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম
অবাক পৃথিবী। সেলাম, তোমাকে সেলাম'।

এই দুটি পঙ্ক্তির মধ্যে শুধু ব্যক্তি-সুকান্তের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনের হাহাকারই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় নি, পরাধীন ভারতের গ্লানিময় জীবনের যন্ত্রণাকেও তিনি ব্যক্ত করেছেন ব্যঙ্গের শাণিত ভাষায়। ব্যক্তি-জীবনের বঞ্চনার রিক্ত বেদনায় সুকান্ত তাঁর সমাজ ও শ্রেণীর বেদনাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তথাকথিত চিরাচরিত প্রথায় প্রিয়া, ফুল, প্রেম আর কুমারী মেয়ের মদির যৌবনের মধ্যেই কাব্যের সৌন্দর্যলোক খুঁজতে চেষ্টা করেন নি ; বরং এই পথে হাঁটতে অস্বীকার করেছিলেন বলেই আমরা পেয়েছিলাম 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'মিঠে কড়া' ও 'পূর্বাভাস'-এর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনসায়াহ্নে যে 'মাটির কাছাকাছি' কবির আবির্ভাব কামনা করেছিলেন, সুকান্ত ছিলেন সেই মাটির কাছাকাছি মাটির মানুষদেরই সহযাত্রী। সুকান্ত কাব্যালোচনায় অগ্রসর হলে এ-কথার সত্যতা স্পষ্ট হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল—এই পাঁচটি বছরই সুকান্তের কবি-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের কাল। ১৯৪৩-এর শবসমাকীর্ণ বাঙলার মহাশ্মশানে যুদ্ধ আর মন্বন্তরের বিভীষিকার মধ্যে তাঁর যাত্রা শুরু, আর ১৯৪৭ সালে বিদেশী শাসকদের কুটিল চক্রান্তে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের অহেতুক রক্তপাতের মধ্যেই আমরা দেখলাম সুকান্তের কবি জীবনের অকাল সমাপ্তি। এই পাঁচটি বছরে আমাদের সচেতন ও অবচেতন মনে যে কয়টি সঞ্চারী ভাব মুখ্য হয়ে উঠেছিল—সুকান্তের প্রতিটি কবিতায় আমরা শুনতে পাই তারই অনুরণন। যুগ-সত্যকে তুলে ধরার জন্য রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল আশাবাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েও ১৯৪৩ সালে তাই তাঁকে বলতে হয়েছিল :

'আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।'

এরপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে সুকান্ত যখন ১৯৪৩ সালের ব্যথা-করুণ ইতিহাসের পর্যালোচনা করলেন তখন তাঁর বিস্মিত ভাব কেটে গিয়েছে, তাঁর মনে জন্ম নিয়েছে ক্রোধ আর ক্ষোভের অগ্নিজ্বালা। যে মজুতদার-চোরাবাজারীর দল ১৯৪৩ সালে সারা বাঙলার দুঃখদুর্দশার মূল কারণ, জনগণের কবি সুকান্ত জনগণের পক্ষে থেকে তাদের বিরুদ্ধে জানালেন রৌদ্রজ্বালা ভাষায় চ্যালেঞ্জ :

'শোন্ রে মালিক, শোন রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।'

কবি সুকান্ত এই চেতনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙলার আর্তিকেই সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। জনতার সঙ্গেই তিনি এখানে একাত্ম। তাঁর এই 'আমি'-র অর্থ বিরাট জনতার অপরিসীম শক্তি সম্পর্কে বিপুল আত্মসংবিৎ, সর্বস্বহারানো জনতার ক্রোধই যেন বিরাট রোষে এখানে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। আমরা পূর্বেই বলেছি, সুকান্ত ছিলেন যুগ-সচেতন কবি। নতুন দিনের যুগ-দেবতার আগমন-রথ-ঘর্ঘর শুনতে পেয়েছিলেন বলেই আগামী বিপ্লবের জয়শঙ্খ বাজাবার বিরাট গুরুভার তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সুকান্ত জানতেন, আসন্ন যুগের সেই নব জাতকের দল জন্ম নিচ্ছে মিলে-ময়দানে গ্রাম-

বাঙলার পর্ণকুটিরে, বস্তি-এলাকার অন্ধকার বদ্ধঘরে। এদের উদ্দেশে অভিনন্দন জানিয়ে সুকান্ত নির্দ্বিধায় তাই অঙ্গীকার করেন :

'এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

অকৃত্রিম মানবপ্রেম অপূর্ব সমপ্রাণতা সুকান্ত-কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুকান্তের পূর্ববর্তী আধুনিক কবিদের কাব্যে ব্যষ্টির দুঃখকে সমষ্টির সামগ্রিক বেদনায় রূপায়িত করার দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল। সুকান্তের কবিতায় এই মানবপ্রেম ব্যক্তি-সীমাকে অতিক্রম করে সমবেদনার অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়ে এক নতুন অমৃতের আস্বাদ বহন করে এনেছে। 'প্রার্থী' কবিতাটি এরি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'রানার' কবিতার মধ্যেও আমরা এই সমপ্রাণতার সুন্দরতম অভিব্যক্তি খুঁজে পাই। বঞ্চিত জীবনের রিক্ততা যে কত গভীর ও বেদনাদায়ক এই কবিতায় সুকান্ত তা আশ্চর্য শিল্প-নৈপুণ্যে ব্যক্ত করেছেন। রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে কম্পিত করে ক্ষুধিত রানার রাজ্যের 'মেলে' তুলে দিচ্ছে। দিন যায়, রাত আসে। রানারের চিঠির বোঝাও বেড়ে যায়। কত গ্রাম, কত বন-প্রান্তর পেরিয়ে তার রাতের পাড়ি চলতে থাকে। রাতের পর রাত সে অন্ধকারে প্রেতের মতো দুনিয়ার সংবাদ বহন করে চলে। কত সুখে, প্রেমে-আবেশে-স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে নর-নারী তাদের প্রিয়জনদের উদ্দেশে চিঠি লেখে আর সেই চিঠি, সেই খবর রানার পৌঁছে দেয় ঘরে ঘরে—এ সংবাদ সুকান্ত যেমন রাখেন তেমনি তিনি গভীর বেদনায় লক্ষ্য করেন :

'এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে।
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।'

সুকান্ত কর্মের জোয়ালে-বাঁধা রানারের এই ব্যর্থ-পরিক্রমার কথা অতুলনীয় দরদের সঙ্গে কাব্যের মাধ্যমে রসোত্তীর্ণভাবে ব্যক্ত করেছেন :

'ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের বহু রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।

বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য

অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।'

রানারের অভিশপ্ত জীবনের এই ট্রাজেডির মধ্যে বিশ্বের সমস্ত বঞ্চিত মানুষের পীড়িত আত্মার মর্মভেদী আকুল হাহাকারই যেন প্রতিফলিত হয়েছে। রানারের ব্যথা নিখিল মানুষের সার্বজনীন বেদনার সঙ্গে মিশে অপূর্ব এক কাব্যালোক সৃষ্টি করেছে এখানে। সুকান্ত এক্ষেত্রে সত্যিই একক ও অনন্য। অন্তত রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা-কাব্যে তাঁর এই স্থান পূর্ণ করার মতো দরদী কবি এখনো অঙ্গুলিমেয়। প্রতীকধর্মী যে-সব কবিতা সুকান্ত লিখেছেন তার মধ্যেও আমরা পাই এমনি এক কবি-মনের স্বাক্ষর। 'চিল', 'চারাগাছ', 'একটি মোরগের কাহিনী' প্রতীকধর্মী কবিতা রূপে বাঙলা-কাব্যে চিরস্থায়ী আসন পাবে বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করি।

সুকান্ত আ-মৃত্যু শুভ কর্মপথে নির্ভয় গান গেয়ে আমাদের কানে কানে নতুন যুগের উদ্বোধন বাণী শুনিয়ে গেছেন। একদিকে তিনি গেয়েছেন জীর্ণ পুরাতনের ভাঙনের গান, অন্যদিকে জানিয়েছেন—'কর্ষিত মাটির পথে পথে নূতন সভ্যতা গড়ে পথ'।

সুকান্তের সহযাত্রী ভারতবর্ষে মজুর চাষী অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে মিলিত-ভাবে আজ বুকের রক্ত ঢেলে সেই নতুন সভ্যতার বনিয়াদ পত্তন করতে চলেছে। সুকান্ত যখন বলেছিলেন, 'বিদ্রোহ আজ চারিদিকে', তখন তার মধ্যে হয়তো কিছু কাব্যিক আতিশয্য ছিল, কিন্তু আজ ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে এ-কথা আর নিরর্থক মনে হয় না। দেশের নিচের তলার অবজ্ঞাত মানুষ সুকান্ত প্রদর্শিত পথেই যেন ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে। শপথ-কঠিন রক্তের অক্ষরে হয়তো একদিন লেখা হবে এই শোণিতক্ষরা সংগ্রামের কাহিনী। ঐতিহাসিক সংগ্রামের নিষ্ঠাবান কবি-সৈনিক সুকান্তের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল ভবিষ্যতের এই চিত্র—একথা যেন আমরা ভুলে না যাই। একদা জনতার মিছিলে দাঁড়িয়ে তিনি জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন বিপ্লব-মন্ত্রের সেরা ঋত্বিকের মতো। একদিন তিনিই তো বন্ধুদের উদ্দেশে 'ঠিকানা' জানিয়ে লিখেছিলেন :

'বন্ধু, আজকে বিদায়!
দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা ক'রো॥'

স্বাধীনতার বাইশ বছর পরে 'মুক্ত স্বদেশে'-র এই ঠিকানা কি আমরা আজও খুঁজে পেয়েছি? যদি না পেয়ে থাকি তবে এই ঠিকানার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকাই হবে বাঙলার বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতি তাঁর উত্তরসূরীদের শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম উপায়।

সুকান্ত নিয়ে কবিতা ॥ শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকান্তের প্রতি ভালবাসা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁর নিষ্ঠার প্রতি আন্তরিকতা জানিয়ে সুকান্তের তিরোভাবের পর বাংলাদেশের প্রগতিশীল কবিরা কবিতায় সুকান্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন, সুকান্ত সর্বকালের তারুণ্যের প্রতীক বা প্রতিনিধি।

এও সত্য, যেখানে আশা উদ্দীপনা আর সহিষ্ণুতার সংগ্রাম সেখানেই সুকান্তের বলিষ্ঠ ঘোষণা। মানুষকে ভালবাসার ইতিহাসে সুকান্ত একটি আশ্চর্য নাম।

স্মরণ করি, মাত্র একুশ বছর বয়ঃসীমায় কবি সুকান্ত বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নতুন দিক উন্মোচিত করেছেন, যা আজকের জগতে এক নতুন পথের দিশারী।

সুকান্তকে নিয়ে অনেকেই কবিতা লিখেছেন, নিঃসন্দেহে তার প্রয়োজন ছিল, বা আছে বলেই এ আলোচনার সূত্রপাত। সুকান্তকে স্মরণ করে খ্যাতনামা সাহিত্যিক স্বর্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন :

"চৈত্রের পরিচয়ে তুমি সূর্য হতে চেয়েছ।
তোমার যক্ষ্মা হয়েছে?
তোমার তরুণ রশ্মি দেখে ভেবেছিলাম,
বাঁচা গেল কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।"

তারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন কবি অরুণ মিত্র তাঁর কথায় 'কী ভেবেছিল সুকান্ত' নামক কবিতায়, অরুণ মিত্র লিখেছিলেন :

'মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছিল সুকান্ত?... ভালবাসার আশায়, নৈরাশ্যের, মৃত্যুর, আরোগ্যের, সংগ্রামের সেই তীব্র হারানো ভাষা যাদবপুরের রোগীদের বিছানায় ছড়িয়ে আমাদের সকলের ঘরে এসে

তোলপাড় বাধিয়ে দেবে।...রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা বলতে গিয়ে আরও বলেছিলেন :

"বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ ?
কে গাইবে জয় গান ?
বসন্তের কোকিল কেসে কেসে রক্ত তুলবে,
সে কিসের বসন্ত ?

কবি কিশোর সুকান্তর অকাল বিয়োগে বিষ্ণু দে লিখলেন :

"ভোরে সূর্যে রক্তের স্বাদ লাগে
সে কার রক্ত
বীরের রক্তস্রোতে কেন জাগে মাতার অশ্রুজলে
মাতার রক্তে পথের ধূলায় জাগে
সূর্যোদয়ের রাঙা
শক্ত আলোয় পাণ্ডাশ দিনের চুরমার হাহাকার
হে নবজীবন আনো যৌবন নীলাকাশ জ্বলজ্বলে।"

কবি বিষ্ণু দের কবিতার সুরে সুর মিলিয়ে বিমলচন্দ্র ঘোষ সুকান্তকে স্মরণ করলেন, ব্যথা বেদনার মধ্যে দিয়ে :

"আহা নবযুগে নওল কিশোর!
কেঁদে ফিরে গেল সারা নিশিভোর
মুছে গেল কাল-বৈশাখী মেঘে
শিশু-সূর্যের রক্ত
এ যে নিদারুণ সত্য।"

কিন্তু কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কিশোর কবিকে উদ্দেশ করে জানালেন :

"অকস্মাৎ মনে হয় মেঘে মিশে নবধারাজলে
তোমার চিতার ছাই রাশি রাশি সোনার ফসলে
ঝরবে বাংলার খেতে মজুরের কৃষকের গানে
আবার বাঁচবে তুমি এ-মাটির উদ্দাম আহ্বানে।"

সুকান্তর জীবনে কাব্যের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত নীরব দর্শকের মতো ছায়ার মতো কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্তকে দেখেছিলেন। 'সুকান্তকে আপন করে নিয়ে

একটা বিরাট প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনায় তিনি স্থির ছিলেন। কিন্তু সুকান্তর তিরোভাবে তাঁকে মনে করেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় লিখলেন :

"যৌবনের পদপ্রান্তে যে কৈশোরের ছিন্ন শির উপহার দেয়
বসন্তকে পুড়িয়ে মারে দাউদাউ দাবাগ্নি শিখায়
যে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় স্বপ্নের দড়ি নাকে দিয়ে
বঞ্চনার অভিশপ্ত পথে
সুকান্ত, তোমার সেই আততায়ীকে
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে
তোমাকে বাঁচাবো।"

'সুকান্তকে' এই নামের মধ্য দিয়ে মণীন্দ্র রায় তাঁর কবিতায় জানালেন :

"দেহ তো, সবাই জানে
কালের আহার ;
সময় চিবোয় নিত্য
মেদমজ্জা যত উপচার।
কিন্তু কেউ কেউ থাকে
খায় যে সময়
কালের গরল বুকে
চিরায়ু সে, স্মৃতির সঞ্চয়।
তেমনি সুকান্ত তুমি
আমাদেরও ঘরে
চোখের আড়ালে চোখ
স্পর্ধা তুমি মৃত্যুর শিয়রে।"

'কবির মৃত্যু' এ কথাকে অনুভব করলেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, তিনি বললেন এক আশ্চর্য শক্তির অমেয় বাণীতে। সুকান্তর জীবনবোধের চেতনা তীব্র থেকে তীব্রতর, তাই বললেন বুঝি :

"আমার গান।
জন্মেছিল ঝড়, ঝড়ের
ঝনঝন ; এই গান গভীর
বাজ বাজলো মাদল ঢেউ রুদ্র ঢেউ দুললো বুক
টললো যুগ অহল্যার ঘুম টললো

ভাঙলো বাঁধ
ভাসলো দিক চিহ্নহীন জলে জীর্ণ সময়, বাসি
সময় শেষ
পচা পাতায়,
পায়ের নিচে তবু মাটির চাপ দু'পায়ে মাটিকে ধরা
মাটিতে ধরা
পায়ের নিচে তবু ঘাসের শিষ কি শিখা
শিরশিরিয়ে
শরীরে সেই আগুন-সুর
ঘনায় গান ঘনায়
গান মাটির গান মাটিরই মাজা
উঠোনে বাঁধা বেড়ায় ঘেরা
দাওয়ায় তকতকে নিকনো
মাটির গান মনের গান মনের ঘর বাঁধার।"

সতীন্দ্রনাথ মৈত্রী 'সুকান্ত'কে স্মরণ করলেন, তিনি বললেন :

"সুকান্ত, তুমি—
অবিনশ্বর শান্তির প্রদীপের মতো
আমাদের চোখের তারায় জ্বলছ।"

শান্তি বসু স্মরণ করলেন :

"তোমার নামে মায়ের চোখে সজল হয়ে ওঠে।
এখানে গ্রামে তোমার নামে স্মরণ কথা কাড়ে।"

জনতার কবি সুকান্ত, তাই জনগণকে উদ্দেশ করে 'সুকান্ত নতুন দিন' কবিতায় রামেন্দ্র দেশমুখ্য লিখলেন :

"জনগণ জংগীকাব্যের কিশোর ভগীরথ ছিল সুকান্ত এ দেশে
সে ক্ষুধিত মজুর, তবুও পাখা জয়োন্মত্ত
ছিল লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা চোখে তার
চিনলাম কেবল মৃত্যুর পরেই তাকে
সেই কবি-শ্রমিক, কবি-কৃষক, দৃপ্ত কিশোরকে

'কলমের' আত্মসমর্পণের আগে তার
বিদ্রোহের ডাক।

জনগণ,
প্রাক্-বিপ্লব যুগের বিদ্রোহী তারকা সুকান্ত
তারই আলো রাত্রিকে ছাড়িয়ে আজ দিনে পৌঁছেচে
যে-তারা আমাদের রক্তে একদিন জোয়ার এনেছিল,
সে-তারার উদ্ঘাটনকে এখনও বাকী আছে!
যে-তারা হারিয়ে গিয়েও হারায় নি
পড়ুক, সে-তারার আলোক
তোমাদের ওপরেই পড়ুক।"

সুকান্তকে নিজের সাথী করে নেবার তীব্র বাসনায় সিদ্ধেশ্বর সেন লিখলেন :

"সুকান্ত তুমি আমার সাথে চলো।
সুকান্ত তুমি আমাকে গান শোনাও।
আমি চটকলের লোহাকলের ধর্মঘটী ভাই,
ভুখা আছি, তবু উঁচু মাথা না নোয়াই,
শত্রুকে চিনেছি ঠিক
তুমি শুধু হেঁকে বলো,
সুকান্ত, তুমি আমার আগে দাঁড়াও।"

সুকান্তর প্রতি গভীর মমতা আর করুণা নিয়ে এগিয়ে এলেন অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত আর গোবিন্দ চক্রবর্তী। তাঁদের কবিতার মধ্যে ধরা পড়ল এক সংগ্রামের পটভূমিকায় সুকান্ত জীবনী-চেতনার উন্মেষ। অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত লিখলেন :

"সুকান্ত, আমারো চোখে ঘুম নেই আজ
কাকদ্বীপের কান্না শুনি নবজাতকের,
পিশাচেরা কেড়ে নেয় মুঠি মুঠি ধান—
বুলেটে হয়েছে বিদ্ধ তাজা তাজা প্রাণ
মাটি হয়ে ওঠে লাল রক্তে রক্তে মৃত শহীদের
সেখানে হাজারো তুমি, কার্তিক-শিশির ভরদ্বাজ।"

সুকান্ত নিয়ে কবিতা

গোবিন্দ চক্রবর্তী বললেন :

"নগরে, বন্দরে, প্রান্তরে
তোমার স্বপ্নের মেঘ বৃষ্টি হ'য়ে ঝরে
রোল তোলে সে কোন সিন্ধুর।
বাঁজা ডাঙাতেও তাই আশ্চর্য অঙ্কুর
মাথা তোলে আজ।
আর বেশী দূরে নয় প্রাণের সমাজ॥"

সুকান্তর মৃত্যুতে আমাদের প্রতিটি মানুষের মনে নিষ্ঠুর সত্য আর বিষণ্ণ বেদনায় জর্জরিত হয়েছে। এই পৃথিবীর জরাজীর্ণতা ভেদ করে সুকান্তর কবিতা ও কবিকে আমরা নতুন করে বাঁচাব এই প্রতিজ্ঞার বাণী নিয়ে 'দুঃখে ইতিহাসে' কবিতায় তরুণ সান্যাল বলে উঠলেন :

"ঘৃণায় মুখ দেখোনা, আমি দুয়ার দিই ঘরে
দেয়াল কেন চমকে ওঠে ফাটা মাথার খুলি,
কে ওরা আঁকে দীঘল চোখ রক্তরাঙা করে
চতুর্দিকে ধোঁয়া কিসের কাঁদানে গ্যাস, গুলি ?
মৃত্যু ছড়ায় হাওয়ায়, কারা তাজা শিশুর প্রাণ
রান্না ঘরে, শাদা ভাতে কি অমন রাঙা ফ্যান
ভোর বেলার ধোঁয়া আকাশে গলে পড়েছে ছিটে।"

চেতনার প্রান্তদেশে এসে মিছিলের সারিতে এক ঝলক নতুন রোদের মতোই সুকান্তকে মনে করে বিমল ভৌমিক লিখলেন :

"অশান্তির ছায়া নামে বাঙলার আকাশে
তোমার চিতার শিখা তোমার চোখের ছায়া নামে
তুমি এক বোধনের কবি
আমাকে কি মনে পড়েছিল
আমাকে স্মরণ করো কবি
তাই আজ তোমার স্মরণ।"

সুকান্ত নিয়ে কবিতা লিখেছেন অনেকেই এখানে তার মাত্র কয়েকজনের কথাই উল্লেখ করা হল। সুকান্ত আমাদের জীবন, সুকান্ত আমাদের জনতার কবি, তাই সুকান্ত একটি বিস্ময়কর নাম।

একটিমাত্র নাম, সুকান্ত ॥ শেখর সেনগুপ্ত

হঠাৎ বৃষ্টি এল। আমরা দুজনে আকাশের দিকে মুখ না তুলে পথ চলা শুরু করেছিলাম। তাই এই বিপত্তি। না, বিপদ নয়, এ আনন্দ। প্রাণবান উচ্ছ্বাসে বহুদিন পরে আমরা এমনভাবে ভিজতে পারছি। দেখছি, প্রকৃতির উল্লাসঘন নর্তন। আকাশের বুক-চেরা বিদ্যুৎরেখা। দিশাহারা পাখির পক্ষতাড়ন। সবুজ গাছ-গাছালির আছাড়ি-পিছাড়ি। দেখতে দেখতে পথ-ঘাট কর্দমাক্ত। তবু আমরা চলেছি। গন্তব্য তো দূর কম নয়,—বর্ধমানের বড় বাজার থেকে গণ্ডগ্রাম টিকরহাঁট পর্যন্ত। চলতে যখন শুরু করেছি, থামবো না। মনের আবেগে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই আমরা দু'জনে এগিয়ে যাবো।

আমরা অর্থাৎ, আমি আর অরুণাচল বসু। অরুণাচলদা। সময়, ১৯৬৪। স্থান, বর্ধমান। রোজ রাতে বর্ধমানের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করা আমাদের এক অভ্যেস। কোনো কোনো দিন সঙ্গে থাকেন বন্ধুবর অনিলেন্দু ভট্টাচার্য, শক্তি হাজরা, সলিল দাশগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু…ইত্যাদি ইত্যাদি।

বর্ধমানে তখন বছর দুয়েকের জন্য অরুণাচলদা আস্তানা নিয়েছিলেন। সাংগঠনিক শক্তি অসাধারণ। বর্ধমানে এসেই শিল্পী ও সাহিত্য-পাগল মানুষগুলিকে খুঁজে বের করলেন একে একে। প্রতিষ্ঠিত হলো এ মফস্বল শহরে এক অভিনব প্রতিষ্ঠান,—'সাহিত্য-মজলিস' বর্তমান নাম 'নতুন সংস্কৃতি' এবং এর বর্তমান প্রসারতা বাংলাদেশ জুড়ে। আমরা ঘর ভাড়া নিলেম বড় বাজারে। নিয়মিত আসর বসতো। স্ব-রচিত গল্প-কবিতা পাঠ করতুম, শিল্পীরা আঁকতেন ছবি। মাঝে মাঝে ঝড়ের বেগে সেখানে এসে উপস্থিত হতেন কবি তরুণ সান্যাল। রাত বারোটা একটা পর্যন্ত জেগে থাকতো আমাদের সাহিত্য বাসর। আসতেন অধ্যাপক অবন্তী সান্যাল, কবি সুমিত চক্রবর্তী, চির-নবীন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বসু, ডঃ ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়। আলোচনার তুফানে আমরা উত্তাল। অরুণাচলদা একাই একশ'। সময় সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপ নেই। তবে কথা বলতে বলতে সময় সময় কেমন যেন হারিয়ে যেতেন অরুণাচলদা,—অতীতটাকে মেলে ধরতেন আমাদের সামনে, সমস্ত আলোচনা কেন্দ্রীভূত হতো একটিমাত্র নামকে কেন্দ্র করে,—সুকান্ত!…

সেদিনের বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যাতেও ভিজতে ভিজতে অরুণাচলদা সুকান্তর কথাই বলছিলেন। অত অন্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস তাঁর এর আগে আমি কখনো দেখি নি। আমার মনেও সব গাঁথা হয়ে যাচ্ছিল। আজ এতদিন বাদেও সব মনে করতে পারছি। আমাদের মধ্যে আজকাল যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। কিন্তু সেদিনের সেই রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টির মধ্যে অরুণাচলদার প্রতিটি কথা আমি অনায়াসে মনে করতে পারি। অরুণাচলদা বলেছিলেন, '…সুকান্তর মনটাই ছিল বিরাট। প্রকৃতিকে সুন্দর দেখলে কবিমাত্রই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। এটা কবি-ধর্ম। আর সুকান্তের বৈশিষ্ট্য ছিল, মেহনতী মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ। ওর সেই বিখ্যাত লাইনটি তো আজ এক প্রবাদে পরিণত হয়েছে :

"পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

অরুণাচলদা একটু থামলেন। আমাদের গায়ে কাদা ছিটিয়ে একটা প্রাইভেট কার ছুটে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, অরুণাচলদার মুখে গভীর বেদনার ছায়াপাত। ছুটন্ত গাড়িটার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাই। গাড়ির ভেতরে বিশালবপু একটা লোক তার সঙ্গিনীকে সোহাগ জানাচ্ছে।

মনের খিচ্‌ধরা চেতনাটাকে আবার হাল্কা করে আনার প্রয়াসে বললাম, "অরুণাচলদা, আপনার অনূদিত নাজিম-হিকমতের কবিতাটা আবৃত্তি করুন না।"

অরুণাচলদা আবার উৎসাহ পেলেন। কাপড়ের কাদাগুলি মুছতে মুছতে বললেন, "না, বরং এই শ্রাবণে সুকান্তকে আবৃত্তি করি।"

"করুন!"

তিনি ভরাট গলায় আবৃত্তি শুরু করে দিলেন :

"আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
তবুও পড়িবে মনে,
চঞ্চল হাওয়া যদি ফেরে কভু হৃদয়ের আঙিনায়
রজনীগন্ধা বনে,
তবুও পড়িবে মনে।
বলাকার পাখা আজও যদি উড়ে সুদূর দিগঞ্চলে
বন্যার মহাবেগে,
তবুও আমার স্তব্ধ বুকের ক্রন্দন যাবে মেলে
মুক্তির ঢেউ লেগে,
বন্যার মহাবেগে।…"

কণ্ঠস্বর থেমে গেল। বৃষ্টির ঝাপটায় সমস্ত শরীর আমাদের একেবারে জ্যাবজেবে। বাতাসের গোঙানি বেড়েই চলেছে। জল জমছে সুরকি ঢালা রাস্তার এখানে-সেখানে।

অরুণাচলদা বললেন, "এটা সুকান্তের খুব ছোট বয়সের রচনা। কিন্তু দেখুন, এতে এমন সমস্ত পঙ্‌ক্তি রয়েছে, যা সেই কৈশোরের রচনা বলেই মনে হয় না।

হঠাৎ অরুণাচলদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শেখরবাবু, আপনি তো গদ্য লেখক। জানেন, সুকান্তও সুন্দর গদ্য লিখতো। ওর খানকয়েক ছোট গল্প, নাটকও রয়েছে। এমন কি, একটি উপন্যাস রচনাতেও হাত দিয়েছিল, শেষ করতে পারে নি।"

আমি মাথা নাড়লাম।

এ তথ্য আমার জানা ছিল। অরুণাচল বসু এবং সরলা বসু লিখিত "কবি-কিশোর সুকান্ত" থেকেই জানতে পেরেছি।

সুকান্তর একটি সম্পূর্ণ গল্পের অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে তুলে ধরছি :

"সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। ধারোয়ার বুকে তারই কালো ছায়া। নিমন্ত্রিতের মতো নিঃশব্দে প্রতিটি নক্ষত্র জড়ো হলো আকাশের আসরে। আকাশের কোনো এক অদৃশ্য কোণ থেকে একদল বকেরা উড়ে এল।

চাঁদের আলো নদীর ধারের স্বচ্ছ বালিতে লুটিয়ে প'ড়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে প্রতিটি বালুকণাকে। সেই চাঁদের আলো নিজের দেহে কুড়িয়ে নিয়ে অনেকে বসে গল্প করছে। তাদের কথালাপে, উন্মুখ হাসিতে ধারোয়া তীর গুঞ্জনে মুখরিত। কিন্তু নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে প্রতিটি কথার ফাঁকে ফাঁকে। কারও হঠাৎ গাওয়া গানের কলিতে চমকে ওঠে না সেখানকার সমাধি-গম্ভীর নিসর্গ, দূর থেকে ভেসে আসা তরুণীর কলহাস্যে সাড়া দেয় না এই তপস্যা মগ্ন পারিপার্শ্ব। তবু সেখানে জনতার নিত্য যাওয়া-আসা।..."

গদ্য রচনাতেও সুকান্তের কবিচিত্তের স্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে। সেই কিশোর কবির অমেয় স্মৃতি বুকে এঁকে অরুণাচল বসু আমাদের জানাচ্ছেন এক আশ্চর্য অনুভূতির ইতিকথা। সুকান্তকে নিয়ে কত টুকরো টুকরো গল্প আমাকে শুনিয়েছেন। মনে আছে একদিন যাদবপুরে অরুণাচলদার বর্তমান আবাসে ভরদুপুরে বেড়াতে গিয়েছি। অরুণদাকে ডাকতেই তিনি বেরিয়ে এলেন। আমরা গিয়ে বসলাম মা সরলা বসুর ঘরে। সুকান্তর প্রসঙ্গ উঠতেই সরলা বসুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। নীরব দুপুরের মতোই স্তব্ধ বেদনায় আমরা বিমূঢ়।

অরুণাচলদা আমার হাত ধরে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে বসালেন। ছোটঘর, কিন্তু সুন্দর শিল্পসম্মত সাজানো-গুছানো। দেয়ালে পিকাসোর ছবি, র‍্যাফেলের ম্যাডোনা, নাতিদীর্ঘ আলমারিতে অরুণাচলদার ছোটখাটো মিউজিয়াম,—অনেক দুষ্প্রাপ্য টেরাকোটার কাজ সেখানে সংগৃহীত, আর একটি আলমারিতে থরে থরে সাজানো বই—রবীন্দ্রনাথের, গোর্কী, সুকান্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনেকগুলো বিখ্যাত বই এবং কিছু রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সংকলন।

অরুণাচলদা তাঁর একটি পুরানো ফাইল থেকে জগদীশ ভট্টাচার্যের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বের করে দেখালেন। সুকান্ত স্মৃতিবিষয়ক বিরল রচনা প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে মুখ তুলে দেখলাম, অরুণাচলদা একমনে কী যেন ভাবছেন। ঘরের মধ্যে একটি হৃষ্টপুষ্ট সাদা বেড়াল বার বার চক্কর খাচ্ছে আমাদের দু'জনকেই কেন্দ্র করে। অরুণাচলদার ছেলে বাইরের উঠোনে একাই খুব দাপাদাপি করে চলেছে। সরলা বসু বার বার তাঁকে ডাকছেন, শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে। অরুণাচল-পুত্রের কিন্তু সে রকম কোনো ইচ্ছেই নেই।

অরুণাচলদা বলতে লাগলেন, "ছোটবেলা সুকান্ত আর আমি খেলাচ্ছলে কবিতা লিখতাম। যৌথ প্রয়াসে একটি গোটা কবিতাও আমরা লিখে ফেলেছিলাম। সুকান্ত প্রথম লাইনটি লিখলে তার পরের লাইনটি জুড়ে দিতাম আমি। বেশ মজা লাগতো।...যতদূর মনে পড়ে, আমাদের সেই কবিতাটির নাম ছিল 'শতাব্দী'। সব কটা স্তবক আর মনে নেই। সামান্য দু'চার লাইন যা মনে আছে, বলছি :

> অরুণাচল : হৃদয়ের উল্লাস ছন্দের বন্ধন মানে না,
> সুকান্ত : চম্পক গন্ধের সুরভিত ক্রন্দন আনে না।
> অরুণাচল : যৌবন-খঞ্জন উদ্দাম পিঞ্জর ভাঙতে,
> সুকান্ত · রক্তের রঙ্গনে উদ্যত বুঝি আজ রাঙতে।

অরুণাচলদা অন্য একদিন আর এক প্রসঙ্গে সুকান্তের স্মৃতি টেনে বলেছিলেন, "ব্ল্যাক আউটের কলকাতা সুকান্তের উপর দারুণ প্রভাব রেখেছিল। ফ্যাসীবাদের বীভৎস অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সুকান্তর কণ্ঠস্বর সেদিন শোনা গিয়েছিল :

"অদূর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্র দিন, জয়োন্মত্ত পাখা—
আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা।
আমার বেগান্ধ হাত, অবিরাম যন্ত্রের প্রসব
প্রচুর প্রচুর সৃষ্টি, শেষ বজ্র সৃষ্টির উৎসব॥"

এমনি কত কথা, কত স্মৃতির টুকরো টুকরো ইতিকথা, আবেগ-কম্পিত সুকান্ত আবৃত্তি অরুণাচলদার মুখ থেকে শুনেছিলাম। সমস্তটা মিলে সুকান্তর একটি পরিপূর্ণ অবয়ব যেন স্পষ্ট হয়ে এল আমার কাছে।

তাই, এতদিন পরে, যখনই জানতে পেলাম বন্ধুবর সুজিত নাগ "সুকান্ত স্মৃতি" সংকলনে হাত দিয়েছেন, আমি প্রথমেই ছুটে গেলাম যাদবপুরে অরুণাচলদার বাড়িতে তাঁর লেখা আনতে। 'সুকান্ত স্মৃতি'র কথা শুনে খুব খুশী হলেন তিনি। সাগ্রহে তিনি ও তাঁর মা সরলা বসু তাঁদের লেখা ছাপতে অনুমতি দিলেন। বললেন, "এ জাতীয় একটি সংকলন প্রকাশের স্বপ্ন আমার বহুদিনের। আপনারা সেই কাজ করতে চলেছেন দেখে খুব আনন্দ পেলাম। সুজিতবাবুকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসবেন। সুকান্ত সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু suggestion আছে।"

স্মৃতিরা জট খুলছে।

সুকান্তকে আমি দেখি নি। কিন্তু সুকান্ত-বন্ধু অরুণাচলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আমি পেয়েছিলাম। সেই অরুণাচলদার স্মৃতি-কথনের মধ্যেই অনুভব করেছি কিশোর কবিকে। মনের গহনে ঘুরপাক খেয়েছে সেই একটিমাত্র নাম,—সুকান্ত।

আধুনিক কবিতা, তার ব্যঞ্জনা এবং কবি সুকান্ত ॥ ফণী বসু

আমি তখন কেবলমাত্র কলেজে ঢুকেছি—আর কবিতা লেখার নেশাটা বেশ করে মনটাকে নিয়ে যখন তখন জুয়া খেলছে—সুকান্তর কবিতা তখন পড়ে নি বা পড়ে অন্তত কিছুক্ষণ তার কবিতার তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতায় আটকে থাকে নি এমন শিক্ষিত তরুণ তখনকার দিনে ছিল বলে আমার জানা নেই। সবচেয়ে বেশী অবাক হয়ে ভাবতাম যখন বিশেষ শ্রেণীর বয়স্ক এবং বিদগ্ধজনেরা এবং কবিগুরুর

অন্ধ অনুকরণকারীরা রবীন্দ্র বিদ্রোহী বলে সুকান্তকে খুব কষে গালাগালি দিত এবং পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটি মনে করাটাকে তরুণের তারল্য বলে ঠাট্টা করতেও ছাড়ত না তখন আমরা অর্থাৎ কিশোর তরুণেরা তার কবিতাকে বুকে পিঠে জড়িয়ে ঘুরে বেড়াতাম কোন অনিবার্য আকর্ষণে।

কী যেন এক মাদকতা, কী যেন এক নতুনত্ব এবং কী যেন একটা সাহস সুকান্তর কবিতায় তার অন্তরের তীব্রতা ও সততা নিয়ে যুক্ত হয়ে বুক ফুলিয়ে জেগে থাকতো। হয়তো অনুভূতির এই সততা, সাহস এবং তীব্রতার জন্যই তার কবিতা আমাদের মনকে বেশ নাড়া দিয়ে যেতো। তার বক্তব্য সাহসে এত স্পষ্ট এবং ব্যঞ্জনায় এতই অভিনব ছিল যে তার প্রত্যেক চিত্রকথা মনের মধ্যে গিয়ে ধাক্কা মেরে বলতো—এবার ওঠো, এবং শোনো কি বলছি। এবং আমাদেরও না শুনে উপায় ছিল না। এরই নাম হয়তো শোনার মতন করে বলতে পারা।

এক সময় রবীন্দ্র মধ্যাহ্নেএ নজরুল যেমন বাংলার তরুণ প্রাণে হঠাৎ বাঁধ ভাঙা এক জোয়ার নিয়ে এসেছিল তেমনি তরুণ কবি হিসাবে সুকান্তও আমাদের মনে রবীন্দ্র জ্যোতির বাইরে আর এক কি তীব্র অনুভূতির ঢেউ তুলে দিয়েছিল। এই জোয়ারের তীব্রতা ও গভীরতা যে সাম্প্রতিক বা ক্ষণস্থায়ী ছিল না তার প্রমাণ মিলবে যখন খুঁজে পাই যে আজও সুকান্তের কবিতার কয়েকটি চিত্রকল্প ও উপমা অধুনা আধুনিক কবিদের রাজ্য ও রাজত্ব পেরিয়ে স্পষ্ট হয়ে বেঁচে-বর্তে আছে— এবং শুধু বেঁচেও নেই, মাঝে মাঝে আমাদের মনে সেই সব লাইনগুলি আপনা থেকেই ভেসে ওঠে। এর চেয়ে কবি প্রতিভার সার্থকতা আর বেশী কি হতে পারে!

দু একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার ধারণাকে শক্ত করে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে পারি।

> "ঘরেতে অভাব ; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
> পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,"

অভাব, অনিশ্চয়তা, বুভুক্ষাকে কত গভীর করে উপলব্ধি করলে তবেই না এই দৃশ্যময় কঠিন মাটির অস্তিত্বের এই বিরাট পৃথিবীটা চোখের সামনে উবে গিয়ে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন করে আমাদের প্রচণ্ড সর্বনাশের ক্ষণে আমাদের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে ওঠে। উপমা ও চিত্রকল্প যথাযথ হলে তার প্রমাণ কি আরও দিতে হবে ?

"রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে"

জীবিকার প্রশ্ন যে বিপন্ন জীবনের চেয়ে বেশী মারাত্মক তার সুন্দর প্রকাশ এই সূর্য ওঠার আশঙ্কাতে লুকিয়ে রয়েছে। যে সূর্য দীপ্তি জীবন ও মননের পক্ষে অন্ধকার ও অনিশ্চয়তাকে বিনাশের পক্ষে এত অপরিহার্য সেই সূর্য ওঠাও যে জীবনের পক্ষে অনভিপ্রেত সেই জীবন রানার-এর।

পিঠে রুজিরোজগারের বিরাট বোঝা নিয়ে সে রাত্রির পথে ছুটেছে। সূর্যের আগেই তার লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তার পক্ষে দস্যুর হাতে প্রাণ হারাবার ভয়ের চেয়েও সূর্য ওঠার ভয় আরও ব্যাপক। আজকাল আমরা চমৎকারী চিত্রকল্প সৃষ্টি করে পাঠককে ভয় দেখাই অথচ চিত্রকল্প দিয়ে এমন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারি কি?

চার্লি চ্যাপলিনের The kid যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অনুরোধ করবো যে চার্লির সেই দুর্দান্ত ছেলের সঙ্গে ভয়ঙ্কর সেই মুষ্টিযোদ্ধার ছেলেটির লড়াই-এর দৃশ্যটি স্মরণ করতে। তবেই তাঁরা সুকান্তর প্রকাশ-ধর্মের সার্থকতা ও গভীরতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

মুষ্টিযোদ্ধার হাতে নিজের জীবন হারানোর ভয়ে চ্যাপলিনের সেই বিজয়ী ছেলেকে পায়ের তলায় চেপে মুষ্টিযোদ্ধার মৃতপ্রায় ছেলেকে শূন্যে লটকে দিয়ে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা। চ্যাপলিন এর মধ্যে ছেলের জন্য বেঁচে থাকার তাগিদ রানার-এর রুটি যোগাবার তাগিদের মতো প্রবল ও অত্যাবশ্যকীয় ছিল বলে যা অভিপ্রেত তাকেও তাদের অস্বীকার করতে হয়েছিল। দুটি প্রকাশেই জীবনের সেই একই আর্ত কারুণ্য প্রকাশ পায় নি কি? বলুন। আধুনিক বলব না—সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে একটা ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল ও প্রকট হয়ে আছে যে তারা সার্থকতার হিসাব না রেখে অভিনব চিত্রকল্প সৃষ্টি করে উৎসাহী পাঠকদের ধাক্কা মারতে চান। অবশ্য এই ধাক্কা মারার উদ্দেশ্য যদি হয় কঠিন আঘাতে অজ্ঞান করে দেওয়া বা হাত পা ভেঙে দেওয়া—তবে আমার কিছু বলার নেই! কিন্তু অন্য পক্ষে অভিনবত্বের উদ্দেশ্য যদি হয় নতুন চৈতন্যে, পাঠককে বোধের গভীরে নিয়ে যাওয়া তাহলে বলব যে তারা অনেক ক্ষেত্রেই চিত্রকল্পের ব্যবহারে সুকান্ত থেকে পিছিয়ে আছেন। আমি বিজ্ঞ নই, অতি বিদ্বান বা বিদগ্ধও নই, সুসাহিত্যিক, নামজাদা কবি বা জাঁদরেল সমালোচকও নই। এই প্রত্যয়ের স্বীকারোক্তি নিয়েও বলতে আমার সঙ্কোচ নেই যে অল্প বয়স থেকে সুকান্তের

আধুনিক কবিতা, তার ব্যঞ্জনা এবং কবি সুকান্ত

কবিতা ও তার ব্যঞ্জনা আমার মনকে যেমন আঁটকে জড়িয়ে ফেলতো ততটা আর কিছুতে নয়। সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাসের কাব্যবোধ ও চিত্রকল্পের গভীরতায় ডুব দেবার মতো শিক্ষা ও সংস্কৃতির ডুবুরী পোশাক তখন আমার ছিল না একথাও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় আজকের এই যুগে, আধুনিক কবিতার এই নব প্রয়োগ কৌশল ও উদ্ভাবনী প্রথার দিনেও সুকান্তর কবিতার মূল্যায়নের মূল্য আছে কি না বা কতটা আছে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি জগতে "জল পড়ে পাতা নড়ে"—লাইনটির যা প্রভাব, সহজভাবেই স্বীকার করবো সুকান্তর লাইনের সেই—

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

এই লাইন দুটিও আমার তরুণ অনুভূতিশীল জীবনকে একদিন আলোড়িত করেছিল এবং সেই ঢেউএর পলিমাটি যে আজও অবশিষ্ট নেই একথা বলি কি করে। পেটের প্রচণ্ড ক্ষুধায় পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে একখানা ঝলসানো রুটি মনে করায় অকবিত্ব তো নয়ই আমার মনে হয় অনুভূতি শক্তির তীব্রতাই প্রকট হয়ে ওঠে। আধুনিক কবিতার একটি বড় কথা কবিকে সৎ হতে হবে এবং চিন্তার সততাকে ঠাঁই দিতে হবে। সুকান্ত প্রচণ্ড ক্ষুধার রাজ্যে বাস করে যদি—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে"

বলতে না. পেরে থাকে তো প্রমাণ হবে—যে তার অনুভূতিতে কৃত্রিমতা ছিল না। যেমন ছিল না রবীন্দ্রনাথের হৃদয় নেচে ওঠার বোধে কৃত্রিমতা। বিশ্বাস করি—১৯৭০ সালে কলকাতায় বসে রবীন্দ্রনাথ আর কোনোদিন ঐ কবিতার পুনরাবৃত্তি বা অনুলেখন ঘটাতে পারবেন না।

অথচ সুকান্তর ঐ সুন্দর চিত্রকল্পটিকে নিয়ে কত না ব্যঙ্গোক্তি, কত না টিটকারী, কত না বক্রোক্তি শুনেছি বা আজও শুনছি। যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধবাদীদের অনুভূতি শক্তি ও সংস্কৃতির পরিধি অতি সীমাবদ্ধ ছিল। অনেকে জীবনে "পাখী সব করে রব" বা "রাত পোহালো ফর্সা হল"র বাইরে উঁকি মারেন নি। এমন কি সুকান্ত এই কবিতার পুরোটা মনে রাখেন নি। মনে রাখেন নি বলেই যে পরিপ্রেক্ষিতে সুকান্ত কঠিন কঠোর গদ্য আনার ইঙ্গিত করে গেছেন তার হিসাব তারা পায় নি। এ যেন অন্ধের লেজ ধরে হাতির আকার মাপার মতো অবস্থা।

আমার তো মনে হয় ঠিক ঐ কঠিন কবিতায় কত সুন্দর করে সুকান্ত আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা ও ধর্ম প্রকাশ করে গেছেন—কত না সংক্ষেপে। যুদ্ধোত্তর যুগের দুর্ভিক্ষ, অনাহার বঞ্চনা হতাশার পরিধি ও পরিমাপ যারাই হৃদয়ে অনুভব করেছে তারা আর কোনো দিন চাঁদকে দেখে কোনো প্রিয়তমার মুখ বা উদ্ভট স্বপ্ন দেখার সাহস পাবেন না—যদি তার মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে।

এক্ষেত্রে আমি সুকান্তর সঙ্গে চার্লির সেই Gold rush-এর ছবিটির উল্লেখ করে প্রমাণ করবো, চিত্রকল্পে সুকান্তর শক্তি কতো অমোঘ ছিল।

মনে করুন প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় এবং বন্ধুর হাতে জীবন নাশের আশঙ্কায় চার্লির সেই ডিনার খাওয়ার দৃশ্য—একখানা আস্ত বুট সেদ্ধ করে। মনে করুন সে ক্ষুধার প্রচণ্ডতার মধ্যে—সেই অতুলনীয় তৃপ্তি বোধের সঞ্চার।

ভাব কল্পনাকে শিল্পবোধের কোন উত্তুঙ্গ সীমানায় পৌঁছে দিলে তবেই না এমন বিপরীত ধর্মী চিত্রকল্প দিয়ে এমন আলোড়নকারী ভাবনার সৃষ্টি সম্ভব।

কবিতায় আধুনিকতা তো আজকাল অনেকেই অনেকভাবে দেখাচ্ছেন বা ঘটাচ্ছেন। কিন্তু তাদের ক'জন উপমার প্রয়োগ নৈপুণ্যকে এমন যথাযথ করে পাঠককে এমনভাবে involved করে রাখতে পারেন বা পারছেন সেটাই ভেবে দেখুন।

এইসব মূল্যায়নের আগে একটা কথা ভুললে চলবে না যে সুকান্ত সে বয়সে কবিতা লিখে কবিপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে সে বয়সের আমাদের অনেক কবিতাই আমরা লজ্জায় আর বন্ধু-বান্ধবকেও দেখাই না।

একথা ভুললেও চলবে না যে বিশ-বাইশ বছরের একটি জীবনে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাসের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি বা পূর্ণতা সম্ভব নয়, এমন আশা করাটাও আমাদের বুদ্ধির দৈন্যই প্রকাশ করবে।

শুধু মনে রাখলেই যথেষ্ট যে সুকান্তর দুর্দান্ত সাহসী দৃষ্টি ও অভিনব প্রকাশ শক্তির সঙ্গে যদি তার বয়সের পূর্ণতা, অভিজ্ঞতা যোগ হত তাহলে কবিতার রাজ্যে বাংলাদেশকে সে কতো সম্পদই না দিয়ে যেতো।

সজাগ শিল্পী সুকান্ত ॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু

চির তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে আবেগ এবং আতিশয্য প্রকাশ শেষ হয়েছে, তাই সুকান্ত সম্বন্ধে দেশবাসী তথা পাঠক মহলে একটি স্থির প্রত্যয় এবং যথার্থ বিচারবোধ সম্ভব হয়েছে।

সুকান্তের কবিতায় রাজনৈতিক গন্ধ অনেকে পেয়েছেন, জীবনের একটি দিকের উচ্চকিত ঘোষণার কথা আছে—তাঁরা বলেন ; বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট বলেই সুকান্তের কাব্যে কিছু উচ্ছ্বাস আছে ইত্যাদি ধরনের অভিযোগও শুনেছি। এসব অভিযোগের উত্তর দেবার দরকার মনে করি না, কারণ সুকান্ত যে যথার্থ কবি—তা তর্ক করার প্রতীক্ষা করার অপেক্ষা রাখে না, তাঁর যে কোনো একটি কবিতা পাঠই তাঁর কবিত্বের পরিচয় দেবার পক্ষে যথেষ্ট। রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা কবির মন ও মনন আবিষ্ট হতে পারে, কিন্তু তাঁর লেখা যদি যথার্থ কাব্য হয়—তা সর্বসাধারণের সম্পদ হয় ; সাহিত্য-লক্ষ্মী তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডারে তা যত্নের সঙ্গে তুলে রাখেন। সুকান্তের কাব্যসাহিত্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পদ হিসাবে স্থান পেয়েছে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

সুকান্ত সম্পর্কে নানা আলোচনা হয়েছে ; তাঁর প্রতিষ্ঠা যে দেশের সকল শ্রেণীর সকল মানুষের মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে গণ্য—সে নিয়ে আজ আর কারুর মনে সংশয় নেই।

সুকান্ত যে সজাগ শিল্পী ছিলেন—সে সম্পর্কে দু-একটি কথাই শুধু বলবো। সকল কবির একটি পরিচয় হল তাঁর লেখার দু-একটি পঙ্‌ক্তি প্রবচনের মতো জনসাধারণের ঠোঁটে ঠোঁটে ঘোরে। সুকান্ত বেশী লেখার সুযোগ পান নি, সমাজ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করতে পারে নি, তবু সুকান্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যে এমন ক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন—যাতে তাঁকে সজাগ শিল্পী না বলে উপায় নেই। তাঁর অনেক পঙ্‌ক্তিই আজ প্রবচনের মতো বাঙালীর মুখে মুখে! "পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"—পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে শুধু নতুনত্ব নেই, সমাজ-জীবনের একটি নিগূঢ় বেদনার বাঙ্ময় পরিচয় মূর্ত হয়েছে। বাস্তববাদী কবি চাঁদের মধ্যে পলায়ন তৎপর জীবন-চেতনার রোমান্টিক আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করেন নি। শোষক সমাজের ক্ষুধিত মানুষের মনে যে চিন্তা স্বাভাবিক—তারই প্রকাশ ঘটেছে কবির সদা-সজাগ দৃষ্টিতে।

সুকান্ত সুবিধাবাদী সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় মানুষকে তুষ্ট করার জন্যে কলম ধরেন নি, কিংবা নিজেকে শোষিত জনসাধারণের থেকে আলাদাও করে নেন নি। বঞ্চিত সর্বহারার বেদনা তাঁর কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। অনেকে এই বেদনাকে রূপ দিতে গিয়ে পোস্টার রচনা করে থাকেন, কিন্তু সুকান্তের কাব্যে উচ্চগ্রামের ঘোষণা থাকা সত্বেও শুধু পোস্টারের বিজ্ঞাপনে পরিণত হয় নি তাঁর কাব্য। 'চিল' কবিতাটি কিংবা 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতার কথা মনে করা যাক। সুন্দর রূপকথার আড়ালে গভীর তত্ত্ব তিনি পরিবেশন করেছেন; ফলে লেখাগুলি বক্তব্য না হয়ে কাব্য হয়েছে।

যিনি সজাগ শিল্পী হয়ে জন্ম নেন—তাঁর মনে বস্তুজগৎ থেকে পালাবার মোহ আগাগোড়াই অনুপস্থিত থাকে। সমাজ-ব্যবস্থার চাপে বা অসম বণ্টনব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত যে বাস্তব সমস্যা—সে সম্পর্কে তিনি চিন্তা না করে পারেন না। তরুণ সুকান্তের বয়স এমন কিছু বেশী ছিল না তবু তাঁর প্রত্যেকটি লেখায়—সমাজের মধ্যে অনুষ্ঠিত শোষণের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছে, এই পাপ এবং অপকর্মের জন্যে তাঁর সংবেদনশীল মন গভীরভাবে বেদনা ভরপুর হয়ে উঠেছে এবং তিনি কান্নায় ভেঙে না পড়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন—এই দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে। এইখানেই বড় বৈশিষ্ট্য। সুকান্তের কলম যে কাহিনী লিখেছে—সে কাহিনী পলায়নমুখী সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রচলিত ইতিহাস নিয়ে নয়, সে কাহিনীকে সুকান্ত ধিক্কার জানিয়েছেন তার 'কলম' কবিতায়—

"কলম, শুধু বারংবার,
আনত ক'রে ক্লান্ত ঘাড়
গিয়েছো লিখে স্বপ্ন আর পুরানো কত কথা,
সাহিত্যের দাসত্বের ক্ষুধিত বশ্যতা।
ভগ্ন নিব, রুগ্ন দেহ জলের মতো কালি
কলম, তুমি নিরপরাধ তবু গালাগালি
খেয়েছো আর সয়েছো কত লেখকদের ঘৃণা,
কলম, তুমি চেষ্টা করো, দাঁড়াতে পারো কিনা।"

সুকান্ত চাঁদকে যেমন ঝলসানো রুটি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি, তেমনিই সূর্যকেও এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করেন নি—যে অগ্নিপিণ্ড আমাদের নিরুত্তাপ রৌদ্র-পিপাসু স্যাতসেঁতে দেহে উত্তপ দেবে, শীতের দিনে রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটাকে পর্যন্ত গরম করবে! সুকান্ত লিখেছেন—

"শুনেছি তুমি এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকে এক-একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হবো,
তার পর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।"

সুকান্ত সম্পর্কে তাই সংক্ষেপে শুধু সজাগ শিল্পী বিশেষণটি অতি সহজেই সার্থকতার সঙ্গে বসানো চলে।

সুকান্ত ॥ অবন্তীকুমার সান্যাল

১৯৪১-৪২ সালে সাহিত্যতত্ত্বের ক্লাসে কাব্যবিচার প্রসঙ্গে আধুনিক কবিদের স্থায়িত্বের কথা যখনই তুলতাম, মাস্টারমশাই একটি কথাই দিনের পর দিন বলতেন। তাঁর ছিল কাব্যপরিমাপের রাজসিক দাঁড়িপাল্লা, তাঁর গণনার মহাকবি ছিলেন মাত্র 'কালিদাস প্রভৃতয়ো দ্বিত্রা পঞ্চষাঃ বা'। তবু তিনি বলতেন: পঁচিশ বছর পরেও যে কবির কবিতা পড়া চলে, পড়তে ইচ্ছে করে, সে সার্থক কবি। মাস্টারমশাই আজ বেঁচে থাকলে অবশ্যই বলতেন যে সুকান্ত সার্থক কবি।

সুকান্তর অসম্পূর্ণতা, সুকান্তর অপরিপক্বতা সত্ত্বেও সুকান্তর সার্থকতা তর্কাতীত। জনপ্রিয়তাই সুকান্তর সার্থকতার একমাত্র মাপকাঠি একথা কখনোই বলবো না, তবুও কখনো ভুলবো না যে জনপ্রিয়তাই তার সার্থকতার অন্যতম মাপকাঠি। রুচিবাগীশরা 'জন' কথাটিতে যতই নাক কোঁচকান না কেন, সুকান্ত কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই 'জন'-এর চিত্ত স্পর্শ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছিল এবং 'জন'-এর প্রিয়ত্ব অর্জনই সুকান্তর সজ্ঞান কামনা ছিল। প্রায় পঁচিশ বছর পরে সাক্ষাৎ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, যে-কিশোরের কবিতায় 'জন' তার আবেগের স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ প্রকাশটিকে আবিষ্কার করে রোমাঞ্চিত হয়, আবরণমুক্ত উলঙ্গ-

শব্দের 'স্লোগানে' অনিবার্যভাবে প্রত্যুত্তর দিয়ে ওঠে, নিছক 'জনপ্রিয়' আখ্যা দিয়ে সে কবিতাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াটা স্বকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুকান্ত যখন লিখতে শুরু করেছিল, তখন আধুনিক কবিদের মধ্যে নামডাক ছিল মুখ্যত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাস, সমর সেন আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। সুধীন্দ্রনাথের শব্দ-দার্ঢ্য সুকান্তকে বিস্মিত করতো, কিন্তু তাকে মুগ্ধ করতো প্রেমেন্দ্রের শব্দ-স্বাচ্ছন্দ্য। জীবনানন্দের শব্দ-শৈথিল্য তার পছন্দ হতো না, বিষ্ণু দে-র শব্দ-নৈপুণ্য বোঝার মতো তার বয়স ছিল না। তার আকর্ষণ ছিল সমর সেন আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি। সমর সেনের ভাষণের স্পষ্টতা সে ভীষণ তারিফ করলেও তার সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন সুভাষ—তাঁর শব্দের তীক্ষ্ণতায়, অব্যর্থতায় এবং বক্তব্যের বিশেষতায়।

তখনকার দিনের আরও অনেকের মতো 'কি বলবো' এ সমস্যা সুকান্তর ছিল না, সমস্যা ছিল, 'কেমন করে বলবো'। বলার কথা নিয়ে তার তিলমাত্র দ্বিধা ছিল না, দ্বিধা ছিল বলার কায়দা নিয়ে। কিন্তু তার ওই বয়সে সুভাষের পরিশীলিত বাক্-সম্পদ আয়ত্ত সম্ভব ছিল না। সে ঝুঁকেছিল রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক-নবজাতকে'র দিকে। সুকান্তর সদ্য-কৈশোর মনে বিশ্ববোধের উন্মেষের মূলেও ছিলেন প্রধানত 'প্রান্তিক' 'সভ্যতার সংকট'-এর রবীন্দ্রনাথ (সে সময়টায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বরাজনীতি সচেতন তরুণদের কী প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, আজকের কাউকে তা কিছুতেই বোঝানো যাবে না।) অতি দ্রুততায় বিশ্ববোধ ও জীবনবোধকে হৃদয়রসে জারিত করে সোচ্চার হয়ে ওঠার মুহূর্তে সুকান্ত স্বাভাবিকভাবেই 'প্রান্তিক-নবজাতক'-কে তার শব্দের অভিধান করে নিয়েছিল।

কবিতার বক্তব্য সম্পর্কে সুকান্তর সঙ্গে একমত হলেও, আজকের কোনো তরুণ কবি ভাবতেও পারেন না সেদিনকার সেই 'কেমন করে বলা'র সমস্যা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই মধ্যবর্তীকালে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের সংকটময় পর্বে, দেশবাসী দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায়, বিপর্যস্ত সমাজজীবনে একদল সচেতন তরুণের কাছে রাজনীতি অকস্মাৎ অতি প্রত্যক্ষ বস্তুরূপে ধরা পড়েছিল, এই প্রথম রাজনীতি একটি সম্পূর্ণ জীবনবোধ ও আচরণের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিশোর সুকান্ত এই রাজনীতির অংশীদার হয়েছিল, সে সোজাসুজি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। এই রাজনীতির প্রেরণায় একেবারে গোড়া থেকেই সে ছিল সর্বক্ষণের কর্মী এবং তার কর্ম ছিল তার কবিত্বের পরিপূরক। রেশনের লাইনের তিক্ত অভিসম্পাতে, লঙ্গরখানার করুণ কোলাহলে, মিছিলের উল্লাসে-

চিৎকারে যে-ক্ষোভ যে-বেদনা যে-আশা যে-উদ্দীপনা, তাকে কেমন করে ভাষা দিতে পারা যায়? সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অতি-প্রত্যক্ষ এই ক্ষোভ-বেদনা-আশা উদ্দীপনাকে কোন তির্যক্ বক্রভাষণে প্রকাশ করা সম্ভব? অনুভব যেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ ভাষাকে সেখানে অবশ্যই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ হতে হবে। সহধর্মী কবিদের মধ্যে অন্য কারুরই সুকান্তর মতো এমন আক্ষরিকভাবে নগ্ন রুক্ষ বাস্তবের মুখোমুখি হবার দুর্ভাগ্য (?) হয় নি। তাই স্বভাবতই সুকান্ত ভাষার স্বতন্ত্র পথ খুঁজে নিতে চেয়েছিল। কোনোরকম বক্রতা নয়; যাদের কথা তারা যেমন করে বলতে চায়, তেমন করেই লিখতে হবে; যাদের জন্য বলা, তারা যেমন করে বোঝে, তেমন করেই বলতে হবে। এই বলার প্রবল প্রচেষ্টাতে সুকান্ত নিঃসন্দেহে বহু ক্ষেত্রে কবিতার শর্তকে লঙ্ঘন করেছে। তার জন্য দায়ী তার বয়স, তার জ্ঞান ও কাব্য-সংস্কারের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু অন্যদিকে আবাব এইগুলিই তার পক্ষে আশীর্বাদ হয়েছিল। প্রত্যক্ষ অনুভবকে প্রত্যক্ষ ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে গড়ে-ওঠা কোনো সংস্কার তার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রত্যক্ষ ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে সুকান্ত এমন কিছু লাইন লিখে ফেলেছিল যা সত্যিই অবাক করা। যেমন:

"দু'চোখে সংহার-স্বপ্ন বুকে তীব্র ঘৃণা,
শত্রুকে বিধ্বস্ত করা যেতে পারে কিনা
রাইফেলের মুখে এই সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা"।—রোম : ১৯৪৩

সুভাষ কখনোই এমন অবক্র ভাষণের কথা ভাবতে পারতেন না, কিন্তু তিনিও এই দুটি লাইনের অব্যর্থতায় চমকিত না-হয়েও পারতেন না।

সুকান্তর কবিতায় স্লোগান আছে, তার কারণ কিশোর সুকান্ত দেওয়ালে দেওয়ালে স্লোগান লিখতো, মিছিলে মিছিলে স্লোগান দিতো। কিন্তু সুকান্তর কলমেই সর্বপ্রথম খাঁটি স্লোগান খাঁটি কবিতা হয়ে উঠেছিল। একমাত্র সুকান্তর কবিতা থেকে এমন প্রচুর স্লোগান জড়ো করা যায় যা দিয়ে একটা পুরো মিছিলকে সাজানো চলে, আর সে স্লোগানগুলির বেশির ভাগ অব্যর্থ বলেই কবিতা অথবা কবিতা বলেই অব্যর্থ। স্লোগান লিখতে গিয়েই সুকান্ত লিখেছে এমন আশ্চর্য লাইনটি:

"রক্তে আনো লাল
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল"।—বিবৃতি

সুকান্তর মানসিকতায় রাজনীতি ও কবিতায় কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। সমকালের রাজনীতির ছোটবড় সকলকিছুই তার প্রেরণার বিষয় ছিল। আজকের দিনের রাজনীতি-সচেতন তরুণদের পক্ষে সেই সাময়িকতার প্রসঙ্গ অনুধাবন করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন। তারা কেমন করে বুঝবে সীমান্তের সেই প্রহরীর কথা, "অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে যে স্বদেশের সীমানায় থমকে দাঁড়িয়ে ভগ্নকণ্ঠে বলে :

"আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার॥"—প্রিয়তমাসু

ফাশিস্ত-শক্তির প্রতিরোধে জাগ্রত পৃথিবীব্যাপী জনশক্তির সঙ্গে যারা একাত্মতা অনুভব করতেন, কায়-মন-বাক্যে যারা বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের মুক্তি ওই জনশক্তির বিজয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, বিজয়ের চরমমুহূর্তে ভারতবর্ষের হৃতভাগ্যকে প্রত্যক্ষ করে, সুকান্তর সেদিনকার সেই প্রত্যেকটি ক্লান্ত সমধর্মীরই মনে হয়েছিল : 'আমি যেন সেই বাতিওয়ালা, ইতিহাসের জ্ঞান থেকে সেদিনকার সেই তাৎক্ষণিক অনুভবটিকে আজকের কেউ স্পর্শও করতে পারে না। আজ এক যুগ পরে সুকান্তর কবিতায় এই ধরনের তাৎক্ষণিক অনুভূতি আমাদের বাসনাকে যেন অন্য জন্মের অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলে। সেই ক্ষুধার কান্না, অবিশ্বাসীর বাঁকা-হাসি, বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ বাহিনীর পদধ্বনি, সেই বার্লিনের পতনের উল্লাস, ইন্দোনেশিয়া-ইন্দোচীনের অভ্যুত্থান, সেই আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারী, উনত্রিশে জুলাই, আমাদের ষোলই আগস্টের নরক-বিভীষিকা,—একমাত্র সুকান্তর কবিতাই এসব কিছুর দিন-পঞ্জিকা হয়ে আছে।

কিন্তু দিন-পঞ্জিকা লিখতে লিখতে কি আশ্চর্য ক্ষমতায় সুকান্ত ইতিহাসের মর্মকেন্দ্র স্পর্শ করেছিল, সাময়িকতার কুয়াশা ভেদ করে যেন মুহূর্তের জন্য ইতিহাসের নিরঞ্জন মূর্তির সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। 'ঐতিহাসিক' কিশোর সুকান্ত লিখেছিল :

"আর মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মর ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।"—ঐতিহাসিক

সুকান্ত 'ছাড়পত্র' কবিতা শেষ করেছিল একটি সঙ্গাম আকাঙ্ক্ষায় : "তারপর

হব ইতিহাস", 'লেনিন' কবিতায় সে লিখেছিল: "বিপ্লব-স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন"। এই 'হতে চাওয়া' আর 'হয়ে ওঠা'র মধ্যে চৈতন্যের যে রূপ-পরিবর্তন, তা কি বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে। আর, শত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, কবি হিসেবে এখানেই সুকান্তর পরম সার্থকতা।

সকলেই লক্ষ্য করেছেন, শেষের দিকে সুকান্তর কবিতার ভাব ও ভঙ্গিতে রং পালটাচ্ছিল, অর্থাৎ সুকান্তর বয়স বাড়ছিল, কিশোর যুবক হচ্ছিল। এই নতুন রং-করা দুয়েকটি কবিতা নিয়ে কিছু অনুরাগীর অস্বস্তির অন্ত নেই। তেমন একটি কবিতা 'অসহ্য দিন' 'পূর্বাভাস'-এর এককোণে সংকোচে মুখ লুকিয়ে আছে। সেই অনুরাগীরা যদি জানতেন. ওটি সুকান্তর একেবারে শেষের রচনা তাহলে আরও বিব্রত হতেন।

যাদবপুরের হাসপাতালে যাবার মাত্র কয়েকদিন আগে শ্যামপুকুরে রাখালবাবুর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে বালিশের নিচে লুকোনো একটি চিরকুটে লেখা কবিতাটি আমিই টেনে বার করেছিলাম। পড়তে গেলে সুকান্ত বাধা দিতে চেয়েছিল। যার আকাঙ্ক্ষা ইতিহাস হবার, যে অনুভব করেছে, 'আমিই লেনিন', সেই লিখেছে· "আজ মনে হয় জীবন-ধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত।" সুতরাং তার কুণ্ঠা স্বাভাবিক ছিল বই কি। কবিতাটি কাগজে টুকে নিয়ে বলেছিলাম: সুকান্ত তুমি বড় হচ্ছ। বাড়ি ফিরে কবিতাটি আমার যে প্যাডের মলাটে টুকে রেখেছিলাম, কী করে জানি না, সেই তেইশ বছর আগেকার মলাটসুদ্ধ ক্ষীণকায় প্যাডখানি এখনো টিকে আছে। আজ মিলিয়ে দেখছি, ছাপা বইতে একটি কথা পরিবর্তিত হয়েছে। সে কার পরিবর্তন? সুকান্তর না অন্য কারুর? আমার সন্দেহ আছে 'অসহ্য দিন'-এর পর সুকান্ত আর কোনো কবিতা লিখেছিল কি না।

'অসহ্য দিন'-ই প্রমাণ করে সুকান্ত সত্যি সত্যি বড় হচ্ছিল, কিন্তু বড় হওয়ার সুযোগ সে পায় নি। বয়স বেড়ে আজ সে পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ় হতো। জীবনধারণ পরিপূর্ণ সঙ্গত কি না? চেতনার চাবুকে অস্থির সুকান্তকে এ-প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই খুঁজতে হতো। সমুদ্যত বিপদের পথে চলতে চলতে আজ 'ডাইনে' 'বাঁয়ে' তাকাই আর ভাবি, প্রৌঢ় সুকান্ত কোন উত্তর খুঁজে পেতো।

অগ্নি ও অশ্রুর কবি সুকান্ত ॥ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

তখন আমি স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম শুনি। কমিউনিস্ট পার্টির একটি মিটিংয়ে সুকান্তের বিখ্যাত 'বোধন' কবিতার আবৃত্তি শুনে কিশোর মনে চমক লাগে, ঢেউ জাগে। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সেই সম্মেলনের পুস্তক-বিপণি থেকে তাঁর 'ছাড়পত্র' বইটি ক্রয় করি। বইটির তৃতীয় সংস্করণ চলছে তখন; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে উৎসর্গীকৃত বইটি আমার মনে যে সুরের জাগরণ ঘটিয়েছিল তা বিমূঢ় শ্রদ্ধার ও তলহীন বেদনার। সুকান্তের অকাল বোধন কেন—কি কারণে, কোথায় তাঁর জন্মমৃত্যু, কেমন তাঁর জীবনধারার ইতিহাস তা বিশেষ কিছুই সেদিন জানতে পারি নি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেমন অজানা ছিলেন, তেমনি ছিলেন আহ্‌মদ সাহেব। আজ জেনেছি তারা দু'জনেই শ্রদ্ধেয়। 'সুকান্ত সমগ্র' গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে সুকান্ত আজ অনেক বেশী উদ্ঘাটিত। আহ্‌মদ সাহেবের কোনো লেখা আমি আজো পর্যন্ত পড়ি নি। নজরুলকে তিনি যতখানি জানিয়েছেন তেমনি করে সুকান্তকে জানালে আমাদের স্মৃতিতর্পণ অনেকাংশে পূর্ণ তৃপ্তির দিকে এগিয়ে যেত। সেই জীবন জিজ্ঞাসার প্রভাতবেলায় কবিযশঃপ্রার্থী হবার অংকুর-চেতনার দিনে মনে হয়েছিল সুকান্ত আমাদের কবি, আমারও কবি। নজরুলের সমপথিক তিনি। এমন কথাও শুনেছিলাম, বেঁচে থাকলে সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের মতো কবি হতেন। প্রলাপপটু ও অতিবাদী বন্ধুরা, অল্পপড়ুয়া সহজবিশ্বাসী পাঠকেরা বলতেন সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের থেকে বড় কবি। সুকান্ত স্বভাবকবি, অবশ্য এমন কথাও সেদিন শুনেছি। সুকান্তের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'ছাড়পত্র'। এ নামকরণ কাব্যটির প্রথম কবিতানুযায়ী। জানতে ইচ্ছা করে গ্রন্থটির জন্যে সুকান্তের মনে কোন্ নামের খোঁজ চলছিল। যাই হোক, 'ছাড়পত্র' আশ্চর্য সার্থক নাম। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে সুকান্তের কবিসম্মানের ছাড়পত্র হিসাবেই গ্রন্থটি আবির্ভূত হয়েছিল। কবির চোখে যখন বিশ্বের আলো নিভলো, ঠিক তারপরেই তাঁর কাব্য বিশ্বের আলোকে আত্মপ্রকাশ করলো এমন যোগাযোগ পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে আছে কিনা আমায় জানা নেই। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটিও আমি

কিনেছিলাম, কী অদ্ভুত নাম—'ঘুম নেই' কার ঘুম নেই? কবির? কবি তো অনেকদিন হল চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তবে মৃত্যুর পরপারে কবি-কিশোর কি তখনও এবং এখনও অতন্দ্র—এই অর্থে 'ঘুম নেই'? নাকি ঘুম নেই বিশ্ববাসীর, সাধারণ মানুষের, মূঢ় ম্লান মূক পরিজনের? দুই-ই সত্য। 'ঘুম নেই' আমাদের মন থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তখনও স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং স্বদেশপ্রেমের উত্তালতা, আবেগবিশালতা, প্রতিজ্ঞা ও প্রাণনার মত্ততা চতুর্গুণ চলছে আমাদের দেশে। আমরাও শুনেছি সুকান্তের মতো —"আকাশে আকাশে ধ্রুবতারার কারা বিদ্রোহ পথ মাড়ায়। ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়। জানে না কেউ"। হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে বাড়ি পালিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছি। কৃষক মজুরের দুঃখের দুস্থতার শামিল হতে চেয়েছি। "পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"—এ আমাদেরই মুখের ভাষা, বুকের ভাষা হয়ে গেছে। চাঁদের দাম এতে কতটা কমেছে তখন বুঝি নি কিন্তু ঐ পঙ্‌ক্তিটি রুটির দাম অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। গান শুনেছি 'হেমন্ত-কণ্ঠে 'রানার রানার'। বাধা না-মানার দুর্দম চীৎকার উঠেছে বুকের মধ্যে। এ সবই এক গ্রামের অপটু নিঃসঙ্গ কিশোরের মানস-জগতের প্রতিক্রিয়া যার বাড়ির তিন মাইলের মধ্যে কোনো গ্রন্থাগার ছিল না এবং যার স্কুলে সুকান্তের বই দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য ছিল। কলকাতার কলেজে এসে সে-যুগে, সেই ১৯৫৩ সালে পেলাম চিন্তাতারল্যের অপবাদ, শুনলাম সুকান্ত-ভৎর্সনা। বাংলার বিখ্যাত অধ্যাপক বললেন 'হে মহাজীবন' কবিতাই নয়। চাঁদকে ঝলসানো রুটি দেখার মধ্যে যতখানি পেটের জ্বালা আছে, তার কিছু অংশও নেই কাব্যের রস—নেই ব্যঞ্জনা ধ্বনি প্রথা-সিদ্ধি ও প্রতীতি। রাবীন্দ্রিক ব্যঙ্গের ঢঙ ছিল তাঁর বক্তব্যে (ফুল্লরার দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান। আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান' উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ আমানির আধিক্য দেখেছিলেন কাব্য-রসের আস্বাদ পান নি)। তিনি ছিলেন একাধারে প্রীতিপদ ও ভীতিপ্রদ অধ্যাপক, কারণ রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতাকে নিছক প্রেমের কবিতা হিসাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন এর ঐতিহাসিক দ্ব্যর্থ সম্পূর্ণ সধমক অস্বীকার করে এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসের জন্য আমাদের প্রত্যেককে বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ কিনিয়েছিলেন। তারপর সুকান্তের কথা ভুলে গেছি। কারণটা কি সুকান্ত তখন ঘরে ঘরে প্রচারিত ও পুনরুজ্জীবিত, না সুকান্তর দিন বঙ্গীয় ব্যর্থতা ও ভারতীয় প্রতারণার মধ্যে বিলীন হয়েছিল বলে? ভারতবর্ষে তখন এমন আত্মধ্বংসী দিশাহারা সময় এসেছিল

যাকে সুকান্তর ইঙ্গিতে ভাষা দেওয়া যায়—"আঁধিয়ারে কেঁদে কয় সলতে। চাইনে চাইনে আমি জ্বলতে"। স্বাধীনতা-উত্তর দীর্ঘ অগ্নিঅসহনের যুগে সুকান্ত, বিস্মৃত ছিল, আজ আবার সুকান্ত-নজরুলের স্মরণ নেবার দিন এসেছে। কারণটা আমরা সবাই জানি। বাইশ বছরের অনস্বীকার্য ব্যর্থতার পর আজ সুকান্ত আমাদের বড় প্রয়োজন।

২

সুকান্ত ভগ্ন স্বপ্নের কবি, সুকান্ত পুনরুত্থানের কবি। সুকান্ত অগ্নি ও অশ্রুর কবি। বাংলা সাহিত্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ খুব কম প্রতিভাসিত, অনলউল্লাস নেই, বাড়বানল বোধাতীত। সেই কবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকা বলেছিল—'আমার যৈবন কাল ভুজঙ্গম খাইলে ছুঁইলে মরি।' সে আগুন অচিরে কামাকাঙ্ক্ষায় নিভে গিয়েছিল। চাঁদসদাগর অন্ধ প্রহার বিরন্ধে বজ্রাগ্নি বিশেষ, কিন্তু তিনি মনসার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের ঠাণ্ডা সরলতা স্বীকার করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে আর এক অগ্নিসাধক মেঘনাদ বধ কাব্যে রাবণ অশ্রুপারাবারের অতলান্ত আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। মেঘনাদের প্রেম ও পৌরুষের দীপ্তি অচিরে কাল কবলিত হয়েছে, প্রমীলা চিতারোহণ করেছেন অশ্রুতরঙ্গিত সিন্ধু বেলা-ভূমিতে। বিশুদ্ধ অগ্নিমূর্তি 'গোরা' যেখানে আত্মজন্মের ইতিহাস শুনলো সেখান থেকেই অশ্রুময় গভীর নিস্তব্ধতা। বাংলাদেশ অশ্রুহীন অগ্নির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে নি, অশ্রুনিষিক্ত ক্ষণদীপ্ত অগ্নিশিখার উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করেই বাংলা সাহিত্য কখনও কখনও বিশেষত্ব অর্জন করেছে। শ্যামল বাংলা ভিজে মাটির দেশ, কবি কল্পনা দক্ষিণাবাতাসে স্নিগ্ধ। এরই মধ্যে নজরুল ও সুকান্তের আবির্ভাব আধুনিক কালে পূর্বাপরহীন সীমিত ইতিহাস রচনা করেছে। এই গণ্ডীর মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মরুভূমি চর্চার মধ্যেও নয়নজলের আমেজ ও আয়োজন লক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ অনেক স্বল্পায়ু কবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছে। বিস্ময়কর জীবনে যারা মৃত্যুকে সব থেকে বড় করে অস্বীকার করেছে তারাই মৃত্যুর দ্বারা সহজে অধিকৃত হয়েছে। নবজাগ্রত বাংলার প্রথম বিদ্রোহী কবি মধুসূদনের জীবননাট্যের প্রথম অঙ্ক থেকেই যুদ্ধ ও যুদ্ধভ্রান্তির আলেখ্য শেষ হয়েছিল পঞ্চমাঙ্কের পরম প্রগাঢ় ট্রাজেডীতে। নজরুল ছিলেন জনদরদী, বিদ্রোহী, পঙ্গু

আচারের বিরুদ্ধে একনিষ্ঠ যোদ্ধা। সেই নজরুল আজ মৃতবাক, মৃতচেতন, জীবনমৃত—মৃত্যুর দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত। সুকান্ত স্বসম্বোধন করেছিলেন—"মৃত্যুকে ভুলেছ তুমি তাই, তোমার অশান্ত মনে বিপ্লব বিরাজে সর্বদাই।" কিন্তু মৃত্যু সুকান্তকে ভোলে নি। সুকান্ত তাঁর এক পত্রে বন্ধুকে বলেছিলেন—"বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার* মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব। "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।" কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র করছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে। আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকবো না আমি থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবুও জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম।" ১৩৪৮ সালের ২৪শে পৌষে লেখা এই পত্রে সুকান্তহৃদয়ের দুটি দিক ধরা পড়েছে। অগ্নিউত্তাপ এখানেও আচ্ছন্ন হয়ে আছে অশ্রুবাষ্পে। জানি না কোন 'নতুনকে তিনি সার্থক করে' যাবার কথা বলেছেন। নিজের কবিসিদ্ধির সার্থকতা তিনি জেনে যেতে পারেন নি। প্রিয়মূল্য ও রসিক প্রশংসা তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের পরিণত বয়সের দিক থেকে তখন ছিল দিগন্তের অলক্ষ্য ওপারে। যে রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং যে পার্টির তিনি একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন, সেই পার্টির কাছে তিনি বাঁচার জন্য অর্থ ও ঔষধ পান নি। "···অবিরাম আন্তরিক খাটুনির পুরস্কার হিসাবে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্যে পাঁচটি টাকা। আর পেলুম চারদিনের জন্যে পার্টি হাসপাতালের 'ওষুধপথ্যহীন' কোমল শয্যা। এতবড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে আর কখনো হই নি। আমার লেখক-সত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মী-সত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে। দুই সত্তার দ্বন্দ্বে কর্মী-সত্তাই জয়ী হতে চলেছে : কিন্তু কি করে ভুলি দেহে আর মনে আমি দুর্বল : একান্ত অসহায় আমি ?" ভালোবাসার প্রতিও তিনি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। বিদ্রোহী কবিকিশোরের মধ্যেকার প্রেমিক মানুষটি তাঁর চিঠিপত্রে ধরা পড়েছে। প্রথমে 'উপক্রমণিকার অন্তরঙ্গ বন্ধু,' তারপর 'উপক্রমণিকা' (ছদ্মনাম) স্বয়ং তাঁর হৃদয়ে প্রেমের জোয়ার এনেছিল। তার 'তীব্র শারীরিকতায়,' 'বিদ্যুৎময় ক্ষণিক দেহব্যঞ্জনায়' তিনি বারেক প্রমত্ত আবেগে ডুব দিয়েছিলেন। অন্য আর একটি মেয়ের 'নম্রতায়' তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কোন তরুণীর 'স্নিগ্ধতার একটি অপরূপ

* জাপানী বোমারু বিমানের দ্বারা আক্রান্ত কলকাতা—লেখক

বিকাশ' তাঁর অন্তর ছুঁয়েছিল। কোন 'সহানুভূতিশীলা'র 'মোমবাতির আলোর মতো স্নিগ্ধ ব্যবহার' তাঁকে অভিষিক্ত করেছিল। তবু শুনি মৃত্যুপথিক কবি-পত্রকার লিখছেন—"আমার প্রেম সম্পর্কে সম্প্রতি আমি উদাসীন।" অনেকগুলি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। স্বাধীনতা, পরিচয়, কবিতা, শতাব্দীর লেখা, বসুমতী, আজকাল, উজ্জয়িনী, মেঘনা, ক্রান্তি, রংমশাল, ত্রিদিব প্রভৃতি পত্রিকা সুকান্তকে সুবিদিত করেছিল। ফ্রান্সে ও আমেরিকায় তাঁর জীবনী বার হবে এ খবরও তিনি পেয়েছিলেন। হাসপাতালে চরম অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর কয়েকদিন আগে 'ছাড়পত্র' কাব্যের সমস্ত কবিতার ছাপানো ফাইল দেখার ভাগ্য তাঁর হয়েছিল, কিন্তু তবু কবি নিরাশাকে, মনোভঙ্গের বেদনাকে, আয়ুগ্রাসী মৃত্যুকে জয় করতে পারেন নি। প্রথম যৌবনের তোরণদ্বারে জীবনাবসানের চরণধ্বনি শুনে তিনি বলেছিলেন—"...আমার ধ্বংস অনিবার্য। আজ বুঝেছি কেন এত লোক দুঃখ পায়, সঠিক পথে চলতে পারে না। আলেয়া-যৌবন তার দিক্‌ভ্রান্তি ঘটায়।...প্রথম যৌবনের অলস অসতর্ক মুহূর্তে আমরাই আমাদের শ্মশানের চিতা সাজাই হাস্যমুখর দিনের পরিবেশনে। অশিক্ষিত আমাদের দেশে যৌবনে দুর্ভিক্ষ আসবেই। ভাবতে বিস্ময় জাগে যৌবনবিপন্ন বীতশ্রদ্ধ এই কবিই একদিন আঠারোর জয়গান করেছিলেন—"আঠারো বছর বয়সের নেই ভয় | পদঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা, | এবয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—। আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।"

ব্যক্তি ও কবি সুকান্তের সব কিছু জানবার প্রচেষ্টায় বার বার প্রবেশ করে নজরুলের ইতিহাস। সুকান্ত নজরুলের কথা বলেন নি, বলেন নি মধুসূদন সম্বন্ধে কোনো কথা। নজরুল সম্বন্ধে সুকান্তের নীরবতার কারণ কি? জীবন সাহিত্য ও রাজনীতি থেকে কবি নজরুল নির্বাসিত হলেন নির্বাক নিশ্চেতন রোগজীর্ণ জগতে ১৯৪২ সালে। তারপর যেন নজরুলের অসমাপ্ত দায়িত্ব হাতে নিয়ে সুকান্তর আবির্ভাব। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ছাড়পত্রে' সংকলিত কবিতাগুলি ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে লেখা। নজরুল সুকান্ত নানা ভাবে তুলনাযোগ্য। উভয়েই বিদ্রোহী। বিদ্রোহী হয়েও উভয়েই প্রেমিক। নজরুলের অজস্র সুন্দর প্রেমের কবিতা, সুকান্তের নেই বললেই হয়। কারণ তাঁর এক বিশেষ ধারণা "প্রেমে পড়ে কবিতা লেখা আমার কাছে নক্কারজনক বলে মনে হয়।" নারীপ্রেমের পূর্বরাগ পর্ব পার হয়ে বিরহে আসার সময় পেলে হয়তো আমরা সুকান্তের কাছ থেকে প্রেমের কবিতা পেতাম। তাঁর গীতগুচ্ছে ও

'পূর্বাভাস' কাব্যে সামান্য প্রণয়স্বাদ বর্তমান। উভয় কবিই গান রচয়িতা। উভয়েই রবীন্দ্রভক্ত। নজরুলের রবীন্দ্রপ্রেম সুবিদিত, সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধাশীল প্রায় পাঁচটি কবিতা লিখেছেন। উভয়ের কাব্যে ও রাজনীতি চিন্তায় দেশগণ্ডীর ক্ষুদ্রতা অনুপস্থিত ছিল। আরো লক্ষণীয়, দুই অভিমানী কবি স্বদেশের স্বাধীনতা আসার আগেই নীরব হয়ে গেছেন। কেন এমন হল ? এ কি শুধুই কাকতালীয় ?

"বীররসে ভাসি, গাইব, মা, মহাগীত"—এমন প্রতিজ্ঞা। যদি সুকান্ত করতেন তাহলে তার ফলশ্রুতি বিচারে আমরা কি দেখতে পেতাম ? দেখতে পেতাম যে কবির প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু তাঁর বীররস সৃষ্টিমানসে ফল্গুধারার মতো করুণরসের উৎস বিদ্যমান। তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্য হাতে পেয়ে দ্বিতীয় কবিতায় পড়েছিলাম—

"জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ;"

আনন্দ-জাগরিত উল্লাসমথিত আমার হৃদয় তারি পরের কবিতা অন্বেষণ ক'রে পেল—

"তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।"

আবরণ অশ্রুকল্লোল আছড়ে পড়ল মনের তটে। সুকান্ত প্রতিজ্ঞাসচেতন, আশাবাদী, কর্মমুখর কবি। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তাঁর হাত দিয়ে কবিতালক্ষ্মীর পরম প্রসাদ বিতরিত হয়েছে। ইতিহাসের বিরাট পেক্ষাপটে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে তিনি তখনই অভ্যস্ত। ঘাসের, রক্তের আর চোখের জলের কাহিনী তিনি পাঠ করেছেন, তিনি নিজেই হয়ে উঠেছেন ইতিহাস। অতীত ও বর্তমান, দেশ ও দেশাতীত পৃথিবী তাঁর কাব্যে কি ভাবে বাণী পেয়েছে তা সহজেই পরিলক্ষিত হয়। সমালোচক দেখেছেন—"১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল—যুগসন্ধির

এই পাঁচটা বছর ছাড়পত্রের রচনাকাল। একদিকে মৃত্যুকীর্ণ যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী, অন্যদিকে জীবনপ্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম—জয়পরাজয় আর উত্থান পতনে, সুখদুঃখ আর আশা নিরাশায় ঘেরা এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে' উৎকীর্ণ হয়ে আছে। কোটি কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশা কবি কণ্ঠে নির্ভীক ঘোষণায় ফুটে উঠেছে।" (৩য় সংস্করণ; ছাড়পত্র) এই নির্ভীকতা দ্বিধাহীন হলেও অশ্রুময়। 'বোধন কবিতায় মহামানবকে আহ্বান করে বীর্যদীপ্ত কবির আক্রমণের, প্রতিশোধ গ্রহণের কণ্ঠস্বর কম্পিত কান্নার ধ্বনি শুনি—

"প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবন মরণে
কখনো ভুলতে পারি?"

তার পরের অংশই বিদ্যুতের মতো প্রতিজ্ঞার আগুন দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে—"আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই। স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।"

এই হচ্ছে সুকান্তের কবিমানসিকতার চড়াই উৎরাই ছন্দোরূপ। 'প্রার্থী' কবিতা ব্যথা ও বিক্ষোভে ভরা, 'একটি মোরগের কাহিনী'তে উদ্বেলিত কান্না, 'দুরাশার মৃত্যু'তে শুদ্ধ নিরাশা, 'অনুভব' কবিতায় বেদনা ও বিদ্রোহের দুই ধাপ। 'এই নবান্নে' কবিতায় তারই পুনরাবৃত্তি।

সুকান্ত আত্মসচেতন ও বাস্তবিকতার কবি। তিনি সমাজ সচেতন ও ইতিহাসের শিক্ষায় দীক্ষিত। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট অথচ ছন্দে; শব্দ চয়নে, পঙ্‌ক্তি গঠনে, ভাবগতি নির্মাণে তিনি ততদূরেই যান যতদূর যাওয়া একজন প্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষে উচিত। জেহাদ ও স্লোগানের কবিতা কবিতা হয়ে উঠার পটুতা পেয়েছে আন্তরিকতা ও প্রাণময়তার জন্য। 'ঘুম নেই' কাব্যে উত্তেজনার থেকে স্থিরতা অনেক গাঢ়, প্রতিজ্ঞা আত্মমুখীন প্রস্তুতিতে একাগ্র। কোথাও সংকোচ নেই বিদ্রোহীর; তিনি যেমন লেনিনের জয়গাথা রচনা করেন তেমনি হাত ধরেন গান্ধীজীর। মার্শাল টিটোও তাঁর বাণীবন্দনা লাভ করেন। রোম, চট্টগ্রাম, ইউরোপ, ভারতবর্ষ, কলকাতা তাঁর মধ্যে একাকার। তিনি সূর্যপূজারী। আলোর ভিক্ষা নিয়ে কতবার তিনি দাঁড়িয়েছেন প্রভাতসূর্যের সামনে। আঁধার-আক্রান্ত কান্নায় তবু তাঁর বুক ফেটেছে। সূর্যপ্রণাম : উদয়াচল, সূর্যপ্রণাম : অস্তাচল—গুচ্ছে অনেকগুলি কবিতা ও গানে তিনি সেই চরিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। অগ্নিমন্ত্রে

দীক্ষিত সূর্যপূজারী কবির চরিত্র সিগারেট, দেশলাই কাঠি, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি কবিতায় ধরা পড়েছে। তবু প্রিয়তমাসু কবিতায় তিনি বলেছেন—

"আমি যেন সেই বাতিওয়ালা
যে সন্ধ্যায় রাজপথে পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।"

রৌদ্রের গান লিখতে লিখতে শেষ করলেন সেই একই কান্নায়—

"সূর্য, তোমায় আজকে এখানে ডাকি
দুর্বল মন দুর্বলতার কায়া,
আমি যে পুরনো অচল দীঘির জল
আমার এ বুকে জাগাও প্রতিচ্ছায়া।"

সুকান্তের চৌদ্দ বছর বয়সের লেখা কাব্য 'পূর্বাভাস'। এই 'পূর্বাভাস' থেকেই তাঁর অগ্নি অশ্রু সমন্বিত মনোভঙ্গি ধরা পড়েছে। 'পূর্বাভাস' কাব্যেই পরিমিত ছকে নিপুণ কবির উত্তীর্ণ দুটি কবিতা 'অসহ্য দিন' ও 'উদ্যোগ' পর পর গ্রথিত কবিতা দুটি দীপ্ত ও সিক্ত ভাবের দ্যোতনা আনে। 'অসহ্য দিন' কবিতায় সময়ের ভার, আবেগের ভার, বিপদের ভার কবিকে অক্ষম করে তুলেছে। অক্ষম কবির মনে হয়েছে 'জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত'। পরবর্তী 'উদ্যোগ' কবিতায় জনযুদ্ধের আহ্বান ও প্রস্তুতি উচ্চ কণ্ঠে দৃপ্ত তেজে বিঘোষিত। এখানে সুতীক্ষ্ণ চেতনার, সুদৃঢ় চিত্তের কবি বলেছেন—

"ঘরে তোল ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখ কাস্তে
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।"

স্বপ্নপথ কবিতায় তো নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুসাধনার বাণীরূপ। এমনিভাবে উন্মেষ লগ্ন থেকেই কবি কখনো আহতকণ্ঠ, কখনো প্রতিজ্ঞাকম্পিত। এর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই, নেই পরানুকরণ, নেই যান্ত্রিক বক্তব্যের অভিঘাত ও গ্রন্থনা। সবই বুকের কোরকে ও স্নায়ুতন্ত্রীতে উপলব্ধিজাত, স্বতঃস্ফূর্ত, বেগবান, তির্যগাভাস মূর্ত।

আমরা ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস পর পর আলোচনা না করে যদি পূর্বাভাস, ছাড়পত্র, ঘুম নেই—এইভাবে আলোচনা করতাম তাহলে দেখতাম কেমন ক'রে অশ্রুসায়রের বাড়বানলের আয়োজন হয়েছিল। বিদ্যাসাগর-তর্পণ করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'সাগরে যে অগ্নি থাকে মিথ্যা সে তো নয়'। সুকান্ত-

প্রতিভা বিচারেও সে উক্তি প্রযোজ্য। বেদনা, হতাশা, ব্যর্থতাবোধ থাকা সত্ত্বেও সুকান্ত মূলত বীররসের, বিদ্রোহ রসের, উদ্দীপনার কবি। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব—তেমনি সুকান্তের কবিসত্তা অগ্নিরূপময় অগ্নিসম্ভব। তাঁর কাব্য সাধনার প্রথম ও শেষ কথা—ক্লৈব্যম্ মাস্ম গমঃ—ক্লীবতা ত্যাগ কর। বাংলার নরম মাটিতে করুণ রসেব বহু আয়োজন। তাই তার ব্যর্থতা ও অকাল মৃত্যু তাঁর কালের, তাঁর দেশের প্রতিচ্ছবি। একান্ত একক, বিচ্ছিন্ন বা নির্জনতার কবি নন। তিনি তাঁর যুগের তাঁর কালের ফসল। তাই তাঁর অঙ্কুরে বিনষ্টি। তাঁর স্বীকারোক্তি "আমার ঐশ্বর্য নেই, নেই রঙ, নেই রোশনাই। শুধুমাত্র ছন্দ আছে, তাই দিয়ে শুভেচ্ছা পাঠাই।" এই শুভেচ্ছা যেখানে পৌঁছেছে এবং নিরবধি পৌঁছোবে সেখানে তিনি ব্যর্থ বিদ্রোহী কিন্তু সার্থক কবি।

কবিকিশোর ॥ জগদীশ ভট্টাচার্য

বাংলার তরুণতম কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যুসংবাদ শুনে প্রথমেই মনে পড়ল সত্যেন্দ্রনাথের 'ছিন্ন-মুকুল'এর শেষ চার পংক্তি—

"সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবাব আগে সরে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব-চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে"

তরুণ প্রতিভার অকাল-মৃত্যু পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম নয়। মনে পড়ছে শেলী-কীট্সের কথা। বিশেষ ক'রে কীট্সের। জীবনের ছাব্বিশটি বসন্ত শেষ না-হতেই তাঁকে বিদায় নিতে হল এই চিরসুন্দর পৃথিবী থেকে। সুকান্তের সঙ্গে কীট্সের মৃত্যুর একদিক দিয়ে মিল আছে—উভয়েরই মৃত্যু ক্ষয়রোগে। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে সুকান্ত একক, অনন্য। মৃত্যুর পূর্বে কীট্স অভিমানবশে বলে গিয়েছিলেন, আমার সমাধি-ফলকে লিখে রেখো—"Here lies one whose name was writ in water." সুকান্তের ব্যক্তিগত নালিশ কারো বিরুদ্ধেই ছিল না, ব্যক্তি-সত্তাই যেন তার ছিল না; সুতরাং এমন অভিমান সে কোনোদিনই প্রকাশ করিতে পারত না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়েছে ইংলণ্ডের

আরেকটি কবিকিশোরের কথা—চ্যাটারটন। দারিদ্র্যের দুঃসহ কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে নৈরাশ্যে সে সতেরো বছর বয়সে আর্সেনিক খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সুকান্ত আত্মহত্যা করে নি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তারও মৃত্যুর মূল কারণ দারিদ্র্য। চোখের সামনে ভাসছে সুকান্তর একটি অপ্রকাশিত রচনা—

"অসহ্য দিন, স্নায়ু উদ্বেল, শ্লথ পায়ে ঘুরি ইতস্তত
অনেক দুঃখে রক্ত আমার অসংযত!
মাঝে মাঝে যেন জ্বালা করে এক বিরাট ক্ষত
হৃদয়গত।
ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে,
দিনরাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে,
এখানে ওখানে পথে চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত :
মনে হয় যেন জীবন ধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত।"

হয়তো এটা কবিতা নয়, ব্যক্তিমানসের কোনো দুবল ক্লান্ত মুহূর্তের কড়চা। কারণ কবি সুকান্ত চিরকিশোর। তার মনে নৈরাশ্য নেই, নেই অবসন্নতার ক্লান্তি। কৈশোরের অম্লান স্বপ্ন আর অটুট বিশ্বাস ছিল তার কবিপ্রেরণার মর্মমূলে। তবু তার সামাজিক মন জানত জীবনের রঙ্গমঞ্চে কি ভূমিকা তাকে অভিনয় ক'রে যেতে হবে। যে অপূর্ব বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা-প্রজ্ঞা বলে সুকান্তর কবি-দৃষ্টি এত অল্প বয়সেই আশ্চর্য স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়েছিল সেই প্রজ্ঞাবলেই সে জানতে পেরেছিল ইতিহাসের যুগসন্ধিকালের আত্মপ্রবুদ্ধ চেতনার সার্থকতা কোথায়—

"এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাবো আশীর্বাদ,
তারপর হবো ইতিহাস॥" [ছাড়পত্র

ইতিহাস হয়েছে বটে ! কিন্তু এই মর্মান্তিক পরিণামে আমাদের সান্ত্বনা কোথায় ? শব-সমাকীর্ণ বাংলার মহাশ্মশানে পঞ্চাশের মন্বন্তর আর মহাযুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে যার যাত্রা শুরু, আর বিদেশীশাসনের অন্তিম প্রহরে সাম্রাজ্যবাদের কুটিল চক্রান্তে উৎক্ষিপ্ত হিন্দুমুসলমানের ভ্রাতৃদ্রোহী রক্তপাতে, কলুষিত পথের প্রান্তে যার যাত্রা শেষ, তার কিশোর-বুকে অবিরত রক্তক্ষয়ী বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি কি করে হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তর এ যুগের মানুষের কাছে দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তথাপি কি শোকাবহ এই পরিণাম। যে দেশের আকাশ-বাতাস কিশোর-কিশোরী-লীলার কোমলকান্ত-পদাবলীতে প্রতিধ্বনিতে, সে দেশের কবি-কিশোর সুকান্তকে কি দুঃখেই না বলতে হয়েছে—

"এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী। সেলাম, তোমাকে সেলাম।" [অনুভব

চিরবসন্তের কবি রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার যার পরম গৌরব তাকে কী গভীর বেদনাতেই না উচ্চারণ করতে হয়েছে—

"আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।"

কিন্তু এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করবার জন্যেই তো সুকান্তর মতো মহৎ কবিপ্রাণের জন্ম হয় নি। মনের খেয়ালে দেয়ালে-দেয়ালে নখের আঁচড় কেটে দুহাতে যে কবিতার ফুলঝুরি ছড়িয়ে গেছে তার সঙ্গে ভাগ্যের এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস! যে চাঁদ চিরকাল কবিপ্রেয়সীর মুখচন্দ্রের উপমান আর মধুর আদিরসের উদ্দীপন-বিভাব হয়েছে, সেই চাঁদ আর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কবির মনে হয়েছে—

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবীর গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

অথবা হয়তো এরই নাম ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। যে ধারাবাহিক কার্যপরম্পরায় সুকান্তর জীবন গ্রথিত ছিল তার বিচার-বিশ্লেষণে বসলে হয়তো মনে হবে এই পরিণতিই ছিল তার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

২

সুকান্ত যে অনন্যসাধারণ কবি ছিল, প্রথম প্রকাশেই ছিল তার নিঃসংশয় প্রমাণ। তাই সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য 'বিবৃতি' ও তার কণ্ঠে 'সহৃদয়াহ্লাদকারিস্পন্দসুন্দর, কাব্য হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে তার পরিচয় স্পষ্ট হল। দেখা গেল সুকান্তের কবি-পরিচিতি দশজনের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতো নয়। যে কবির বাণী শোনবার জন্যে কবিগুরু কান পেতে ছিলেন সুকান্ত সেই কবি। সুকান্তই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম জনগণের কবি। শৌখিন মজদুরী নয়, কৃষাণের জীবনের সে ছিল সত্যকার শরিক, কর্মে ও কথায় তাদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল তার, মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তার দেহমন। মাটির বুক থেকে সে উঠে এসেছিল।

কিন্তু কথাটাকে একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্য আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে তার চারটি সুস্পষ্ট ধাপ। [অবশ্য মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ, নজরুল-প্রেমেন্দ্র-সজনীকান্তকে বাদ দিয়েই এ কথা বলছি।] রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্য-স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এ যুগের কবিমানসে প্রথম ধরা পড়ল অসংখ্য সমস্যাভারে জর্জরিত জীবনের দুর্বোধ্য জটিলতা, এ ধাপের মুখ্য-কাব্য রচনা করেছেন বিষ্ণু দে। কিন্তু জীবন শুধু তো দুর্বোধ্যই নয়, বলিষ্ঠ আশা ও বিশ্বাসের শ্রী-সৌন্দর্য হারিয়ে এ যুগের নাস্তিক মনে দেখা দিয়েছে এর কদর্য কুরূপতা। এই নাস্তিক-চেতনা সঙ্গে এনেছে ধ্বংসমুখী নৈরাশ্য। এধাপের মুখ্য কবি সমর সেন। এই ধ্বংসস্তূপ আর নৈরাশ্যের মধ্যে দেখা দিয়েছে নতুন দিগন্তের নবজীবনে স্বপ্ন; গড়ে উঠেছে নতুন আশা ও আশ্বাস; বাংলা কাব্যে সে আশ্বাসের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সে যে আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী জনচেতনার সঙ্ঘশক্তির মধ্যে এই বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি, আজকের কাব্য এসে দাঁড়িয়েছে সেই বিরাট ও বিপুল জনচৈতন্যের কেন্দ্রস্থলে। সুকান্ত সেখানে দাঁড়িয়েই গেয়ে উঠেছে নবজীবনের গান। সুকান্ত জনগণেরই একজন, তার কণ্ঠেই প্রবুদ্ধ জনচৈতন্য প্রথম নিজের ভাষা খুঁজে পেয়েছে।

একদিক দিয়ে সুভাষ সুকান্তর অগ্রজ। উভয়েরই দীক্ষা ও জীবনধর্ম এক। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক, কবিধর্মও স্বতন্ত্র। 'পদাতিকে'র সঙ্গে 'ছাড়পত্রে'র তুলনা করলেই উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট হবে। পদাতিকের কবিমানস বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ। নবজীবনের প্রেরণা তার কণ্ঠে গান হয়ে উঠেছে। রোমান্টিক স্বপ্নাবেশকে আঘাতে আঘাতে ভেঙে দিয়ে পদাতিকের কবি নৈরাশ্য-পীড়িত মধ্যবিত্ত-মনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন নতুন দিনের বিশ্বাস। কিন্তু যে

প্রেরণায় তিনি উদ্দীপ্ত, তাঁর নিজের মনে সে প্রেরণা এক নতুন ধরনের রোমাঞ্চই সৃষ্টি করেছে। তাই দীপ্তিকাব্যের কবি হয়েও তাঁর আবেদন রোমান্টিক। তাঁর প্রধান বাহন পর্বভূমক ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, তার সার্থকতা সংগীত সৃষ্টিতে। তার বাচনভঙ্গীও তির্যক্; বক্রোক্তিই তাঁর কাব্যজীবিত। সব কিছু মিলিয়ে পদাতিকের কবি রীতি-প্রধান; বুদ্ধিদীপ্ত বক্রোক্তির সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত মিশিয়ে তিনি এমন এক অপূর্ব কাব্যলোক সৃষ্টি করেছেন যা একান্তই তাঁর নিজস্ব এবং অনন্যসাধারণ।

ছাড়পত্রের কবিমানস অধস্তন জনসমাজের প্রতিভূ। সুভাষের কাব্যে আছে মধ্যবিত্ত সমাজের হৃৎস্পন্দন, (সুকান্তের কাব্যে জনকল্লোল। সুকান্ত নবজীবনের চারণ নয়, সে ঋত্বিক। তার কণ্ঠে গান নেই, আছে মন্ত্র। তার প্রেরণা ক্লাসিক। তার বাচনভঙ্গী ঋজু। তার প্রধান বাহন পদভূমক তানপ্রধান ছন্দ, সে ছন্দের আবেদন বাক্‌স্পন্দনের। ভাষার ধ্বনিঝংকারের চেয়ে অর্থগৌরব তার কাছে বড়। সে রীতি-গোত্রহীন; উদাত্ত কণ্ঠে নবজীবনের মন্ত্রোচ্চারণ করে গেছে। "মহৎ কাব্যের ভাবনা" গ্রন্থে এবারক্রম্বি কাব্যের প্রাণভূত যে মন্ত্রশক্তি'র কথা বলেছেন, সুকান্তের কাব্যে আছে সে শক্তি :—"I will call it, compendiously, 'incantation' the power of using words so us to produce in us a sort of enchantment ; and by that I mean a power not merely to charm and delight, but to kindle our minds into unusual vitality, exquisitely aware both of things and of the connexions of things." অর্থাৎ যে কাব্য শুধু ধ্বনিঝংকারে কেবল আবিষ্ট ও পুলকিতই করে না, আমাদের অন্তরকে অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্দীপ্তও করে সেই কাব্যই মহৎ কাব্য। সুকান্ত সেই মহৎ কাব্যের কবি।

সুকান্ত জনগণের কবি, একথার প্রধান তাৎপর্য এই যে জনগণের চেতনাই তার চেতনা, জনগণের দৃষ্টিই তার দৃষ্টি। মহাত্মাজীর উদ্দেশে রচিত তার একটি অপ্রকাশিত কবিতায় সে লিখেছে—

"চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ

এসেছে ; তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজি।

দিক্‌দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক,
তাই তো আজকে গ্রামে ও শহরে স্পন্দিত লাখে লাখ।”

এখানে সে চল্লিশ কোটি জনতার একজন মাত্র। কিন্তু ক্রমশ তার ব্যষ্টিসত্তা সমষ্টিসত্তার সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে। বন্ধু ঠিকানা জানতে চেয়েছে, উত্তরে সে বলছে—

“জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।
বন্ধু আজকে বিদায়!
দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা ক'রো॥”

মুক্ত স্বদেশে ব্যক্তি সুকান্তর দেখা আর পাওয়া গেল না, কিন্তু তার ঠিকানা যে প্রত্যেক ঘরে লেখা আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। বস্তুত সুকান্তর কাব্যে এযুগের তিনটি চিত্তবৃত্তি প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে :—(১) জনজীবনচেতনা, (২) সমপ্রাণতা, ও (৩) শুভকর্ম প্রেরণা। প্রত্যেক যুগেই কতকগুলো সঞ্চারীভাব মুখ্য হয়ে ওঠে। এ যুগের এই তিনটিই মুখ্য সঞ্চারী। তন্মধ্যে আবার জনজীবনচেতনাই মুখ্যতম। ‘জগদ্ধিতায়’, অর্থাৎ লোকহিতের আদর্শ পৃথিবীতে এমন-কিছু নতুন নয়, কিন্তু বিরাট ও বিপুল জনজীবনচেতনা এ যুগে যেমন ব্যক্ত হয়েছে অন্য কোনো যুগে আর তেমনটি হয় নি। ব্যক্তিজীবন যে সমগ্র সমাজ-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েই সার্থক, এই অনুভূতিটিই পাই সুকান্তর প্রত্যেক কবিতায়। বিচ্ছিন্নভাবে যে নগণ্য তুচ্ছ, সমগ্রভাবে সে যে এক বিরাট

শক্তি, বিপুল তার সম্ভাবনা,—এই তত্ত্বকেই সুকান্ত 'আগামী' কবিতায় আশ্চর্য কাব্যরূপ দিয়েছে—

"আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলিছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে।
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।"

শুধু অরণ্যের বিশাল চেতনার কথাই সে বলে নি, এর বিপুল সম্ভাবনার কথাও বলেছে। আজ যে বীজ সবেমাত্র অঙ্কুরিত হল আগামী কাল সেই হবে বিরাট বনস্পতি—

"ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো : হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে ;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন॥"

নবজাগ্রত জনজীবনে এই মহৎ সাফল্যের মধ্যেই তো এ যুগ ও আগামী যুগের শ্রেষ্ঠ-কাব্যের প্রেরণা। "হানো যদি কঠিন কুঠারে, তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে"—বীর্যবন্ত এই ক্ষমাশীলতার মধ্যে প্রাণশক্তির অজস্রতা যেন লক্ষগুণ হয়ে উঠেছে। আর শত্রুমিত্র-নির্বিশেষে এই প্রেমের মধ্যেই আছে সুকান্তর কাব্যের দ্বিতীয় গুণ, তার সমপ্রাণতা। 'জীবে দয়া নয়, মানবমৈত্রী থেকেই সে সমপ্রাণতার উদ্ভব। দরিদ্র-জীবনের 'বারোমাসী' গাইতে গিয়ে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধবনিতা ফুল্লরা বলেছিল,

"দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥"

সুকান্ত সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছে, 'হে সূর্য, তুমি তো জানো, আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব। সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে, এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে, কতো কষ্টে আমরা শীত কাটাই!'

"হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।"

এটি হয়তো কবিতা হয়ে ওঠে নি, কিন্তু অকৃত্রিম মানবপ্রেমের অমন নিবারণ উদাহরণ সাহিত্যে কদাচিৎ চোখে পড়ে। ফুল্লরার দারিদ্র্য আর এ দারিদ্র্যের চেহারা একই, কিন্তু ফুল্লরার দুঃখ ব্যক্তিসীমাকে অতিক্রম করতে পারে নি। এখানে দারিদ্র্য রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটার প্রতি সমপ্রাণতার রসে মিশ্রিত হয়ে মানবপ্রেমের চিরনূতন অমৃতের আস্বাদ বয়ে এনেছে।

সমপ্রাণতার আরেকটি সুন্দর নিদর্শন 'রানার' কবিতাটি। দিগন্ত থেকে দিগন্তে রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে মুখরিত ক'রে ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে চলেছে রানার। কাঁধে তার চিঠি আর নতুন খবরের বোঝা। কত গ্রাম কত পথ পেরিয়ে ভোরের শহরের উদ্দেশে তার রাতের পাড়ি। সে ছুটে চলেছে, আর—

"তার জীবনের স্বপ্নের মত পিছে স'রে যায় বন,

*

এমনি ক'রেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'।
ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে,
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্পদামে!
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

'ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে', তবু রানারের বিশ্রাম নেই। রাতের পর রাত সে বয়ে চলেছে মানুষের বার্তা। 'কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কতো দুঃখে ও শোকে' নরনারী তাদের প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে লিখছে চিঠি, সে-সব খবর তাদের কাছে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছে রানার। কিন্তু তার নিজের দুঃখ?—

"এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,

এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।"

যাদের দুঃখ কেউ কোনো দিনই জানবে না, করুণাকাতর কবি 'কালো রাত্রির খামে' ঢাকা তাদের দুঃখের কাহিনী খাম খুলে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। এর প্রেরণামূলে শুধু মমতা বা করুণাই আছে মনে করলে ভুল করা হবে, মানুষের সমব্যথী কবির সমপ্রাণতা থেকেই এর সৃষ্টি।

কিন্তু এই তামস-তপস্যার কি কোনো মূল্য নেই? আছে বৈ কি। প্রত্যেক মানুষ তার অকিঞ্চিৎকর কর্মের মধ্য দিয়েই দুনিয়ার কাজ ক'রে যাচ্ছে। আর সেখানেই দুঃখবহনের সার্থকতা। এ যুগের মানুষের কাছে তাই কাজের ডাক এসেছে দশদিক থেকে। যুগোত্তর কবির কণ্ঠেও তাই এ যুগের প্রেরণার গান শুনি—'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।' এ যুগের এই বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তির নাম দেওয়া যেতে পারে 'শুভ-কর্মপ্রেরণা।' শুভ-কর্মপ্রেরণা এ যুগের অন্যতম সঞ্চারী ভাব। এ দিক দিয়ে সুকান্তর 'কলম' ও 'ঐতিহাসিক' কবিতা দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কলম' কবিতাটির বাক্‌বিন্যাস ও চিন্তা গ্রন্থন একটু এলোমেলো হওয়াতে এর সামগ্রিক আবেদন সহজগ্রাহ্য হয় নি। কলমচি থেকে কলমকে, লেখক থেকে লেখনীকে এ কবিতায় পৃথক করা হয়েছে। যেমন শ্রমিক থেকে শ্রমশক্তিকে পৃথকভাবে কল্পনা ক'রে বলা চলে, হে শ্রমশক্তি, তুমি এতদিন ধনিকের আর বণিকের ক্রীতদাস হয়ে ছিলে, এবার বিদ্রোহ কর; দাসত্ব আর নয় দানবের হাত থেকে মুক্ত হয়ে এবার মানবের সেবায় দীক্ষিত হও। মানুষের ভাষা ও সভ্যতা সৃষ্টির পর থেকে কলমই মানুষের হাতে সবচেয়ে বড় শক্তি। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, এ দুনিয়ায় কলমের স্বাধীনতাই সবচেয়ে কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কলম মহাপ্রভুদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সে মহাপ্রভু কখনো সংবাদপত্রের মালিক, কখনো ধনিক-তন্ত্রের ভাগ্যবিধাতা, কখনো রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়ক। এমনকি, আত্মবিশ্লেষণক্ষম বিবেকবান মানুষমাত্রেই স্বীকার করবেন যে, এ যুগের অসংখ্য মতবাদের প্রাদুর্ভাবের দিনে কলমের স্বাধীনতা যেন একেবারেই নেই। জ্ঞাতসারেই হোক অজ্ঞাতসারেই হোক, আমরা কোনো-না-কোনো মতবাদের কাছে আত্মবিক্রয় করে বসে আছি। কবি তাই বলছে,

কয়েক পয়সায় কেনা, হে কলম, তুমি ক্রীতদাস।

কিন্তু এই "সাহিত্যের দাসত্বের ক্ষুধিত বশ্যতা"র হাত থেকে মুক্ত হতেই হবে

তাই কবি কলমকে বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছে। শিল্পকর্মে অনবধানতা বশত আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কবিতাটি বিদ্রোহ পাগল একটি শিশুর কাণ্ডজ্ঞানহীন চপলতার শোকাবহ দৃষ্টান্তমাত্র। নইলে সে লেখনীকে লেখকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলবে কেন? কিন্তু বাচ্যার্থকে অতিক্রম ক'রে এর গূঢ় ব্যঙ্গার্থে প্রবেশ করতে পারলে এ কবিতার মূলগত প্রেরণাকে প্রশংসা করতেই হবে।

শুভকর্মপ্রেরণার আরেকটি সুন্দর উদাহরণ 'ঐতিহাসিক'। পৃথিবীর আদালতের পরোয়ানা নিয়ে ইতিহাস আমাদের কাছে এই কৈফিয়ত দাবি করছে, "কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরলো পঞ্চাশ সাল?" বস্তুত মানুষের ইতিহাসে এক-একটা দেশ বা জাতির জীবনে আসে এক-একটি পরমমুহূর্ত, যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারলে নূতন ইতিহাসের সূচনা হয়। বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর এল, অসহায় পশুর মতো মারা গেল লক্ষ লক্ষ লোক, কিন্তু সেই মহা-দুর্দৈবের আক্রোশে নিপতিত সাধারণ বলি হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ হবার যে দুর্লভ সুযোগ আমাদের জীবনে এল তার সদ্ব্যবহার আমরা করতে পারলাম না —

"একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিশ্বাস।
চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন?
এসব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।
কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
তারো জন্যে চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।

*

তোমাদের ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলা দেখে
বন্ধ হয়ে গেছে মুক্তির দোকানের ঝাঁপ।"

কন্‌ট্রোলের 'কিউ' হয়েছে এ কবিতার উপমান। চলতি কালের একটি ঘটনা এর উপজীব্য। কিন্তু স্থানকালের পরিমিত সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও কবিতাটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে এর ব্যাপ্তি স্থানকালের সমস্ত সীমানাকে অতিক্রম করে গেছে। 'চল্লিশ কোটির দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন এক লাইনে'ও সঙ্ঘবদ্ধ

হবার প্রেরণা আসবে কোথা থেকে? কী হবে এর লক্ষ্য, আদর্শই বা দেখাবে কে? এর উত্তর কবির কাছেই পাওয়া গেল—

"হয়তো এই বিশ্বব্যাপী লাইনের শেষে
এখনো তোমাদের স্থান হতে পারে—
একথা ঘোষণা করে দাও তোমাদের দেশময় প্রতিবেশীর কাছে।
তারপর নিঃশব্দে দাঁড়াও এ লাইনে প্রতিজ্ঞা আর প্রতীক্ষা নিয়ে
হাতের মুঠোয় তৈরী রেখে প্রত্যেকের প্রাণ।

*

আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন॥"

ব্যক্তিজীবনে সুকান্ত একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু এই শেষ চার পঙ্‌ক্তিতে কবি সুকান্ত যে আদর্শের কথা বলে গেছে তা পৃথিবীর সমস্ত মতবাদের চেয়েও প্রাচীন, সমস্ত আদর্শের চেয়েও বড়। আকাশের ধ্রুব-নক্ষত্র আর নদীর গতিশীলতা, অরণ্যের মর্মর-ধ্বনি আর পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন যাকে প্রেরণা দেয়, সে যে সমস্ত মতবাদের ঊর্ধ্বে চিরকেলে কবিদেরই একজন, সে বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে?

সুকান্তর কাব্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রসাদগুণ। তার প্রকাশরীতি এতই অনাড়ম্বর যে পড়তে পড়তে মনেই হয় না, সে সচেতনভাবে ভাষা ও ছন্দের অলংকরণের কোনো চেষ্টা করেছে। অথচ ১৩৫০ সালে যে দুটি কবিতা নিয়ে সে প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে পদার্পণ করল সেগুলোর বিষয়বস্তু সাময়িক পত্রিকায়ই প্রকাশের যোগ্য। কিন্তু তবু তার মধ্যেই তার কবিকণ্ঠ শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। যেমন,

"ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম—
চট্টগ্রাম: বীর চট্টগ্রাম।

কিংবা

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভীড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,

দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,

প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।"

এসব কবিতা যখন লেখা হয় তখন সুকান্তের বয়স ষোলও পেরোয় নি। কিন্তু, বয়সের কথা তুলে লাভ নেই। কুড়ি বছর না-পেরোতেই তো তার জীবন শেষ হয়ে গেল! এই প্রসঙ্গে শুধু একথাই বলবার যে, একেবারে প্রথম থেকেই কবির কলমটি তার হাতে যেন স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, কি লক্ষণ দেখে উপরের পঙ্‌ক্তিগুলোকেও কাব্য বলে চিহ্নিত করা হল। বক্তব্য ভাষায় সমর্পিত হলেই যদি কাব্য হয়, তবে কাব্যে আর অকাব্যে তফাত রইল কোথায়? একথা আজ মানতেই হবে যে বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সহযোগে সহৃদয়মনের স্থায়ীভাব আসাদ্যমানতা প্রাপ্ত হলেই কাব্যাস্বাদ ঘটে, শুদ্ধমাত্র কাব্য-সাহিত্যের এই প্রাচীন রসবাদকেই অবলম্বন করলে এ যুগের অনেক রচনাকেই কাব্যস্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হবে না। চিত্তে হৃদয়বৃত্তি বা 'ইমোশনের' সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি বা 'থট্' অর্থাৎ 'ইণ্টেলেক্‌শন'ও আছে। প্রাচীনকালে ইমোশনাল কাব্যকে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু ইণ্টেলেক্‌চুয়াল কাব্যকেও আর অস্বীকার করার উপায় নেই।' 'সোনার তরী' আর 'চিত্রা'ও যেমন উৎকৃষ্ট কাব্য, 'বলাকা'ও তেমনি অনুৎকৃষ্ট নয়। কাব্যের এই দু'জাতের পার্থক্য বুঝাতে 'কাব্যালোকের' লেখক দুটো পৃথক নামকরণ করেছেন, দ্রুতিকাব্য আর দীপ্তিকাব্য; ইমোশনাল আর ইণ্টেলেক্‌চুয়াল পোয়েট্রি। কিন্তু থট্ বা ইণ্টেলেক্‌শন কখন কাব্য হয়ে ওঠে তাই বিচার্য। তত্ত্বের গভীর অরণ্যে প্রবেশ না ক'রেও বলা যায় যে, কবিমানসের আত্মোপলব্ধির আনন্দ অনুস্যূত থাকলেই চিন্তা কাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এ গেল কাব্যের আত্মার কথা; শব্দার্থময় কথাশরীরে কী ক'রে কাব্যলক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, এ প্রশ্নের উত্তর এখনো বাকি রয়ে গেল। মানুষের ভাষার দুটো উপাদান—ধ্বনি আর অর্থ। এই ধ্বনি আর অর্থের সহিতত্বের নামই সাহিত্য। ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত সমস্ত চিন্তারাজির মধ্যে ধ্বনি ও অর্থের সহিতত্ব রয়েছে। তার মধ্যে সেই সহিতত্বই হল কাব্যসাহিত্য, যাতে শব্দার্থের মিলন হয় আনন্দনিষ্যন্দী, কিংবা প্রাচীন শাস্ত্রকারের ভাষা উদ্ধার করলে বলতে হয় 'সহৃদয়াহ্লাদকারিস্পন্দসুন্দর'। এখানে কাব্যের আত্মা ও দেহকে পৃথক ক'রে বিচার করা হয়েছে বটে, কিন্তু কবির উপলব্ধি আর প্রকাশ দুটো স্বতন্ত্র ক্রিয়া নয়। কাজেই কবিমানসের আত্মোপলব্ধির আনন্দ শব্দার্থময় কথাশরীরে সঞ্চারিত হলেই তা হয় কবি বাক্য বা কাব্য। এ কথা স্মরণ ক'রে

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলোর বিচার করলেই তার কাব্যত্ব সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত হওয়া যাবে। সুভাষের সঙ্গে সুকান্তর তুলনা প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে যে বক্রোক্তিই সুভাষের কাব্যজীবিত, সুকান্তের দীপ্তিকাব্যে কিন্তু গৌরবোক্তিই প্রধান। এবং যে প্রসাদ-গুণ সুকান্তের কাব্যে এনেছে প্রাঞ্জলতা তার মূলে আছে এই সত্য যে, সুকান্তর উপলব্ধি আর প্রকাশ অপৃথকযত্নসম্ভূত। সুকান্ত বাংলা কাব্যের যে নবযুগের পথ দেখিয়ে গেল উপলব্ধি ও প্রকাশের প্রাঞ্জলতাই তার মুখ্য লক্ষণ। রবীন্দ্র-পরবর্তী দুর্বোধ্যতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে এখানে এসে যেন উন্মুক্ত প্রান্তরের খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস ফেলার আনন্দ পাওয়া গেল।

কাব্যের উপাদান হিসেবে সুকান্ত যে-সব প্রতীক ব্যবহার করেছে সেগুলোও চলিত জীবনের পথের দুপাশ থেকেই কুড়িয়ে নেওয়া। তার জন্যে তাকে বিদেশী বা স্বদেশী পুরাণ-উপকথার শরণ নিতে হয় নি। সুকান্তর কাব্য জীবনাশ্রয়ী, তার প্রতীকগুলোও জীবনাশ্রিত। কন্ট্রোলের 'কিউ'র কথা বলেছি। জানালায় দাঁড়িয়ে 'যুদ্ধফেরৎ কনভয়কে দেখে তার মনে জাগছে যুগ-যুগান্তরের রাজপথ বেয়ে ছুটে আসা জন-কনভয়ের চিত্র। অনেক যুগ, অনেক অরণ্য, পাহাড় সমুদ্র পেরিয়ে তারা এগিয়ে আসছে ; ঝলসানো কঠোর মুখে। সিগারেটকে সে করেছে শোষণকারীর হাতে শোষিত জনগণের প্রতীক। 'তোমাদের শোষণের টানে আমরা ছাই হই, তোমরা নিবিড় হও আমাদের উত্তাপে।' কখনো আবার প্রতীক হয়েছে সিঁড়ি। তাদের মাড়িয়ে প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যায় প্রাসাদবিলাসী উচ্চবিত্তের দল। তাদের পদধূলি জনগণের বুক পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতি দিন।—

> "তোমরাও তো জানো,
> তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত
> ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
> আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
> তোমাদের গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি।"

সব প্রতীকই যে সুনির্বাচিত হয়েছে তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। অন্তত সিগারেটের প্রতীক ভাবালুতা দোষে দুষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এদিক দিয়ে সুকান্তর 'একটি মোরগের কাহিনী' এবং 'চিল' কবিতা দুটি সার্থক হয়েছে স্বীকার করতেই হবে। 'একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে, ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায় আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিলল, উপযুক্ত আহার মিলল না। শুরু হলো আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা। কিন্তু আশ্চর্য, সেই আঁস্তাকুড়েও জুটল অংশীদার, দেখা দিল প্রতিদ্বন্দ্বী।'

"অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে—
প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবারের।
তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপধপে সাদা দামী কাপড় ঢাকা খাবাব টেবিলে ;"

প্রতীক বাদ দিলে এটি সত্যি সত্যি সমাজতন্ত্রবাদের ওকালতি করা একটি প্রবন্ধ হতে পারতো। কিন্তু প্রতীকের ব্যঞ্জনা বলেই রচনাটি কাব্যলোকে প্রবেশপত্র পেয়েছে এবং এর কাব্যত্ব নিহিত আছে অসহায় মোরগের ঐ অন্তিম পরিণামের প্রতি কবির অশ্রুক্ষরা করুণার মধ্যে। 'চিল' কবিতাটি অর্থগৌরবে আরো বলিষ্ঠ। ফুটপাথে একটা মরা চিলকে দেখে এই কবিতার জন্ম। 'গম্বুজশিখরে বাস করতো এই চিল, নিজেকে জাহির করতো সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে ; হালকা হাওয়ায় ডানা মেলে দিত আকাশের নীলে—অনেককে ছাড়িয়ে ; একক : পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে সেখান থেকে সে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে, লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ।' কিন্তু যার শ্যেন দৃষ্টিতে ছিল তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যু-প্রবৃত্তি সে আজ ফুটপাথে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। অনেকে আজ নিরাপদ ; নিরাপদ ইন্দুর ছানারা আর খাদ্য হাতে ত্রস্ত পথচারী, নিরাপদ—কারণ আজ সে মৃত। আজ আর কেউ নেই ছোঁ মারার, ওরই ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো ও পড়ে রইলো ফুটপাথে, শুকনো, শীতল, বিকৃত দেহে। গদ্যচ্ছন্দে রচিত এই কবিতাটি, গদ্যবন্ধেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কবির কথাগুলো। কিন্তু তবু এর কাব্যত্ব সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রকেই আনন্দিত করবে। এবং বলা বাহুল্য, এটাও প্রতীকাশ্রয়ী বলেই কবিতা হয়ে উঠেছে। আর এর কাব্যরসদ সংগৃহীত হয়েছে এযুগের জনস্বপ্নের মধ্য থেকে। শোষণ আর নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি-কামনাই এযুগের জনচিত্তে সবচেয়ে বলিষ্ঠ কামনা। সে কামনারই কাব্যরূপ এই কবিতাটি।

৫

কিন্তু সুকান্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বোধন'। পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন অত্যাসন্ন তখন অস্তাচলশায়ী রবীন্দ্রনাথ 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর' এই নরঘাতন নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁর শেষ শক্তি সংহত ক'রে চরম ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে, ধিক্কার হানিতে পারি যেন

বলা নিষ্প্রয়োজন, দীপ্তিকাব্যের এটি একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এর কাব্যত্ব গৌরবোক্তিতে। শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসার বিরুদ্ধে ধিক্কারবাণীর ক্ষমাহীন প্রচণ্ড শক্তির মধ্যেই এর কাব্যমহিমা। সুকান্তর কবিতাটি কিন্তু এ যুগের দীপ্তিকাব্য-প্রধান সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ দ্রুতিকাব্যের একটি দুর্লভ উদাহরণ। 'বোধন' রৌদ্ররসাত্মক কবিতা। ক্রোধই তার স্থায়ীভাব। কবিগুরু যে ধিক্কার বাণী উচ্চারণের জন্য মহাকালের বিচারকের কাছে শক্তির প্রার্থনা জানিয়েছেন, জনগণের সেই ধিক্কারই প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়েছে সুকান্তর কবিতায়। তেরশ' পঞ্চাশের পরবর্তী বাংলার পটভূমিকায় এই কবিতাটি রচিত। ক্রোধের বিভাব হল সমাজ-তথা-মানবতা-বিরোধী শাসক আর শোষকশ্রেণী—মন্বন্তরের মহাশ্মশানে উপবিষ্ট মজুতদার আর মুনাফাখোরের দল। রৌদ্ররসের ক্রোধকে পরিপুষ্ট করেছে একদিকে এদের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর বিদ্বেষ, অন্যদিকে জনগণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিশোধ কামনা, সংগ্রামস্পৃহা এবং বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ। ৯৫ পঙ্‌ক্তিতে রচিত এই কবিতাটিকে আমি এযুগের মহাকাব্য বলতে চাই। অন্তত ১৩৫০ থেকে ১৩৫৪-এর মধ্যে এমন শক্তিশালী অথচ রসোত্তীর্ণ কবিতা যে আর আমার চোখে পড়ে নি সেকথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করতে হবে। ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ পরিবর্তনের ফলেও এর মধ্যে মহাকাব্যোচিত মহিমা এসেছে। কবিতাটিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমেই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে মহামানবের বোধন কামনা ক'রে কবিতাটির নান্দী বা প্রোলোগ—

"হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।

এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি ;
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।"

শ্রুতিমান পাঠকমাত্রেই ধরতে পারবেন যে ধ্বনিপ্রধান ছন্দে এখানে এমন একটি দৃপ্ত শক্তির সৃষ্টি হয়েছে যে মনে হয়, কবি যেন শাবল-হাতুড়ি দিয়ে নৈঃশব্দ্যের পাহাড় কেটে কেটে কাব্যের ধ্বনিকে রূপায়িত করে তুলেছেন। এই বোধনমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পটভূমিকা বিন্যস্ত করার পর ছন্দবদল হয়েছে। এই সর্বনাশের জন্য দায়ী কারা ? অন্যায় যারা করেছে তারাই নয়, নীরবে যারা এই অন্যায় সহ্য ক'রে যাচ্ছে তারাও দায়ী—

"ব্যাহত জীবনযাত্রা, চুপি চুপি কান্না বও বুকে,
হে নীড়-বিহারী সঙ্গী ! আজ শুধু মনে মনে ধুঁকে,
ভেবেছ সংসারসিন্ধু কোনোমতে হয়ে যাবে পার
পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে। তবু আজো বিস্ময় আমার—
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।
তোমার ক্ষেতে শস্য
চুরি ক'রে যারা গুপ্তকক্ষেতে জমায়
তাদেরি দুপায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃসহ ক্ষমায় ;
লোভের পাপের দুর্গ গম্বুজ ও প্রাসাদে মিনারে
তুমি যে পেতেছো হাত ; আজ মাথা ঠুকে বারে বারে
অভিশাপ দাও যদি, বারংবার হবে তা নিষ্ফল—
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল
তুমি তো প্রহর গোনো,
তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি,
তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ ; শূন্য মাঠে কঙ্কাল করোটি

তোমাকে বিদ্রূপ করে, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে—
কুজ্ঝটি তোমার চোখে, তুমি ঘুরে ফেরো দুর্বিপাকে—"

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে? আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়। দু'হাতে বাজাতে হবে প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা। প্রার্থনা করতে হবে,—হে জীবন হে যুগসন্ধিকালের চেতনা, আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ সঞ্চিত দুর্দমনীয় শক্তি। এই কলঙ্কিত ইতিহাসের অবসান ঘটাতে হবে, শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে একত্রিত করতে হবে জনসংহতি। তাদের কণ্ঠে একই প্রশ্ন, একই মন্ত্র—

"শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।"

রৌদ্ররসের যোগ্য এমন অনুভাব বাংলা কাব্যে দুর্লভ। এ আমি'র মধ্যে আছে বিরাট জনচিত্তের অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন আত্মসম্বিৎ। এর মধ্যে এ যুগের সর্বস্বান্ত জনগণের পুঞ্জীভূত ক্রোধ প্রতিস্পন্দিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবিতাটির উপসংহৃতি বা এপিলোগ্‌টি যেন রৌদ্ররসকে আঘাতে-আঘাতে শতধা খণ্ডিত ক'রে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। শাসক ও শোষকের এই জনঘাতী পৈশচিকতার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ জনগণের সঙ্গে এখনো যারা যোগ দিতে পারবে না তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ধিক্কারবাণী উচ্চারণ ক'রেই কবিকণ্ঠ স্তব্ধ হয়েছে—

"তা যদি না হয়, মাথার উপরে ভয়ঙ্কর;
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর;
তা যদি না হয়, বুঝবো তুমি তো মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।

ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয় নি জল
দেয় নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেই কো ঠাঁই॥"

নিশ্চয়ই এটা ভরতবচন নয়, এ ক্রোধোদ্দীপ্ত দুর্বাশার অভিশাপ। কিন্তু এর পেছনে শুধু অশুভ-তাণ্ডবই নেই, আছে শিবপ্রতিষ্ঠার শুভৈষণা। সেজন্যেই 'বোধন' এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা এবং শ্রেষ্ঠ কাব্য। এ যুগে জনজীবনচেতনা নিয়ে কাব্যসাহিত্যে অনেক সৃষ্টি পরীক্ষাই হয়েছে, কিন্তু শত শত পরীক্ষার পরেও যদি এমনি একটি সার্থক সৃষ্টি সম্ভব হয় তবে সে পরীক্ষার মূল্য অপরিসীম।

কবিকিশোরের কাব্যসাহিত্যে আলোচনা শেষ হয়ে এসেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সবগুলো কবিতা মিলিয়ে সুকান্ত যেন একটি কবিতাই লিখতে চেয়েছিল, একটিই তার বক্তব্য, একটিই তার সুর। এবং তার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই প্রতীতিই হবে যে, তার কাছে বাস্তব আর কল্পনায়, জীবন আর কাব্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। সুকান্তর জীবনই তার কাব্য, তার কাব্যই তার জীবন। সুকান্তর অকালমৃত্যু অনুশোচনীয় এই জন্য যে, তার কাব্যপ্রেরণা ও কাব্যশক্তি দিন-দিনই উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল। তার প্রথম দিকের অনেক রচনাতেই দলীয় স্লোগান অতি স্পষ্ট ছিল, কিন্তু মনের বালকত্ব উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রকাশকে অনন্যপরতন্ত্র ক'রে তুলেছিল। সুকান্তর কাব্যের উপজীব্য রস ও ভাববৈচিত্র্যের অভাবের জন্যে দায়ী সুকান্ত নয়, দায়ী এই যুগ। যে-চার বছর মাত্র তার কবিজীবন, সেই চার বছরে এবং হয়তো অনাগত আরো অনেক বছরে, জীবনের এই একটি মাত্র সুরই সত্য। সুকান্ত এই জীবনসত্যকেই কাব্যে স্পন্দসুন্দর ক'রে বেঁধে রেখে গেছে। তার মৃত্যু যে সহসা আসবে একথা যেন সে আগে থেকেই অনুভব করতে পেরেছিল। তার নিজের জীবনের এই ট্রাজিক পরিমাণের ছবিটি সে 'সহসা' কবিতায় অঙ্কিত ক'রে গেছে—।

"আমার গোপন সূর্য হল অস্তগামী
এপারে মর্মরধ্বনি শুনি,
নিস্পন্দ শবের রাজ্য হতে
ক্লান্ত চোখে তাকালো শকুনি।

গোধুলি আকাশ বলে দিল
তোমার মরণ অতি কাছে,
তোমার বিশাল পৃথিবীতে
এখনো বসন্ত বেঁচে আছে।"

এ বিশাল পৃথিবীতে বসন্ত এখনো বেঁচে আছে। চিরকালই থাকবে কিন্তু কবিকিশোরের জীবনে বসন্ত আর কোনো দিনই এল না। অনাগত বসন্তের প্রতীক্ষায় ব'সে থাকার সময় আর সুযোগও তার হল না। নবজাতকের কাছে সে যে অঙ্গীকার করেছিল, অনাগত বসন্ত-দিনের এ বিশ্বকে নবজাত শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবার জন্যে দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে এ পৃথিবীর জঞ্জাল সরাবে, সুকান্ত আমরণ সেই প্রতিশ্রুতিই পালন ক'রে গেছে। 'জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে' নিয়েই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল। তার দেহের রক্ত দিয়েই সে নতুন শিশুকে আশীর্বাদ ক'রে গেল। কিন্তু সে আশীর্বাদ কি ব্যর্থ হবে ?

কেন সুকান্ত ॥ তরুণ সান্যাল

রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কবিতার বই বিক্রির পর, সংখ্যার দিক দিয়ে সুকান্তর 'ছাড়পত্র'র বিক্রি বোধ হয় এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী। ১৯৪৭ সালে অকালমৃত এই তরুণ কবি যেন এখনো বাংলাদেশের তারুণ্যের, বিবেকের, সংগ্রামের কাছাকাছি সবচেয়ে বড়ো প্রতিনিধি। যে কৈশোর-উত্তীর্ণ, সদ্য যৌবনে পা-দেওয়া বাঙালী ছাত্র সুকান্তর কবিতা পড়েন নি, বা পড়েও আপ্লুত হন না, আমি তাকে কোনো আলোচনায় ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চাই না। তার তারুণ্য জাগে নি বলেই ধরে নেব।

বিভিন্ন কবির পাঠককে আবিষ্ট রাখার বিভিন্ন মুহূর্ত আছে। কোনো জাতি তার সবচেয়ে সঙ্কট মুহূর্তে যে কবির পঙ্‌ক্তিতে মনের কথা খুঁজে পায়, আমরা বলি সেই কবি জাতীয় কবি হয়ে উঠেছেন। এই তো সেদিন খবর পেলাম, পুব বাঙলার 'লাল আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে, কি হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায়,' কিংবা 'এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম, অবাক পৃথিবী, সেলাম তোমাকে সেলাম' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি দিয়ে পথের মোড়ে পোস্টার জ্বলছে,

সংবাদপত্রের শিরোনামায় ঝলসে উঠেছে—'বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি' ধরনের পঙ্‌ক্তি। এ-দেশে 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি', বক্তার আবেগস্পন্দিত ধ্বনিতরঙ্গের তুঙ্গশীর্ষে। আর স্মৃতিতর্পণ যদি জাতির কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতির কোনো নিদর্শন হয়, তাহলেও প্রমাণিত হবে, রবীন্দ্রনাথ নজরুলের পাশাপাশি একেবারে গ্রাম্য গ্রন্থাগার থেকে শিল্প টাউন-শিপের ঝকঝকে হলঘরে সুকান্তর নামে অনুষ্ঠান হচ্ছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হাতে আঁকা ছবির প্রদর্শনীর মধ্যে আমি বহুবার দেখেছি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জগদীশচন্দ্র বসু, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির রেখাচিত্রের পাশে সুকান্তর একটি ছবি। এমন কি বোকারো থার্মল প্লান্টের কর্মীদের এক অনুষ্ঠানে শুনেছি সুকান্তর জীবনী নিয়ে গীতি-আলেখ্য। আমাকে কেউ প্রশ্ন করলে সুকান্ত কত বড় কবি ছিলেন, তা আমি বুড়োধাড়িদের মতো অধ্যাপকসুলভ অ্যাকাডেমিক কায়দায় জবাব দিতে পারব না, কিন্তু একটা কথা আমি ঠিকই বলতে পারব, সুকান্তকে বাঙালি জাতি জাতীয় কবির মর্যাদার আসন অনেকখানিই দিয়েছেন। কথাটা বড়ো বেশি ভারি শোনালো। তা হোক। আর সেই মর্যাদা দানের মধ্য দিয়েই সুকান্তের সত্যিকারের মূল্যায়ন হয়েছে।

কিন্তু কেন এমনটি হয়? জনৈক খ্যাতনামা কবি তো নাকি বলেছিলেন 'রাজনীতি করতে গিয়ে সুকান্ত কবি হতে পারলেন না।' কবি হওয়া কাকে বলে? একধরনের ইংরেজিনবীশ বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করা, পুঁথিসর্বস্ব ও জাতীয় বেদনার প্রতি নিস্পৃহ 'কবি'দের পঙ্‌ক্তি রচনাকেই কি কবি হওয়া বলে? নারীমাংস, অর্থ, সুরা ও বহুবিধ আরামের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করবার মানসবিহারকে কি কবিতা রচনার আদর্শ মনে করব? যদি তা না করি, তবে ভেবে দেখতে হবে, সুকান্তর মধ্যে কোন সত্য বিম্বিত হয়েছিল। আর সেটা ধরতে চেষ্টা করাই, আমার এই ছোট প্রবন্ধের লক্ষ্য হবে।

কবি জনমানসে গ্রাহ্য হন কখন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, সেই একই উত্তরের মধ্যে—যে কারণে কোনো মানুষ ঐতিহাসিক পুরুষ হয়ে ওঠেন। যুগের, শ্রেণীর, অন্তর্নিহিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—যুগসত্যের সারাৎসার যে ব্যক্তি ধরতে পারেন, সেই সত্য অনুধাবন করে যথার্থ সাধারণীকৃত তত্ত্ব যিনি গড়ে নিতে পারেন, এবং সেই তত্ত্বকে কেবল জ্ঞান ও ধারণার মধ্যে ব্যাখ্যা নয়, যিনি তা জীবনে ও আচারণের সার্থক প্রয়োগ করতে পারেন, তিনিই ইতিহাস-পুরুষ হয়ে ওঠেন। কবিও ঠিক তেমনি। কেউ বা মানবিক ছোট্ট কোনো অনুভবের

জগৎটাই কবিতায় চিত্রিত করেন। তিনি অনেক ছোট কবি। কেউ বা যুগের সারসত্যকে অনুভব করে, অভিজ্ঞতার তাৎপর্যে সত্যজ্ঞান পেয়ে, কবিতায় সেই সত্যকে প্রকাশ করেন। তিনি অনেক বড় কবি। সুকান্তর মধ্যে তাই বড় কবি, খুব বড় কবি হবার তাবৎ উপকরণ ছিল। কিন্তু সুকান্তর নামে বাঙালি জাতি চিহ্নিত হবার আগেই সুকান্তর অকালমৃত্যু হল। এটা বাংলা কবিতার জগতের লোকসান নয়। এ হল তাবৎ জাতিরই অপূরণীয় ক্ষতি।

সুকান্ত আসলে কোন সত্য বুঝেছিলেন? কি লিখেছিলেন কবি? অন্যান্য জ্যেষ্ঠ কবিদের থেকে কোথায় তাঁর অমিল ছিল?

সুকান্ত যখন কবিতা লিখেছিলেন, সে-যুগটা হল সাম্রাজ্যবাদ পতনের যুগ, সমাজতন্ত্র অভ্যুদয়ের কাল। সাম্রাজ্যবাদের জঘন্যতম রূপ ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদ তখন দুনিয়া গ্রাস করতে চাইছিল। কিন্তু যারা সত্যিকারের যুগের সারাৎসার বুঝেছিলেন তাঁরা জানতেন বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী ও প্রগতিশীল মানুষের প্রত্যাঘাতে সে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চূর্ণ হতে বাধ্য। সুকান্ত জেনেছিলেন, স্বদেশের দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার, মৃত্যু এবং ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব আক্রমণ একই সূত্রে গ্রথিত। আর তাঁর কাছে সংস্কৃতির অভিব্যক্তিটাও ছিল ভিন্ন ধরনের।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে যে জমিদারী, জোতদারী, মহাজনী, আড়তদারী ব্যবস্থার পত্তন ঘটিয়েছিল, তারই প্রকাশ যুদ্ধের সঙ্কটের যুগে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ। চাষীর হাতে জমি আনতে হবে। জমিদারী-জোতদারী-মহাজনী-আড়তদারী প্রথার অবসান চাই। এ অবসানকে বলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব। দেশে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যুগের দৌলতে ফুলে ফেঁপে উঠল। তাদের স্বার্থের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের যোগাযোগ ছিল। শ্রমিকের উপরে শোষণ চূর্ণ করা ছিল অসম্ভব, যদি না সাম্রাজ্যবাদকে দেশছাড়া করা যায়। এজন্য সুকান্ত ছিলেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ভারতের সংগ্রামে অগ্রণী যোদ্ধা। বিদেশী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে বলে জাতীয় বিপ্লব। সামন্তপ্রথার অবসানের বিপ্লবকে বলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব। সুকান্ত কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। তিনি জানতেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের এই দ্বৈরথের যুগে, শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই এ-যুগের সার সত্য। তাই তিনি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যশ্রেণীর মৈত্রীকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। লেনিনের মধ্যে দেখেছিলেন, ভারতের বিপ্লব-আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার দিক। গান্ধীজীর উপরে কবিতা লিখে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, ভারতে ব্যাপক

গণ-আন্দোলনই জাতির মুক্তির একমাত্র পথ। জাতীয় বেদনার তীব্র অনুভব তাঁর সেই পঙ্‌ক্তিদ্বয় 'এদেশে জন্মে পদাঘাতেই শুধু পেলাম, অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম'-এ প্রতিফলিত আছে। আর পথ হিসাবে 'নগ্ন ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট, রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট' তাঁর অন্বিষ্ট হয়েছিল।

অন্য কবিদের থেকে তাঁর একটা বড় রকমের তফাত ছিল। সেটা কোনখানে? আমাদের দেশের 'আধুনিক কবিতার' জন্মটাই এক ধরনের কলোনিয়াল মানসের কম্প্রেদার অভিব্যক্তির মধ্যে জারিত হয়েছিল। এ-দেশের ব্যাপক সংখ্যার মানুষের জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য লড়াই 'আধুনিক কবিদের' মধ্যে জেষ্ঠদের অনেককে স্পর্শই করে নি। মেকলে প্রবর্তিত কালোনিয়াল শিক্ষাধারায় শিক্ষিত এই কবিদের কাছে কবিতায় ইংরেজিয়ানা লক্ষ্য ছিল। একদা অ্যাংলো-স্যাক্সন বুর্জোয়াদের সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই যে-রোমান্টিকতার জন্ম দিয়েছিল, তার ভাবাদর্শে উনিশ শতকের পশ্চিম ইউরোপীয় কবিতায় প্রগতিশীলতা ছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর তরুণ জীবনে সেই প্রগতিশীল ব্যক্তিমানুষের মুক্তিভিত্তিক রোমান্টিকতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ জীবনচর্চার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। 'সভ্যতার সঙ্কট'-এর মধ্যে দেখেছি তাঁর সেই আত্মস্বীকৃতি। কিন্তু পশ্চিমী পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী রূপ নিল, ব্যক্তিমানুষ মনোপলি-কর্পোরেশনের দাপটে 'ক্ষুদে মানুষ' হয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, তার একধরনের প্রকাশ, ফাঁপা মানুষ'-এর দর্শনে। অন্যদিকে আরেক আধুনিকতাও ছিল। তা হল সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত তরুণ অধ্যাপকের দল পশ্চিমী চূর্ণ মনুষ্যত্বের আধুনিকতাই কাব্যে প্রতিভাত করলেন। অথচ আমাদের দেশে শর্ত ছিল একেবারে ভিন্ন। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শ ও কাব্য-আঙ্গিক এবং কখনো-সখনো নৈরাজ্যবাদ এঁদের কবিতায় পরিস্ফুট হচ্ছিল। অবশ্য দেশটা ভিন্ন ছিল বলে, কখনো আবার গণতান্ত্রিক চিন্তার ছিটেফোঁটা-তাতে থাকতোও।

কিন্তু সুকান্তর ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা ছিল।

প্রতিটি জাতির মধ্যেই থাকে দুটি জাতি। দুটি সংস্কৃতি। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি এবং সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছিল। পুঁজিবাদী বিশ্ববীক্ষা এবং সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডূকতা দুইই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের এদেশে চালু রাখবার ইচ্ছা ছিল। তৎপরতাও কম ছিল না। সুকান্ত কিন্তু একেবারে উল্টো

জগতে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির শরিক ছিলেন। তাঁর আন্ত-র্জাতিকতা ছিল সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির এক বিশেষ দিক। তাঁর আধুনিকতা 'সমাজতান্ত্রিক-আধুনিকতা'। আর এখনও ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিপ্লব অসমাপ্ত থেকে গেছে বলে, রবীন্দ্রনাথ নজরুলের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত সুকান্তর নাম। রবীন্দ্রনাথ যদি ভারতীয় জাতিসত্তার উদ্বোধনের স্মারক হন, নজরুল গণতান্ত্রিক ও জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর উপরেই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সৌধ রচনা ক'রে থাকেন, তাহলে বলতে হয়, সেই কূলপ্লাবী ধারায় সুকান্ত সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমুদ্রসন্ধানী রূপ। রবীন্দ্রনাথ নজরুল-সুকান্ত একই অবিভাজ্য ধারায় ক্রমপরম্পরা।

আসলে আমাদের যুগের সারাৎসার ধরেছিলেন সুকান্ত। আমাদের কালে এখনো অনেকেই তা ধরতে পারেন নি। সুকান্ত সেই সারাৎসার ধরতে পেরে লেনিনীয় পন্থায় কমিটেড হয়েছিলেন। এবং সংগঠনের কথা ভাবতেন। আজকের যুগে সুকান্তর কবিতা একটিই নির্দেশ দেয়, একযোগে কাজ করবার জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য প্রগতিশীল শ্রেণীদের প্রতিনিধিদের। কেননা, প্রতিক্রিয়া-শীলরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চূর্ণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে ভারতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জাতীয় বিপ্লব এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় এখনো অর্জিত হয় নি বলে সুকান্তর আর্তি আমাদের জাতীয় আর্তির কাব্যিক প্রতিফলনরূপে এখনো সত্যজাগ্রত। সেখানেই সুকান্তর জয়। জাতির চেতনা, সংগ্রাম, আনন্দ-বেদনার প্রকাশ আমরা তাঁর কবিতায় খুঁজে পাই। সুকান্তর জনপ্রিয়তা তাই বাড়ে। সুকান্ত মরেও মৃত্যুঞ্জয় হলেন। সুকান্ত মৃত্যুহীন। আমাদের দেশের যৌবনই সুকান্ত।

জনমানসের কবি সুকান্ত ॥ সুধাংশু গুপ্ত

কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় 'সাহিত্য মন্দির' নামে এক-দরজার বইয়ের দোকানে কবি সুকান্তের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল। দোকানটি ছিল তার বড়দার। এখনও আছে তবে তার নাম বদলে হয়েছে 'বুক্স ওনলি'। ওর বড়দা মনো-মোহন ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সুকান্ত সুমধুর হাসি হেসে বলল : দাদা, লেখার নেশা আমার ছেলেবেলা থেকে। ইদানীং কবিতা লেখার নেশা আমাকে পাগল করে তুলেছে। কিন্তু কাগজ কেনার পয়সাও নেই আমার। বাবা যজমানি করেন এবং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে (অধুনা বিধান সরণী) সারস্বত লাইব্রেরী বইয়ের দোকানে ধর্মগ্রন্থাদি বিক্রয় করে থাকেন, এখন কী করি বলুন তো।

বলে দাদর কাছ থেকে একটি সাদা কাগজ নিয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে আমাকে উপহার দিল। অনেক খুঁজেও সে কবিতাটি পেলাম না। পেলে তা' পাঠক-গণের কাছে তুলে ধরতাম।

কবি সুকান্ত বাংলা সাহিত্য জগতে একটি অবিস্মরণীয় নাম। স্বল্প জীবনের মধ্যে সে অনেক কবিতা লিখে গেছে। সেগুলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তা ছাড়া কিশোর বয়সে ছন্দের আশ্চর্য দখল, শব্দের এমন সুষ্ঠু প্রয়োগ খুব কমই দেখা যায়।

সুকান্তের রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে হৃদ্যসম্পর্ক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষ করে একটি সুন্দর কবিতা লিখলেন কবি—

"এবারে নতুন রূপে দেখা দিক
রবীন্দ্র ঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে কণ্ঠে
গণসংগীতের সুর ;
জনতার পাশে পাশে
উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে,
গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে
যদিও সে অনাগত, তবু যেন
শুনি তার ডাক
আমাদেরই মাঝে তাকে
জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ।"

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে অনেক সুখ্যাত কবি তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কিন্তু সুকান্তের প্রশস্তির সুর সম্পূর্ণ আলাদা। বিপ্লবের স্বপ্ন, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর, জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা পাঠকগণের কাছে নতুন আবেদন রেখেছে। গীতিগুচ্ছের একটি গানে তরুণ কবির কলম থেকে উৎসারিত হয়েছিল—

"ও গো কবি তুমি আপন ভোলা,
আনিলে তুমি নিথর জলে ঢেউয়ের দোলা
মালাখানি নিয়ে মোর
এ কি বাঁধিলে অলখ ডোর।
নিবেদিত প্রাণে গোপনে তোমার
কি সুর তোলা!"

এবার 'আপন ভোলা' আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন বিশ্বকবি। তিনি এনেছেন নিস্পন্দজনের বুকে ঢেউয়ের দোলা টেনে নিয়ে অলখ ডোরে বেঁধেছেন। উৎসীকৃত প্রাণে গোপনে সুর বেঁধেছেন।

অধ্যাপক, সমালোচক কবি জগদীশ ভট্টাচার্য সুকান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন: যে কবির বাণী শোনবার জন্য কবিগুরু কান পেতে ছিলেন সুকান্ত সেই কবি···

মজুর ও কৃষাণদের যে ছিল আপনার জন—বন্ধু ও সুহৃদ। তাদের মাটির রস গন্ধ যেন সে একাত্ম করে নিয়েছিল তার দেহ-মনে।

'ফসলের ডাক' শীর্ষক কবিতায় তাই তো লিখল:

"দু'চোখে আমার আজ বিচ্ছুরিত মাঠের আগুন
নিঃশব্দে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে তরঙ্গিত প্রাণের জোয়ার
মৌশুমী হাওয়ায় আসে জীবনের ডাক;
শহরের চুল্লী ঘিরে পতঙ্গের কানে।"

কবির দু' চোখে মাঠের আগুন ছড়ানো। শব্দহীন দিগন্তজোড়া মাঠে প্রাণের বিপুল জোয়ার···মৌশুমী বাতাসে জীবনের আহ্বান আর শহরের ধুঁয়োর চুল্লী শুধু পতঙ্গকে ঘিরে ধূমায়মান।

চাষীদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল কবি।

'কৃষকের গান' কবিতায় তাদের মুখের ভাষা নিজে কেড়ে নিয়ে লিপিবদ্ধ করলেন সুসংহত কবিতায়:

"এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে
এইবার ফলাব ফসল—
আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে
আজ তার নির্জন বোধন

অজন্মা মাটির বক্ষদেশ ভেদ করে কৃষি এবার সোনার ফসল ফলাবে। তার শক্ত বাহু-যুগলের আজ তাই নীরব বোধন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখে যে সব নির্ভীক বীর আত্ম-নিবেদন করেছিলেন, বিপদের ঝুঁকি মাথায় করে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—সেই সব সংগ্রামী মানুষেরা যখন বিজয়ী বীরের মতো ঘরে ফিরে এসেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ করে কবি সুকান্ত লিখেছিল, 'মুক্ত বীরদের প্রতি' কবিতায় :

"তোমরা এসেছ, ভেঙেছ অন্ধকার—
তোমরা এসেছ, ভয় করিনাকো আর।
পায়ের স্পর্শে মেঘ কেটে যাবে উজ্জ্বল রোদ্দুর।
ছড়িয়ে পড়বে বহু দূর—বহুদূর।"

সুকান্তর যে অমৃতধারা কবিতাটি তাকে পাঠকসমাজে বিপুলভাবে আদৃত ও পরমপ্রিয় করে তুলেছে, সেটির নাম 'রানার'। এটি মূল গায়ক হেমন্তকুমারের কণ্ঠে রেকর্ডে ধনী দরিদ্র, কুলী মজুর সর্বশ্রেণীর লোকের কাছে এক অশ্রুতপূর্ব আনন্দের 'পসরা এনে দিয়েছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন-জঙ্গলে হিংস্র প্রাণীর ভয় ইত্যাদি উপেক্ষা করে রানার তার খবরের বোঝা মাথায় করে চলেছে—ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজিয়ে, তার অবিস্মরণীয় কয়েকটি লাইন :

"রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয়, কখন সূর্য ওঠে
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে কত দুঃখ ও শোকে।"

কলমের উদ্দেশ করে যে-কবিতাটি নবীন কবি রচনা করেছিল—
তাও নতুনত্বের দাবি রাখে। সেই যে বিপ্লবের সুর তা প্রতি হৃদয়ে বেদনার বীণা বাজিয়ে দেয়—

"মজুর দেখ নি তুমি? হে কলম, দেখ নি বেকার?
বিদ্রোহ দেখ নি তুমি? রক্তে কিছু পাও নি শেখার?"

কবি সুকান্তর গদ্য রচনার হাতও ছিল নিপুণ—সরস। সে ছোটদের জন্য অনেক সুন্দর কবিতা, গল্প, রূপকথা, নাটক, হাসির কবিতা লিখেছিল। তার মৃত্যুর পর কবির ভ্রাতাদের এবং বন্ধুবান্ধবদের উদ্যোগে 'হরতাল' নামক একটি ছোট

গল্পের সংকলনের বই বেরিয়েছিল। সে-বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন যশস্বী শিশু সাহিত্যিক শিশু-ভারতী সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
যোগেন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন ছিল সুকান্ত। 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় যে 'কিশোর সভা' পাতাটি সে সম্পাদনা করতো, তাতে তিনি আশীর্বাণীও লিখে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া কিশোর বাহিনী সংগঠনের এক সভায় সভাপতিত্বও করেছিলেন।
'হরতাল' বই পাঁচটি বিভিন্ন স্বাদের গল্পের সমষ্টি। 'রাখাল ছেলে' গল্প থেকে খানিকটা তুলে দেওয়া হল। তা থেকে তার কিশোর সাহিত্যের কবিতাধর্মী ভাষার একটা আভাস পাওয়া যাবে।

'সূর্য যখন লাল টুকটুকে হয়ে দেখা দেয় ভোরবেলায় রাখাল ছেলে তখন গরু নিয়ে যায় মাঠে। গরুগুলি সেখানেই চরে বেড়ায়। আর সে থাকে গাছের তলায় বাঁশীটি হাতে নিয়ে, চুপ করে চেয়ে থাকে নদীর দিকে, আপন মনে ঢেউ গুণতে গুণতে কখন যেন বাঁশীটি তুলে নিয়ে তাতে ফুঁ দেয়। আর সেই শুনে নদীর ঢেউ নাচতে থাকে, গাছের পাতা দুলতে থাকে আর পাখিরা কিচির-মিচির করে তাদের আনন্দ জানায়।'
গুপ্তমহাশয় অন্যান্য গল্পের সম্বন্ধে মন্তব্য রাখার পর—ওই গল্পটির কথায় লিখেছিলেন—আর রাখল ছেলে? সে একটি স্নেহ সঞ্চারিণী পেলব কোমল কবিতা।
সম্প্রতি প্রকাশিত 'সুকান্ত সমগ্র' বইটি সাহিত্যের অঙ্গনে একটি নতুন পদক্ষেপ। তাতে পত্রগুচ্ছ নামে একটি পরিচ্ছেদ-এ তার কয়েকখানা পত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। স্কুলের বন্ধু কবি অরুণাচল বসুর মাকে একখানা চিঠিতে সে লিখেছিল:
"বাস্তবিক, আমি কোথাও চলে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে মিলিয়ে যেতে চাই··· কোন গহন অরণ্যে কিংবা যে কোন নিভৃততম প্রদেশে, যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল সূর্যের আলোর মতো···হিংস্র আর নিরীহ জীবেরা আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পর্ক।"
সুকান্ত মাত্র একুশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছিল। 'আমার মৃত্যুর পর' কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে তার বেদনাহত জীবনের মর্মবাণী।

"আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন,
বুকের স্পন্দনটুকু মূর্ত হবে ঝিল্লীর ঝংকারে
জীবনের পথ প্রান্তে ভুলে যাবে মৃত্যুর শঙ্কারে,
উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার অঞ্জন।"

দুর্বার প্রাণের আবেগে উদ্দীপ্ত প্রতিভাবান্ তরুণ কবি সুকান্ত হয়তো, বেঁচে থাকলে বাংলা সাহিত্য নব-নব সৃষ্টির গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো।

কবি সুকান্তর আবহ ॥ পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব সবে শুরু হয়েছে। ময়মনসিংহ শহরে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ গড়েছি। সম্পাদক আমি প্রবর্তক বিদ্যাপীঠের এবং সভাপতি জাহ্নবী চক্রবর্তী মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের শিক্ষক। ঢাকার সঙ্ঘ অনেক বেশী শক্তিশালী, তাঁরা 'প্রতিরোধ' পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। বাংলার পূর্বদিকে জেলাগুলিকে নিয়ে একটা ফ্যাসি-বিরোধী আঞ্চলিক সম্মেলনের কথাও ভাবছেন। ওদের কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আমার তদানীন্তন বান্ধব।

কলকাতার সঙ্ঘ স্বনামেই ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ হয়েছে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুসের সম্পাদনায় 'একসূত্রে' নামে এক ফ্যাসি-বিরোধী কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেছে। ময়মনসিংহে থাকতেই এই সংকলন হাতে পেলাম। তাতে আমাদের কবিতার সঙ্গে সুকান্তর কবিতাও ছিল। তাতে বাক্যকে কাব্য করার জাদু লক্ষ্য করেছিলাম। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে ওর বয়স লেখা থাকলে বিস্মৃত হতাম।

পূর্বদিকের জেলাগুলির আঞ্চলিক সম্মেলনে আমি থাকতে পারি নি, তার আগেই কলকাতায় চলে এসেছি। থাকি ১৬৩ বৈঠকখানা রোডের মেসে। একবেলা চাকুরি করি কংগ্রেস পন্থী দৈনিক 'প্রত্যহ'তে, আর একবেলা মুসলীম লীগ পন্থী দৈনিক 'আজাদ'-এ, ছুটির দিন খাতিরে বেগার দিই কমিউনিস্ট পত্রিকায়। অর্থাৎ আমার তদানীন্তন সাংবাদিক জীবনে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট একই সঙ্গে ছিল। কমিউনিস্ট মিছিলেও তখন লাল ঝাণ্ডার দুপাশে আড়াআড়ি ক'রে কংগ্রেস ও লীগের নিশান রাখা হত। আমার জীবিকার ক্ষেত্রেও এমনি কাণ্ড ঘটেছিল।

পূর্বের জেলাগুলির আঞ্চলিক সম্মেলন হয়ে যাবার পর পশ্চিমের জেলাগুলির আঞ্চলিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে বহরমপুর-কাশিমবাজারে। উদ্যোগী বন্ধুরা জানালেন সুকান্ত আমার মেসে যথা সময়ে আসবে এবং আমার সঙ্গেই সম্মেলনে

যাবে। সুকান্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় সেইদিনই হল। দেখলাম, বয়স কম। বুঝলম, পরিবেশ ওর মনের বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের বয়সের দূরত্ব অবশ্য খুব বেশি নয়। মাত্র ওর বছর ছয়েক আগে আমি কিংবা 'একসূত্র'-এর সম্পাদকদ্বয় এই পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছি; তবু আঠার বছরের সঙ্গে তিরিশের সেই দূরত্বটা যেন চোখেই পড়তে চায় না। প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিলাম, সুকান্ত তার মন-প্রাণ লেনিন ও টিটোকে দিয়েছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকেও মনের গভীরে ধরে রেখেছে। তখন আমাদের ধ্যান-ধারণায় এমনি বিচিত্র সহাবস্থান হত। হয়তো এইটিই স্বাভাবিক। কত বিচিত্র উত্তরাধিকার উত্তরসূরীর চেতনায় ক্রমাগত সমন্বিত হচ্ছে।

বহরমপুরের পথে বহরমপুরের কবি যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কথা উঠেছিল। আলোচনাটা বিতর্ক নয়, বিতণ্ডার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সুকান্ত কথা বলছিল না; কিন্তু যতীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহিতার সমর্থনে মাঝে-মাঝে যতীন্দ্রনাথের উপযোগী উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি শুনিয়ে দিচ্ছিল; মনে হয় অগ্রজ কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ওর বেশ পক্ষপাত ছিল এবং তার অনেক পঙ্‌ক্তি মনেও ধরে রেখেছিল। অবশ্য, যতীন্দ্রনাথকে নিবেদিত সুকান্তর কোনো কবিতা আমার চোখে পড়ে নি।

ধর্মতলা স্ট্রীটে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের টেবিলে পত্র-পত্রিকা পড়তাম সবাই। তখন কবিদের ঝোঁক বাক্যের ওপর, বাক্যকে কাব্য করার সাধনা অবহেলিত। সুকান্ত খোলা পত্রিকা চোখের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলত,—এটাও কবিতা? ছন্দ ছাড়া আবার কবিতা হয়? সুকান্ত জানত আমার কথা—গদ্য কবিতাতেও আমি ছন্দকে আবশ্যিক মনে করি।

কিন্তু সুকান্ত যখন 'আকাল' কাব্য-সংকলন সম্পাদনা করতে এগোল তখন ওর সংগ্রহ দেখে বলেছিলাম এটা আকালের কবিতার বই হবে না; যা হবে, তার কবিতার আকাল। আমি ওর সঙ্গে সহযোগিতা করি নি। অবশ্য এই সম্পাদনায় সুকান্তর খুব বেশি স্বাধীনতা ছিল না।

শুধু সুকান্ত কেন, আমরা সবাই তখন অন্য গরজে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উত্তর-শারদীয় অধিবেশনে শারদীয়া সংখ্যাগুলির সমালোচনা করার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। সেই আসরে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের সামনে তার 'এক ঝাঁক পায়রা' কবিতাকে আমি যে ভাষায় আক্রমণ করেছিলাম তা মনে করতেও আমার লজ্জা হয় এখন। সেদিন তার কাছ থেকে আমি কি প্রকারান্তরে স্লোগানের ছড়াই দাবি করছিলাম না?

আবার 'পরিচয়' পত্রিকার চেহারা দেখে নিজেরাই আঁতকে উঠতাম,—সংবিৎ ফিরে পেতাম। ফ্যাসি-শক্তির পতন ও বিশ্বযুদ্ধের অবসান, ভারতে নৌবিদ্রোহোত্তর গণ-অভ্যুত্থান এবং ভারতকে স্বাধীনতা দেবার উদ্যোগ আয়োজন শুরু হবার পর আমাদের চিন্তাতেও পালা বদল শুরু হল। ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রয়োজন অনেকের কাছে ফুরিয়ে গেছে মনে হল। ১৬৩ বৈঠকখানা রোডের মেসে আমরা তখন 'সৃজনী' সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন করেছি,—প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিনয় ঘোষ। 'সৃজন' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনার সংকল্পও নিয়েছিলাম। সুকান্তর সঙ্গে যোগাযোগ হয় নি, সে তখন অসুস্থ।

মায়ের অসুস্থতার জন্য আমাকেও ময়মনসিংহে যেতে হল; আবার কলকাতায় সেই মেসেই ফিরে এলাম। কিন্তু তখন শুধু স্বাধীনতাই নয়, দেশবিভাগও হয়ে গেছে এবং সুকান্ত আর ইহলোকে নেই। মেনে নিতে পারছিলাম না দেশবিভাগ, কিন্তু একথাও মানতে পারছিলাম না— 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'। ঢাকুরিয়ার কবি বন্ধু নির্মল সেন তখন কলেজ স্ট্রীটে চলচ্চিত্রের অফিস করেছে। সেখানেই দেখা হত সুকান্তর দুই বন্ধু অরুণাচল বসু আর রবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সুকান্তর শেষদিনগুলির খবর ওদের কাছেই শুনেছি।

সুকান্তর সাহিত্যিক জীবনের আবহ যেটুকু আমি জানি, সংক্ষেপে তা-ই ছুঁয়ে গেলাম।

সুকান্তকে নিয়ে কিছু দূর ।। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

অন্নময় কোষের উপর নির্ভর করে যে দর্শন তার শ্রেষ্ঠতম চর্চা ও পরিস্ফুটন হয়েছে মার্কসবাদে। বাংলা কাব্যের জগতে সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনা সমগ্রতে সেই দর্শনেরই একান্ত অনুসরণ অক্ষরে অক্ষরে। তাই তাঁর জীবনের তারুণ্যের স্পর্শধন্য কাব্য সৃষ্টিতে অনির্বচনীয় এক নূতন ধারার পরীক্ষা, নিরীক্ষা এবং সমীক্ষাও। তিনি অকাতরে অবক্ষয়ী সমাজ, রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদী তথা ধনতন্ত্রী অর্থনীতির বিরুদ্ধে আপন বক্তব্যকে অত্যন্ত সু-সংহত মনোজ্ঞ ভাব, ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ ক'রে গেছেন। তাঁর

আগে বাংলা-সাহিত্যে তাঁর কোনো পূর্বসূরীই অমন কালজয়ী কৃতিত্ব মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার দ্বারা রচিত কাব্যসৃষ্টিতে স্থায়ী ক'রে রেখে যেতে পারেন নি। এদিক থেকে সুকান্ত এককভাবে অবিস্মরণীয় ও প্রথম।

জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ নজরুল সাম্যের গান সুকান্তর আগেই গেয়েছিলেন ঠিকই এবং অত্যন্ত আবেগপ্রধান সুরের মেজাজ সেখানে উপস্থিত কিন্তু সুকান্ত যেমনটি ক'রে নূতন কৌশলে উপমা, রস, ছন্দ, ভাব ও ভাষায় তাঁর কবিতার সাম্যবাদী কাব্যচিন্তায় সতেজধর্মী জীবন-ব্যাখ্যার দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন তেমনটি ক'রে গাঙ্গেয় উপত্যকায় তার আগে হয় নি। সব থেকে বড় কথা এই যে, সুস্পষ্টভাবে 'কমিউনিস্ট-কবি' হওয়া সত্ত্বেও আদর্শ বা দলের রাজনীতির প্রভাবে তিনি তাঁর কাব্যসৃষ্টির কাব্য-সত্তাকে আহত ক'রে সর্বত্র প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেন নি (সাধারণত তথাকথিত সাধারণ কমিউনিস্ট কবিরা যা হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ কানে আসে)। সেইজন্যও তিনি অভিনন্দনীয়, কেননা রাজনীতির দল-প্রভাবের তীব্রতা ও দলের প্রচারধর্মী লাভের 'প্রলোভনকে অগ্রাহ্য' ক'রে সেই দলেরই কবি হয়ে কবি-সত্তাকে এমন নিখুঁতভাবে কবির স্তরে রেখে দেওয়াতেই তিনি পরিণত হলেন জাত কবিতে। তাই আজ তিনি প্রথমে কবি, পরে কমিউনিস্ট, অমন তরুণ বয়সে কমিউনিস্ট দুনিয়াতেও ঐরকম অমর প্রতিভার পরিচয় ক'জনই বা দিতে পেরেছেন?

মার্ক্সবাদের মতো কঠিন বাস্তবধর্মী অর্থনৈতিক নীতিকথার মধ্য থেকে মালমসলা আহরণ ক'রে যে মার্ক্সবাদী জীবন-দর্শন তার ভূমণ্ডলে যদিও অন্নময় কোষের স্তুতিগাথাই আপাতদৃষ্টিতে প্রধান ও প্রথম, তবুও তার মধ্যে থেকে একটি অন্যলোকীয় স্বপ্নকে জাল বুনে বুনে নিয়ে আসা কম কথা নয়। এবং সেই 'কম কথা নয়'-টিকে মূল্যবান বাহাদুরীর কথায় পরিণত ক'রে তিনিই প্রথম প্রমাণ করে দিলেন যে, বাংলা ভাষাতেও মার্ক্সবাদী দর্শনের অনুসারীরা খাঁটি কাব্যের জন্মদান করতে পারেন, যদি জন্ম দেওয়ার মতো কবি-পৌরুষ সেই কবির বিবেকে ও বুদ্ধির পরিমণ্ডলে থাকে, তাঁর তা ছিল। তাই তিনি গাইতে পারলেন—

> "জড় নই, মৃত নই অন্ধকারের খনিজ
> আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
> মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
> মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।"

যদি বায়োলোজিকে মানতে হয় তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, monocellular germ-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গতিপথ বেয়ে এই যে জীবন তার পদার্থিক সত্তার পরিতৃপ্ত পরিণতির জন্য স্বপ্ন ঘিরে থাকার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এমন কি থিওলজির মূল বক্তব্যতেও স্বপ্নরই সাধনা। বাস্তবের কঠোর আঘাতে মানুষ সর্বদাই সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় আর বুকের ভিতর লালন করে নূতন স্বপ্নের শাবক—সেই ক্ষত-বিক্ষত পরিস্থিতি থেকে ত্রাণ পেয়ে মহত্তর ও নূতনতর সুখময় ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন জীবন-যাপনের জন্য। তাই আসে ক্রমবিকাশ এবং তারই চলমান রথখানিকে গতি দিতে ক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া (Theris-এর সঙ্গে antitheris) এবং তারই ঢেউয়ে এগোন। মার্ক্‌স সেই এগোনোটার ফলশ্রুতিকে Synthesis বলতে চান নি। কিন্তু প্রাপ্ত ফলটা নামান্তরে সত্যিই তো Synthesis একথা বলেন মার্ক্‌সের প্রতিপক্ষ। যাই হোক, একথা সত্যি যে গতির পথে বাধাকে উতরে এগোনোই প্রগতি অর্থাৎ ক্রমবিকাশ। এবং তার মূলে হল অগ্রগতির স্বপ্ন।

তাই কবি সুকান্ত গাইলেন,—"স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।"

সেই স্বপ্নটাই হল আসল। স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার technich-গুলো হল দ্বিতীয় পর্যায়ের চিন্তা। (যথা :—রক্তপাতহীন বিপ্লব অথবা···)

তাই তাঁর জীবিতকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির (তাঁর পার্টির) "জনযুদ্ধের" আহ্বান যদিও ভারতের স্বার্থে হয় নি বরং রাশিয়ার সঙ্গে বৃটিশের তৎকালীন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্র পক্ষীয় চুক্তিও স্বার্থের তাগিদেই হয়েছিল। মার্ক্‌সবাদী রাজনীতির কৌশল হিসাবে অর্থাৎ ইংরেজের সঙ্গে সাময়িক দক্ষতার সুযোগ নিয়ে ভারতের জনগণের মধ্যে বুর্জোয়া বিরোধী সংগঠন গড়া এবং তা' সেই সময়ের ভারতীয় ঐতিহাসিক সত্য ভারতীয় জাতীয়দাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামের দারুণ সহায়ক না হলেও একথা সত্য যে, তখনই প্রথম ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে স্পষ্টভাবে সাম্যবাদী সংস্থা গড়ে ওঠে, ইউনিয়নসমূহ তৈরি হতে থাকে এবং এমনকি নগণ্য বিড়ি কারখানার শ্রমিক পর্যন্তও জাগে। গ্রামের নগ্ন, হৃতসর্বস্ব ল্যাট, বাগ্দী, ক্যাওট, মুচি, ডোমও আপন সত্তার মর্যাদার কথা চিন্তা করতে শেখে (পরে জাতীয়তাবাদী দলও সেদিকে ব্যাপকভাবে দৃষ্টি দেয়)। জমিদার ও শিল্পপতিরা অন্তরে কি যেন দুঃস্বপ্নর অস্পষ্ট অথচ আতঙ্কসম্ভাবী ছবির ছায়া দেখলেন। এই পরিস্থিতি এবং পরিবেশে সুকান্তর আবির্ভাব। সুতরাং তাঁর কলম তাড়িয়ে চলে, "শোন্

রে মালিক, শোন রে মজুতদার | তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড় | হিসাব কি দিবি তার?" জমিদার, জোতদার ও শিল্পপতিরা কৃষক ও শ্রমিকদের যে ভাবে ঠকিয়ে শত শত বৎসর ধরে আপন বিত্তের পরিমাণ বাড়িয়েছে তার কি হিসাব আছে? তাই কবির কণ্ঠ হাঁকে—"বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে, | আমি যাই তারি-দিন-পঞ্জিকা লিখে···" (এই বিদ্রোহের ভূমি সেদিন তৈরি করা হচ্ছিল। এবং এমনিভাবে একনিষ্ঠ সাধনা ও তদ্গতপ্রাণা হয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের ভক্ত হিসাবে বিশিষ্ট নবতম ধারায় তাঁর কাব্যের মধ্যে নূতন সমাজ সম্ভাবনার সুর বাজালেন। সেই সুরটি সেদিন ছিল ভূমিকা, ১৯৭০ এবং তারপরের যুগে তারই ভিত্তিতে রচিত হচ্ছে সমাজ বিবর্তনের পটভূমিকা। সুতরাং ভারত তথা বাংলার এই বৈষয়িক ও সামাজিক পরিবর্তনের মূলে ভূমিহীন কৃষকের জমি দখল করার যে শক্তি অর্জিত হয়েছে তাঁর দেখা স্বপ্ন তাঁর জন্য কাজ করেছে অত্যন্ত বেশী। অন্নময় কোষ-ভিত্তিক দর্শনের মাটিতে পা দিয়ে কাব্য সাধনার সার্থকতা এইখানেই, যেদিন প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল মানুষ নামধারী প্রাণী সেদিন প্রাণধারণের তাগিদে অর্থনৈতিক, রক্তের সম্বন্ধভিত্তিক কোনোরূপ শ্রেণীগত, গোষ্টীগত, নাম বা সম্বন্ধগত (যেমন বাবা, মা মেয়ে, ছেলে) বা অর্থনীতিগত বৈষম্য পৃথিবীতে ছিল না, একথা সকলেই জানেন; ধীরে ধীরে প্রাথমিক সেই সৃজন ক্রিয়ার লালনগত প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করল। মা, বাবা সম্বন্ধ এল, পরিবার গড়ল, পল্লী তৈরি হল, গোষ্ঠী এল, তারপর সর্দার, পরে রাজা এবং প্রজা। আজ সেই ক্রিয়াচার ও প্রতিক্রিয়া পুনরায় প্রজাকে রাজায়, রাজাকে প্রজায় এবং কয়েক'শ বছর পর মা, বাবা ইত্যাদি সম্বন্ধও উঠে যাবে কিনা ফের—তাও চিন্তায় পরিণত করছে। সুতরাং থিওজফিস্ট বা থিওলজিস্টরা যতই বলুন—একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বায়োলজির একান্ত প্রয়োজনীয় অন্নময় কোষের চাহিদার উপর কট্টর বাস্তববাদী ও জাগতিক প্রয়োজনবাদী চিন্তাধারার ফলশ্রুতি যে জীবনদর্শন তার মন্ত্রপূত কাব্য ভূমণ্ডলে একজাতীয় কবিদের উজ্জ্বল স্বকীয়তা আছে। সুকান্ত সেই কবিদেরই অন্যতম। এবং খুঁত কম।

তাঁর কাব্য চিন্তাতে অন্নময় কোষের উপরের ধাপ প্রাণময় কোষ, মনময় কোষ ইত্যাদিরও স্পর্শ মেলে, যথা :—"ফুল ঝরে আর যৌবন চলে যায়, বার বার তারা 'ভালবাসো' বলে যায়—" এরপরও কি আর বলার প্রয়োজন আছে যে, তাঁর কাব্যে আত্মার সংবর্ধনাও ফুটে উঠেছিল। এবং ঐ ফুটে ওঠাটা ছিল

অবশ্যম্ভাবী কেননা তিনি ছিলেন বাঙালী তথা ভারতবাসী। আত্মা তথা শক্তির ঐতিহ্যে ভারতবাসী বিশ্বাসী। তাই এদেশে কমিউনিস্টরাও সরাসরি সেই চিন্তাকে বিসর্জন দিতে পারেন না। যে শক্তির বন্ধনে বহুপদার্থ বাঁধা পড়ে দেহ গড়ে উঠেছে, সেই শক্তির নাম আত্মা এবং তারই গান প্রকারান্তরে গেয়েছেন সুকান্ত, তা না হলে তিনি লিখতে পারতেন না—"তোমার আহ্বান ধ্বনি—পরশিয়া মোরে গরজিল দূর আকাশে।"

এই আকাশে পৌঁছোনোটা তো সর্বশক্তিমানের জয়গান ভাস্বর। যেদিন কমিউনিস্ট দুনিয়াতেও ভোগ উন্নততম পর্যায়ে পৌঁছোবে, মহাকাশ এবং অন্যান্য গৃহ হবে কমিউনিস্ট মানুষদেরও নিত্যকার 'এপাড়া-ওপাড়া' সেদিন মার্ক্সের 'সারপ্লাস' ভ্যালুর বর্তমান সূত্র আর প্রযোজ্য হবে না। যেমন ১৯১৭-র রাশিয়ান কমিউনিস্ট থিয়োরী আজ রাশিয়াতেই পরিবর্তিত। তাকেও আজ উৎপাদিক পণ্যর বাজার খুঁজতে হচ্ছে state capital-এর উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের নিয়মকে মেনে নিয়ে; নচেৎ তার অর্থনীতি অপদস্থ হবে, surplus product-এর ঝুঁকিতে মেরুদণ্ড বেঁকে যাবে। সুতরাং সমস্ত পৃথিবী যেদিন কমিউনিস্ট অর্থনীতির সূত্র-স্বীকার ও প্রয়োগ করে অপর্যাপ্ত সম্পদ সৃষ্টি করবে—সেদিন যত শত বৎসর পরেই হোক না কেন—প্রলিতারিয়েতরা হবে সেদিন সুখী সুস্থ বিত্তবান। স্টেট্ ক্যাপিটালের অন্তর্গত individual মানুষগুলো সে সময় প্রকারান্তরে ক্যাপিটালেরই পূজারী হয়ে রইবে। এবং প্রতিটি দেশ চাইবে তার সাম্যবাদী অর্থনীতির ফসলকে বাজারে ছেড়ে লভ্যাংশ আনতে, যেটা ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রের ব্যবস্থার মতো একচোখো হবে না, কিন্তু দেশে দেশে প্রতিযোগিতা থাকবে—চীন ও রাশিয়ার সংঘর্ষ তারই উদাহরণ। ষাট-কোটি চৈনিকের জীবন-যাপনকে সুখী মানবোচিত করতে হলে বিদেশের বিরাট বাজার চাই। সেখানে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। তাই নেপালের বাজারে চীনা মালের ছড়াছড়ি রাশিয়ান মালের পাশে। আর বেশী কথা না বাড়িয়েও এটুকু এখন পরিষ্কার করে বলা যায় যে, যেদিন সম্পদ হবে প্রতি মানুষের ঘরে অঢেল সেদিন তার চিন্তাতেও আসবে "where next ?" এই প্রশ্ন। সেদিন উত্তর দিতে গিয়ে "synthesis"-কে অস্বীকার করা আজকের মার্ক্সবাদ তার রূপ পালটাবেই। পালটাতে বাধ্য। বিবর্তন-সূত্র তা-ই বলে। ক্ষত-বিক্ষত সমাজে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষে উত্তরণ ছিল মার্ক্সের চিন্তায়। তাই synthesis-কে তিনি আমল দেন নি। কিন্তু সুস্থ সুখী-সমাজে synthesis-এর

সত্য পরিচয় ধরা পড়বে এবং সেদিন হয় রূপকে নয় সরাসরি এই শক্তিটার মর্যাদা দিতেই হবে যেটির নাম সর্বশক্তিমান। এবং সুকান্তর কাব্যে সে শক্তি মর্যাদা পেয়েছে। তাই লিখেছেন—"তোমার আহ্বান ধ্বনি" যে ধ্বনি তার রক্তে উদ্বেলিত, যার পুঁথিগত ব্যাখ্যা কতটা সম্ভব তা' চিন্তার বিষয়।

Man is in existence—এটি একটি প্রমাণিত সত্য, তেমনি একুশ বছরের সুকান্তের অবাক করা প্রতিভাও প্রমাণিত সত্য। যিনি যাই বলুন যে, তাঁর কাব্যে পার্টি স্লোগান আছে, একথা তথাপি অস্বীকার করা যায় না যে, সমস্তর উর্ধ্বে ছিল তাঁর কবি-সত্তা। তাই ঘরে ঘরে সুকান্ত আজ সকলের, শুধু তার পার্টির বা বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের নয়। নন তিনি পুরোনো দিনের কাব্য-রচনা রীতিরও কেউ। এমন এক মনোজ্ঞ অথচ সরল ছন্দবোধ নিয়ে, ভাষা এবং উপমা প্রয়োগের অদ্বিতীয় সহজাত ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হলেন যে, ভাষাটা ও রচনা পদ্ধতিই হয়ে গেল 'সুকান্তীয়' এবং উপমার ঔজ্জ্বল্য ও প্রখরতা উপমা কালিদাসস্য বা রবীন্দ্রনাথস্যকেও ঠেলে সরিয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলল। যথা: "পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি!" বাস্তবকে নিংড়ে নিয়ে এমন উন্নতমানের উপমা প্রয়োগ তাঁর আগে বাংলা-কাব্যের জগতে কটি আর হয়েছে? কটি আর এমন ভাষা পেয়েছে বিদগ্ধ যেখানে আলোড়ন তুলেছে শব্দের সুস্পষ্ট ও সুরুচি-সম্পন্ন ঝংকার—

"কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:"

কি আকুল অন্তর-বেদনা থাকলে তবে অতখানি ঢেউ ওঠানো কবিতা লেখা যায়, তা উপলব্ধি করবেন তিনি, যিনি কবি। অন্যে তা উপলব্ধি করতে পারে না। বুকের মধ্যে সেই ছটফটানো-টনটনানি সমালোচকের চোখের দেখা জগতেরও অনেক উপরে। তাই বলতে ইচ্ছা করে যে, কট্টর নিখাদ বাস্তববোধের মধ্যে থেকেও অভূতপূর্ব রোমান্টিকতা তাঁর ধমনীতে ছিল উদ্বেল। সেইখানেই তিনি

শ্রেণী-সংগ্রামের একেবারে গোড়ার কথাটায় মানে ধরে নিয়ে এগোতে এগোতে শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনায় বিভোর হয়ে যেতেন; যদিও শ্রেণীহীন সমাজের কাব্য কেমন হবে তা তিনি জানতেন না (জানা সম্ভবও ছিল না শ্রেণী-সংগ্রামের

মাত্র পূর্বাভাসের কালে এদেশে) তথাপি শ্রেণী-সংগ্রামবোধের কুঁড়ি যখন ফুটছিল ঠিক সেই সময়ে তিনি পরিণত শ্রেণী-সংগ্রামীর মতো পাকা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দাপা-দাপি শুরু করেছিলেন। তখনকার বাংলায় অকমিউনিস্ট মহতেরাও তাঁর সেই ক্ষমতাকে অভিনন্দন জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা—"জাত-কবি"র কোনো জাত নেই, দল বা গোষ্ঠী নেই। সে কবি। ঐটাই তাঁর পক্ষে প্রথম ও শেষ কথা। এবং সুকান্তও ছিল তাই।

আরও কিছুদিন তিনি বেঁচে থাকলে কেমনটি হতেন জানি না, কিন্তু একথা জানি যে, উত্তমে পৌঁছোনোর জন্য মানবসমাজের অন্নময় ও অন্ন-স্বার্থে যে সংগ্রাম, যেটির সাফল্যে নির্ভর করে ঐকান্তিকভাবে উচ্চতম জীবনদর্শনের সন্ধানে দলে দলে এগিয়ে যাওয়া সেটির জন্য তিনি অগ্রগামী হয়েছিলেন।

তাই আজ তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

সুকান্তকে আমি দেখি নি ॥ চিত্ত ঘোষ

সুকান্তকে আমি দেখি নি। না দেখলেও সুকান্তকে আমি চিনি। আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন যারা সুকান্তরও বন্ধু। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘনিষ্ঠ। আমি তাদের মুখে সুকান্তর অনেক গল্প শুনেছি। তাছাড়া সুকান্তর কবিতাই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। তাঁকে জানার সবচেয়ে ভালো উপায়। কবিতার ভেতর দিয়ে সুকান্তকে জানার রাস্তা আমাদের সকলের সামনেই খোলা। তবু, সুকান্তকে আমি দেখি নি। দেখা হলে আমার স্মৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হ'ত। আমার কালের এবং ভবিষ্যতের মানুষের কাছে নিজ মুখে সুকান্তর কথা বলা যেত।

এসবই এখন আক্ষেপের মতো শোনায়। হয়তো খানিকটা তাই। সুকান্তকে জানার যে রাস্তা আমাদের সকলের সামনে খোলা আছে সে রাস্তাই এখন আমাদের একমাত্র রাস্তা।

যে বয়সে সুকান্ত পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সেটা জীবন শুরু করার বয়েস। যে রোগে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল সে-রোগ এখন গা-সওয়া। সেদিন না হয়ে আজ যদি সুকান্তর সে-রোগ হ'ত তাহলে বোধহয় কৈশোরের

প্রান্তেই তাঁর জীবনের ওপর যবনিকা পড়ত না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তা হয় নি।

যৌবনে পা না দিতেই যার জীবন ফুরিয়ে গেল তাঁর ক্ষমতার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। ওই বয়সেই বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সুকান্ত ঘর পেয়েছিল। কারণ সুকান্ত সাধারণ মানুষের মনের কথা বলেছেন। সেই জনসাধারণের কথা বলেছেন যে জনসাধারণ অসাধারণ।

একথা বললে এতোটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না যে নজরুলের পরে সুকান্তের মতো এতোখানি জনপ্রিয়তা আর কোনো কবি লাভ করেন নি। নজরুলের জীবনধারার মধ্যেই একটা আকর্ষণের বস্তু ছিল। সুকান্তর তা ছিল না। অত্যন্ত সাদামাঠা জীবন। সুকান্তর যে লোকপ্রিয়তা তার সবটাই কবিতা থেকে। তাঁর কবিতা গানের সুর পেয়েছে। যে-গান লক্ষ লোকের মিছিলে গলা মিলিয়ে গাওয়া হয়েছে। সে-গান মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সুকান্তর এই জনপ্রিয়তা অকারণ নয়। যাঁরা কিছু লোকের জন্য লেখেন সুকান্ত সে দলের কবি ছিলেন না। সুকান্তর কবিতা পড়ে প্রথম যে কথাটা মনে হয় তা হ'ল—এ আমাদের লোক। কবিতা লেখক আর কবিতা পাঠকের মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকে না। বানানো জটিলতার জট ছাড়াতে দশদিক হাতড়ে বেড়াতে হয় না। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় না। জ্ঞানের বহর মাপতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয় না। বলার কথাটা সোজা গিয়ে মনের মধ্যে তীরের মতো বেঁধে। কথার মার-প্যাঁচ দিয়ে উদ্দেশ্যহীনতা সাজানো কখনো সুকান্তর ধাতে সয় নি। সেই জন্যই সুকান্ত আজও সুকান্ত। তাছাড়া আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার একটা একরোখা গোঁ চিরদিন তাঁর স্বভাবে ছিল। তাই সুকান্তর কবিতায় একটা পরম্পরা খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতায় কোনো হারানো সুর নেই। কোনো স্ববিরোধী অধ্যায় নেই। উদ্দেশ্যহীনতা নেই। আদর্শে সমর্পিত হলে এরকম স্পষ্ট, নির্ভীক হওয়া যায়। আদর্শকে রক্তের মধ্যে গ্রহণ করতে পারলেই এরকম অবিচল থাকা যায়। সেখানেই মানুষের অশ্রুময় ক্লেশ, দুর্দশার রক্তপঙ্ক সেখানেই সুকান্তর দীপ্তকণ্ঠ, জঞ্জাল সরাবার ডাক, পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা।

সুকান্তর কবিতাকে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা কারো কারো মধ্যে ছিল। এখনো আছে। মাঝখানে সে-ভাবটা বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। শিল্প, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতি বস্তুর নামে তারা এ-সব কথা বলত। এখনো বলে। কিন্তু এসব

কিছু ধোপে টেকে নি। কবিতাকে জাদুঘরের নমুনা বানাবার যারা পক্ষপাতী তারা সে ভস্মে যতই ঘি ঢালুক, যজ্ঞের শিব তাতে পরিতুষ্ট হবেন না। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের অনেকেরই পরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় একজন পণ্ডিত অধ্যাপক (কিছুদিন লোকান্তরিত) একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের মূল ধারা সুকান্তর কবিতায় প্রবাহিত। তাঁর মতে আধুনিক কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রায় সবটাই মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। এটা একটা নতুন স্রোত যার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের কথার সঙ্গে আমরা অনেকেই একমত নই। তার বিচার নিরবধিকাল করবে। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সুকান্ত বাংলাদেশের গৌরবময় মানসিক ঐতিহ্যের কবি।

সম্প্রতি একটা ঘটনা আমাকে দারুণ ভাবিয়েছে। আমরা সবাই জানি যে এটা লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী বছর। চারিদিকে লেনিন সংখ্যার ছড়াছড়ি। অনেক কবিতা লেখা হয়েছে লেনিনের নামে। একাধিক সংকলন বেরিয়েছে লেনিনের ওপর লেখা কবিতার। যে সব কবিতা পড়াও হয়েছে নানা সভায়। খুবই উৎসাহের কথা এবং খুবই ভালো। কিন্তু লেনিন বিষয়ে একটি প্রবন্ধের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এক বন্ধু যখন লেনিনের ওপর কোনো কবির একটি কবিতার কয়েকটি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি খুঁজে দিতে বললেন তখনই মুশকিল হল। কারো কবিতার পঙ্‌ক্তিই প্রায় মনে এল না। ঘুরে-ফিরে সেই একজনের কবিতাই মনে হল। সেই একজন সুকান্ত। সেই কবিতা "লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ।"

এরকম কেন হল সেটা আমাদের ভাবতে হবে। অবশ্য এই কেন'র জবাব দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সৎ চিন্তা-ভাবনাকে এ বিষয়ে নিয়োজিত করি তাহলে সুকান্তর কবিতার মূল্যায়নে আমরা কোনো নতুন আলো দেখতে পারি। কোনো উপলব্ধির নতুন দিগন্ত আমাদের কাছে আসতে পারে। এখন সময়টা খুব জটিল। সঙ্কট এবং সম্ভাবনায় পূর্ণ। দেশে নানা রকম ওলট-পালট হচ্ছে। কিন্তু পরিবর্তনের যে স্তরের ভেতর দিয়ে আমাদের দেশ চলেছে তার সার্থক প্রতিফলন আছে কি আমাদের কবিতায়? অক্ষমতা ও দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার একটা স্পর্ধা আমাদের পেয়ে বসেছে। এই মোহের হাত থেকে মুক্তি না পেলে উদ্ধার নেই। তাই এক ইংরেজ কবি লোকান্তরিত আরেক ইংরেজ কবি সম্পর্কে একদা যেমন বলেছিলেন আমারও ঠিক সেই রকম বলতে ইচ্ছে করে। সুকান্ত, আজকের দিনে তোমার বেঁচে থাকা দরকার ছিল।

সুকান্ত এবং আমার অক্ষমতা ॥ তুলসী মুখোপাধ্যায়

সুকান্ত যখন এগারো বছরের ছেলে—তখন আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি। তারপর আমার অজ্ঞাতে কখন আমি নতুন পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। পৃথিবীর জল-আলো-বাতাসকে মানিয়ে নিয়েছি। ক্রমে বসতে শিখেছি, হামা দিতে বা হাঁটতে। আর একদিকে বালক সুকান্ত তখন তার দীর্ঘ আয়ত দুচোখ মেলে আশপাশের পৃথিবীটা দেখে নিচ্ছে। রক্ত চলাচল অনুভব করছে পৃথিবীর প্রহার; মানুষের হাহাকার। কান পেতে শুনেছে উঁচুতলার উল্লাস, নিচুতলার কান্না। সুকান্ত বেলেঘাটায় আমি বরিশালের কোনো এক অখ্যাত গ্রামে। দুজনের কিন্তু বয়স বাড়ছে একই সঙ্গে। আমি মর্বেল লাটিম ঘুড়ি নিয়ে দিশেহারা। সুকান্ত কলকাতার পথে পথে কখনো ক্লান্ত, কখনো বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কখনো যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, আবার কখনো বা ঝলসে উঠছে খাপখোলো তলোয়ারের মতো। আমি বালক, সুকান্ত সদ্য যুবক। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এবং পৃথিবীতে কতো ঘটনা! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, চীনের মুক্তিফৌজ, লঙ্গরখানা, কলকাতার পথে পথে মৃত মানুষ, দাঙ্গা, রক্তপাত, দেশবিভাগ ইত্যাদি। আর সুকান্ত তখন যোদ্ধা, কিশোর সভার সুকান্ত, কমিউনিস্ট সুকান্ত। কিন্তু রক্তের মধ্যে নিত্য নতুন বিস্ফোরণ। পৃথিবী এবং মানুষ সম্পর্কে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সমাজসম্পর্কে ঐতিহাসিক সচেতনতা। বাংলার সুকান্ত বুঝি বা বিশ্বমানুষ। কেননা, বিপ্লব স্পন্দিত বুকে নিজেকেই সে লেনিন ভাবছে। গোটা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের হয়ে তার আকাশ ফাটানো চীৎকার—

> "আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
> স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।"

নবজাত শিশুর কাছে প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে সমস্ত মানুষের হয়ে—

> "যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,
> প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
> এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি —"

আর আমি তখন মগরতলা গ্রামের কোনো এক মুখুজ্যে সন্তান। মার্বেল খেলায়

হেরে গেলে গলা ছেড়ে কাঁদি, লাটিমে জিতে গেলে দুহাত তুলে নেত্য করি। এবং হায়। সুকান্তের দুর্বল পরিশ্রমী দেহে ততদিনে স্থায়ীভাবে বসতি নিয়েছে সর্বনাশ। ফুসফুস পোকায় কেটেছে। অতঃপর যাদবপুর হাসপাতালে, রোগশয্যা, অসমাপ্ত স্বপ্ন এবং সংকল্প। ঠিক যখন সুকান্তর কলম আগ্নেয়গিরির আভা তুলছে—তখন একদিন মুখে রক্ত তুলে সুকান্ত থেমে গেল। এবং বলাই বাহুল্য আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না। জাতে পারি না। তারপর আরো লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে এলাম এপারে বাংলায়। আজ এখানে, কাল সেখানে। বাঁচার নিয়ম অনুযায়ী বাল্য ছাড়িয়ে কৈশোরে পৌঁছে গেলাম, সুকান্ত তখনো অচেনা। অচেনা, কারণ তখনো আমি সুকান্ত এবং তার জগৎ কবিতা আর সংগ্রামের থেকে অনেক দূরে। দিন যায়, যায়। একদিন সুকান্ত—কবি সুকান্ত তখন বারুদের মতো পৌঁছে গেছে খেতে-খামারে, কল কারখানায়। খেটে খাওয়া মানুষের মুখে মুখে সুকান্ত। প্রতিবাদের সামনে সাক্ষাৎ-প্রেরণা বিক্ষোভ মিছিলের দুরন্ত পোস্টার। এরকম একটা সময় হঠাৎ একদিন চিনে ফেললুম সুকান্তকে। তখন আমি কলকাতা থেকে ১৫-১৬ মাইল দূরের শহরতলির বাসিন্দা। একটু দূরের এক উদ্বাস্তু পল্লীতে সুকান্ত জয়ন্তী। রবীন্দ্র, নজরুল তো জানি! কিন্তু সুকান্ত? সে কে? ভীষণ একটা উপেক্ষামিশ্রিত কৌতূহল নিয়েই গিয়েছিলাম।

সমাবেশে ঢুকতে না ঢুকতেই শুনতে পেলুম, "অবাক পৃথিবী! অবাক তুমি!..." গান। গায়কের নাম এখন আর মনে নেই। খাড়া মেরুদণ্ড, দু'চোখ ধ্যানের মতো নিবিষ্ট। গলায় মায়ের মতো দরদ

"...এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম।"

গায়ে কাঁটা দিল। কী সুর। এ কী রকম কথা। তারপর নাচের সঙ্গে "রানার চলেছে তাই রুমঝুম ঘণ্টা বাজে রাতে" (না, শম্ভু ভট্টাচার্য নন তার পাঁজর-গলানো-নাচ দেখেছি আরো পরে)। মাথায় কী একটা অস্থীরতা! বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ শূন্যতা। তারপর কবিতা, আগুনগোলা কবিতা এবং সবশেষে "ইলা মিত্রের"র কুদ্দুস সাহেব। সুকান্তর জীবনী আলোচনা করলেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে একটা প্রবল অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেলুম। এই তো কথা পেয়েছি—পেয়েছি নতুন দিনের রাস্তা অথচ কত দেরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী শাসনের প্রথম ঝিলিক অবসিত। কালোবাজারী, ভেজাল, ঘুষ।

ঐশ্বর্য আর ক্ষমতার দাপট! সমাজটা পচে গেঁজিয়ে উঠল পুঁজ-রক্ত। শোষণ আর নির্যাতনকে বুঝতে পারলুম মর্মে মর্মে। কিন্তু কোথায় সুকান্ত? কলমের ধারেকাছেও তো তার দেখা পাচ্ছি না। অজস্র কবিতা লিখছি। লেনিন, হো চি মিন, ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া! সর্বোপরি সর্বহারা মানুষ। কিন্তু কেবল শব্দ ধুনে ধুনে কসরত হল। প্রাণহীন এবং রক্তশূন্য। কিন্তু তবুও তো প্রগতিশীল কবি! আহাম্মুকি! আহাম্মুকি! কী প্রচণ্ড মূর্খতা! একুশে এসে সুকান্ত থেমে গেছে আর আমি বেড়েই চলেছি! একত্রিশ ছাড়িয়ে গেছি। এখন আমি সুকান্ত থেকে বারো বছরের বড়। এবং তাই সুকান্তর দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালে লজ্জায় নুয়ে পড়ি। মাথা হেঁট হয়ে আসে। ইচ্ছে হয়—কলম-দোয়াত-কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় চীৎকার করে উঠি—"আমি ভণ্ড, প্রতারক। সারা জীবনে সুকান্তর মতো একটাও কবিতা লিখি নি, লিখি নি নয়—লিখতে পারি নি। পারি নি, কেননা, সুকান্তর বিদ্রোহী অনুভব আমার নেই, নেই সুকান্তর মতো মহৎ বেদনাবোধ এবং অপরাজিত ভালোবাসা।…"
কিন্তু হায়! তাও পারি না। অতএব কলম ঘষেই চলেছি। অথচ সুকান্তের কাছেই তো আমি নাড়া বেঁধেছিলুম। তবু হে সুকান্ত আমার এই ক্ষমাহীন অক্ষমতা কেন?

কবি সুকান্ত ও মানুষ আমরা ॥ চিত্তরঞ্জন পাল

বাংলাদেশ কবিতার দেশ। বাংলাদেশ কবির দেশ—রবীন্দ্রনাথের দেশ। এই কবিতাপ্রিয় দেশের ঘরে ঘরে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম পরম আদরে উচ্চারিত একটি অতি পরিচিত নাম। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এত ভালবাসা ও সমাদর বাংলাদেশে অন্য কোনো কবিকে দেয় কিনা সন্দেহ। শুধু কিশোর ও তরুণদের মুখেই নয়, অনেক বয়স্ক ব্যক্তির মুখেও সুকান্তের কবিতার বহু পঙ্‌ক্তির আবৃত্তি প্রায়ই শোনা যায়। এদেশের মানুষের দুঃখে-সুখে, আনন্দে-বেদনায়, সংশয়ে-সংগ্রামে সুকান্ত নিত্য সহচর। পাঠকের এমন অকুণ্ঠ অমলিন অকম্পিত ভালবাসার অর্ঘ্য খুব কম কবির ভাগ্যেই জোটে। অথচ বাংলাকাব্যের আকাশে নবোদিত বালার্কের মতো সুকান্তের অভ্যুদয় কোনো আকস্মিক বা অতিলৌকিক ঘটনা নয়।

মানুষের প্রতি ভালবাসার যে ঐতিহ্য বাংলাকাব্যের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, সেই চিরায়ত ধারার সার্থক অনুবর্তনেই সুকান্তের আবির্ভাব। একদিন যখন বাংলাকাব্যে পৌরাণিক দেবদেবীর নিঃসপত্ন একাধিপত্য তখনও বাঙালী কবি দেবতাকে আপন করে প্রিয়ের আসনে বসাতে চেয়েছে; আর প্রিয়েরে দেবতা করে বাড়াতে চেয়েছে তার মানব-মাহাত্ম্য। মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালী ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নপূর্ণার কাছে পারলৌকিক প্রগতির পাসপোর্ট ভিক্ষা করে নি; সবিনয় প্রার্থনা জানিয়েছে "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" দিনের পর দিন মানুষের ক্রমিক প্রাধান্যলাভে দেবতরা ধীরে ধীরে সরে গেছেন নেপথ্যে, সামনে এসেছে মানুষ, স্পষ্টতর হয়েছে এই কথা—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষই তো সব, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর—যেথায় আছে সবার অধম দীনের হতে দীন। সেইখানেতে চরণ তোমার রাজে। সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।

রবীন্দ্রনাথ সুমহান কবি। তাঁর কবিকৃতি সহস্রধা, বহুবিচিত্র পথগামী: তবু মানব-হৃদয়-রহস্যের গভীর গহনে অবাধ প্রবেশাধিকারের সর্বত্র-গামিতার অভাবহেতু রবীন্দ্রমানসেও অপূর্ণতার বিক্ষোভ, কাব্যশ্রীর ম্লানিমায় আক্ষেপের বিষণ্ণতা। তাঁর অবিচল বিশ্বাস বৃহত্তর লোকজীবনের সুনিবিড় অন্তর-বাণী কাব্যের শিরায় শিরায় সার্থকভাবে প্রবাহিত না হলে কবিতার আবেদন অসম্পূর্ণতায় খণ্ডিত হয়ে পড়ে, সুরসংগতির মন্ত্র মন্দ্রিত হয় না মহাজীবনের ঐকতানে। রাজ্যসাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে, ইতিহাস পাতা ওলটায়, বদলে যায় দেশকাল সমাজ সভ্যতা সাহিত্য সংস্কৃতির রূপ ও স্বরূপ। অথচ বিপ্লবে বিদ্রোহে আবর্তনে বিবর্তনে চির চলিষ্ণুতার অস্থির চঞ্চল পটভূমিকায় "শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে। ওরা কাজ করে।" সুতরাং, সাধারণ মানুষের অন্তরের মূক বাণীকে মুখর করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানালেন এ যুগের কবিকে—

> "কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
> যে আছে মাটির কাছাকাছি
> সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।" [ঐকতান

এবং এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার লোকের অভাব ঘটল না বাংলাদেশে। বিদ্রোহের তূর্যনাদে দিগ্‌দিগন্ত আলোড়িত করে সাম্যের গান গাইলেন নজরুল

ইসলাম। কামারের আর কুমারের ইতরের আর ছুতোরের মনের কথা বলতে এলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন পদাতিকের ভাষায় —'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।' অক্ষয় বড়াল মানববন্দনা রচনা করার পর বহুতর জলধারা বয়ে গেছে বাংলার কাব্যগঙ্গায়। কবির পর কবি এসেছেন মানুষের বোবা বেদনাকে বাঙ্ময়তায় মুখর করে তুলতে। অগ্রণী সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায়—"যুগের দাবিকে কেন্দ্র করিয়া সুকান্তের কবি-প্রতিভা জন্মলাভ করিয়াছিল; তাই রবীন্দ্রযুগের নজরুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির আবির্ভাবের ন্যায় সুকান্ত-প্রতিভাও অত্যন্ত স্বাভাবিক, মোটেই আকস্মিক নয়। বাংলার আত্মিকপ্রতিভার ইহা এক নূতন স্ফুরণ।" সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় সুকান্ত ঐতিহাসিক কবি-কর্তব্য পালনের ব্রতে আত্মোৎসর্গ করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী জনতা লাঞ্ছিত নিপীড়িত অত্যাচারিত। মানুষের চোখে পড়ে না তাদের অপরিসীম দুরবস্থা, কানে বাজে না অসহায় অস্তিত্বের নিরুপায় কান্না। সেই কান্নাকে শপথের মন্ত্রে রূপান্তরিত করল কবিকিশোর—সেই মৌনে বাজালো অশনিমন্ত্র। নকল শৌখিন মজদুরি নয়, প্লাসটিকের পাতাবাহারের ড্রয়িংরুম সাজানো নয়, রক্তের স্বাক্ষরে রচিত হল সেই সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞান। প্রাক্-সুকান্ত কবিদের প্রয়াসে যে ক্ষীণধারায় এসেছিল উচ্ছল প্রবাহ, সুকান্ত সেই ধারায় আনল নবযৌবনের প্রচণ্ড প্লাবন, প্রমত্ত আবেগের কূলভাঙা কলকল্লোল। ব্যাপ্তিতে ও পরিমাণে সামান্য হলেও সুকান্তের কবিতা তাই অনিঃশেষ তাৎপর্যে অসামান্য।

এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম।

অপার শান্তি ও সমৃদ্ধির লীলানিকেতন সুশ্যামল বাংলাদেশের অপর্যাপ্ত সম্পদের শীর্ষ চূড়ায় দাঁড়িয়ে বুকভাঙা বেদনায় ও নৈরাশ্যে কথা কয়টি উচ্চারণ করেছিল সুকান্ত। জন্মসূত্রে দারিদ্র্যের বরপুত্র না হলেও অভাব-অনটন ও অনাদরের চাবুক খেয়ে খেয়ে যার প্রবঞ্চিত বাল্যকৈশোরের অভিষেক, রাজরোগের রাজকীয় আহার যার অশেষ সম্ভাবনাময় মহাজীবনের অকাল বিনষ্টি, তার বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নারকীয়

ধ্বংসলীলা, দেশব্যাপী মহামন্বন্তর, অসহায় নির্মম মৃত্যুর করালগ্রাসে ঢলে পড়ল পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালীর জীবন। তারই সঙ্গে সুকান্তর মরণের মর্মান্তিক কারুণ্য জাতির দুর্গতির ও দুর্দশার শোচনীয় পরিচয়কে ধ্বংসদূতের নির্মম পরোয়ানায় জাহির করল দুর্বিনীত অহমিকায়। শকুনির ডানায় ভর করে সেই কালোছায়া আরও ঘনীভূত, আরও প্রসারিত হয়েছে ভাঙা বাংলার শহরে নগরে গ্রামে জনপদে। এই সীমাহীন অতলান্ত নৈরাশ্যের কথা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করার জন্য আজ আর সুকান্ত বেঁচে নেই; আছেন বাহাল তবিয়তে তাঁরা মানবাত্মার নিঃসঙ্গতার ভাবনায় মুক্তির পথ খোঁজেন যৌনতার বিবরে অথবা পরম প্রিয় আত্মরতির নৈরাজ্যে। সহজ মানুষ নেই, আছে চতুর চাতুরীর অজস্র খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রোজেকসান।

অথচ সুকান্তর কাব্য বিশেষ কালের উৎকীর্ণ ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চান কোনো কোনো সমালোচক। গগনবিহারী শিল্পসাধনার গজদন্তমিনারবাসী এই সব পবিত্র আত্মা সাহিত্য ও শিল্পকলার চরম বিশুদ্ধতা রক্ষার অতীন্দ্র প্রহরী। রাজনীতি সাহিত্যকে স্পর্শ করবে, শিল্প হবে মানুষের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার—এতবড় কদর্যতা তাঁদের বিচারে অমার্জনীয় অপরাধ। উলটে এইসব কথা সরবে রোমন্থন করে তাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন—সুকান্তর চিৎকৃত বামমার্গী কবিতা নিতান্ত রাজনৈতিক কারণে বিশেষ বিশেষ পাঠকমহলে জনপ্রিয়। ক্ষণিক উন্মাদনার গরম খোরাক বলেই এ সব কবিতার সস্তা আবেদন স্বভাবতঃই অচিরস্থায়ী। সাত্ত্বিকতার যে বদ্ধ অচলায়তনে নৈষ্ঠিক পবিত্রতার বাস সুকান্ত সেখানে অস্পৃশ্য অবাঞ্ছিত বলেই তার সমাদর শোণপাংশুদের পাড়ায়। এমনই একজন বিদগ্ধ কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেন—"কবি হবার জন্যই জন্মেছিল সুকান্ত, কবি হবার আগেই মরল সে।" সুকান্ত বাঁচলে কত বড় কবি হতে পারতো অথবা পারতো না—সে অনুমান বা গবেষণা খুবই বিতর্কমূলক। এবিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতো বিস্ময় প্রকাশ করে নীরব থাকাই ভালো। যা পেয়েছি তার বেশী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও উপায় নেই যখন, তখন সেই উত্তরাধিকারের সমাদর ও যথার্থ মূল্যায়নই বর্তমানের কর্তব্য ও একান্ত কাম্য। একথা বলাই বাহুল্য শিল্পরচনায় রাজনীতি বা অন্য কোনো নীতির অনুপ্রবেশ, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সুকান্তেই প্রথম নয়; এবং শেষও নয়। তারাশঙ্করের সাহিত্যে মোহনদাস অনুপস্থিত বলা নিছক মূঢ়তা। অসুন্দরের পূজারী বদলের (বা বোদলেয়ার) তো অনেকেরই উপাস্য।

আবার রাজনীতি বরবাদ করতে তো অনেকে তলিয়ে গেছেন বা যাচ্ছেন উপেক্ষা আর অবহেলার ঘোলাজলের পঙ্কিল আবর্তে। রাজনীতিকেই সিদ্ধির একমাত্র ত্রিশূল মেনেও অনেকে অনেক ডিগবাজি খেয়েছেন এবং খাচ্ছেন মকশো করা শুক্‌নো কথার কসরতে। দলীয় প্রচারণার অনুদার সংকীর্ণতায় শিল্পসাহিত্যের পঙ্গুতা স্থবিরতা আসে না এমন কোনো নিশ্চিত গ্যারান্টি নেই। সস্তা দলবাজির জরুরী গরজে মানুষকে ছকের ইট বা মতলবের মনোহর পুতুল সাজানো প্রকারান্তরে অক্ষমতার জয়ঢাক বাজানো। সুতরাং এই দুর্বল অনুকারিতার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে সবল রাজনৈতিক বিশ্বাসের শরিক হলে তুলির টান ভোঁতা হয়ে যায় পাবলো পিকাসোর। রাজনীতির দায়ে আসামী সাব্যস্ত হয় গোয়েনিকার মতো মহিমময় দীপ্তোজ্জ্বল চিত্র। অথবা কলমের মুখে কালি আটকে যায় অক্লান্ত পথিক রমাঁ রলাঁর অথবা ম্যাকসিম গর্কির! ফ্রয়েড-হেলেন, কামু-কাফকা, টোটেম-লিবিডো ইত্যাদিতে দোষ নেই; যত দোষ নন্দ ঘোষ বুড়ো কাল মার্ক্‌সের? ইতিহাস যে অন্য কথা বলে। ইতিহাসের কি গতিরুদ্ধ হবে বালির বাঁধে—মানুষের জয়যাত্রার মিছিল থেমে যাবে হাঁচিটিকটিকি তাগাতাবিজ অমাবস্যা-ত্রহস্পর্শে দেয়ালে !!

বরং আজ পক্ষ নির্বাচন করতেই হবে—ইতিহাসের? এই চরম রায়। কোনো ইষ্টই যার অভীষ্ট নয় অন্বিষ্ট কি তার সাহিত্যের? অন্তত আর্টিস্টের ইষ্ট তো মানুষ। মানুষের জীবন। এই মানুষের পক্ষে বলেই তো মহামতি তলস্তয় বিপ্লবী লেনিন তথা বিশ্বমানবের পরম বন্দনীয় মহাপুরুষ এই মানুষের মনে রহস্য-উদ্‌ঘাটনের সুনিপুণ কারিগর হিসাবেই শেক্‌সপীয়র পৃথিবীর নমস্য। মোর নামে এই বলে পরিচয় হোক। আমি তোমাদেরই লোক। আর কিছু নয়। এই মোর শেষ পরিচয়।—রবীন্দ্রনাথের এই শেষ পরিচয়ই সমস্ত মানবপ্রেমিক শিল্পী ও সাহিত্যিকের আসল পরিচয়। এই পরিচয়ের অবিনশ্বর জয়টিকা সুকান্তর ব্যাধিজর্জর ললাটেও। এই গৌরবেই সে জনতার সঙ্গে ঘনতায় একাকার। এই মানব ভাগ্যকে স্বীকার করেই সে মানুষের মহত্তর সুন্দরতর জীবনের জন্য সংগ্রামের সহযাত্রী 'চল্লিশ কোটি জনতায় জানে আমিও যে একজন। অতএব নরম কোমল পেলব সুকুমার সূক্ষ্ম ভাব ভাবনা—প্রিয়া, ফুল, প্রেম বা একাকিত্বের নিঃসঙ্গ হাহাকার ইত্যাদি তাই অন্বিষ্ট নয় তার কবিতার। "আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে?"

(সুকান্ত সমগ্র)। সচেতন সুকান্ত তার কর্মীসত্তাকে সবার উপরে স্থান দিলেও সে তো আর পাঁচজনেরই মতো রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ। তার মানবসত্তাও দুঃখে কাতর হয়, আঘাতে নিরাশ হয়, বেদনায় আর্তনাদ করে, পালিয়ে যেতে চায় পার্থিব কুশ্রীতা ও বিশ্রীতা থেকে দূরে কোথাও। "যেখানেই যাই, সেখানে দেখি কুশ্রীতা মলিনতা—এক দুর্নিবার গ্লানিতে আমি ডুবে আছি।...বাস্তবিক আমি কোথাও চলে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে মিলিয়ে যেতে চাই...কোন গহন অরণ্যের কিংবা অন্য যে-কোনো নিভৃততম প্রদেশে, যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল সূর্যের আলোর মতো স্পষ্টমনা হিংস্র আর নিরীহ জীবেরা, আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ।...এই পার্থিব কৌটিল্য আমার মনে এমন বিস্বাদনা এনে দিয়েছে, যাতে আর আমার প্রলোভন নেই জীবনের ওপর।...এক অননুভূত অবসাদ আমায় আচ্ছন্ন করেছে।" (সুকান্ত সমগ্র)। এ কোন্ সুকান্তর কণ্ঠস্বর, এ কোন্ পরাজিতের হাহুতাশ! মানুষ সুকান্ত, অনাদৃত সুকান্ত, দেহ-মনে পীড়িত সুকান্ত তার পরমপ্রিয় পার্টিকে লক্ষ্য করে লিখেছে—"কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্য পাঁচটি টাকা। আর পেলুম চারদিনের জন্য পার্টি হাসপাতালের 'ওষুধপথ্যিহীন' কোমল শয্যা। এতবড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে কখনও হই নি। আমার লেখকসত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মীসত্তা আবার চায় উঠে দাঁড়াতে। দুই সত্তার দ্বন্দ্বে কর্মীসত্তাই জয়ী হতে চলেছে; কিন্তু কি করে ভুলি দেহে আর মনে আমি দুর্বল; একান্ত অসহায় আমি? আমার প্রেম সম্পর্কে সম্প্রতি আমি উদাসীন। অর্থোপার্জন সম্পর্কেই কেবল আগ্রহশীল। কেবলই অনুভব করছি। টাকার প্রয়োজন। শরীর ভালো করতে দরকার অর্থের, 'ঋণমুক্ত হতে দরকার অর্থের; একখানাও জামা নেই, সেজন্যও যে বস্তুর প্রয়োজন তা হচ্ছে অর্থ। সুতরাং অভাবে কেবলই নিরর্থক মনে হচ্ছে জীবনটাকে। (সুকান্ত সমগ্র) সুকান্তর কবিতায় এই মনোভাবের প্রকাশ—

"ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে,
দিনরাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে।
এখানে ওখানে, পথে চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত,
মনে হয় যেন জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত।" [অসহ্য দিন

অথবা "আমি এক মৃত্যুর প্রতীক।" কিন্তু—

"বন্ধু, আমরা হারিয়েছি বুঝি প্রাণধারণের শক্তি,
তাইতো নিঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি।
এর চেয়ে ভালো মনে হয় আজ পুরোনো দিন,
আমাদের ভালো পুরানো, চাই না বৃথা নবীন। [তরঙ্গ ভঙ্গ

অথবা—

"আমার গোপন সূর্য হল অস্তগামী
এপারে মর্মরধ্বনি শুনি,
নিস্পন্দ শবের রাজ্য হতে
ক্লান্ত চোখে তাকাল শকুনি।" [সহসা

এই ক্লান্ত পরাজিতের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তুলনীয় বিদ্রোহী কবি সুকান্তর বাণী যেমন বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্যের অপরাজেয় পৌরুষ—

"লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ।
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন॥" [লেনিন

৩

বাংলা সাহিত্যে সুকান্তর আবির্ভাব আপন বৈশিষ্ট্যের অনন্যতায় চিহ্নিত। একটি অপরাজেয় প্রত্যয়ের অবিচল সুর সে সঞ্চারিত করে দিয়েছে বাংলাকাব্যের মর্মমূলে। এ যেন ফরাসীদেশের উত্থান-পতনের ইতিহাসে জোন অফ আর্কের আবির্ভাবের মতো বিস্ময়কর একটি ঘটনা। কিশোর কবির অটলোন্নত বিশ্বাস এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ স্পষ্ট ঋজু অকুণ্ঠ প্রকাশভঙ্গীই যেন সেই বিস্ময়। এতে অল্প বয়সের মায়াবী জাদু আছে, আছে তারুণ্যের অভ্রংলেহী স্পর্ধা ও উন্মাদন। যে বয়সে মানুষ আপনাকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিমান ও ক্ষমতাবান মনে করে, সেই বয়সের অহমিকা কল্পনা-প্রবণতায় স্পৃশালুতায় সর্বত্রগামী। সুকান্তর কল্পনাপ্রিয়তা এমনই আশাবাদী জীবন—চেতনায় উচ্ছল ও জ্যোতির্ময়। তার

সমাজচেতনা দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার প্রায় সমগোত্রীয়। সমাজের বৃহত্তর জনসংখ্যা দরিদ্র, আশ্রয়হীন অনাথের মতো। তাদের দুঃখের অবধি নেই, নির্যাতন ও নিপীড়নের অন্ত নেই, বিন্দুমাত্র সম্মান নেই পদদলিত ও অবহেলিত মনুষ্যত্বের। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এই অপমানিত মানবতার মর্মে মর্মে বিদ্রোহের জ্বালা, বঞ্চনায় ছলনায় বিক্ষোভের আগুন, প্রতিকারহীন যন্ত্রণায় সর্বগ্রাসী ভাঙনের শিখা। শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী যেখানে নীরবে নিভৃতে কাঁদে সেখানে সুকান্ত নিয়ে এল অকম্পিত প্রতিবাদের ভাষা, অচঞ্চল প্রত্যয়ের দুঃসাহস, অনাগত সুদিনের প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। ইস্পাতের মতো কঠিন এই জীবন-সত্য ঝলসিত হল দুঃখ-দারিদ্র্য-যন্ত্রণার বজ্রাগ্নি শিখার। আর তার প্রকাশের ভাষা দীপ্ত শাণিত কপটতাশূন্য। ঘনপিনদ্ধ বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রকাশের স্বচ্ছতায় সজোরে নাড়া দিয়ে অধিকার করল পাঠকের মন। বিশেষ করে সেই সব কাঁচা মন যা অল্প বয়সের আবেগে উত্তাল, উচ্চাশায় অধীর, শক্তির অহমিকায় উদ্ধত, আশা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় বেপথুমান। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের জীবনে তো সমস্যার অন্ত নেই, বঞ্চনার শেষ নেই, আলেয়ার মরীচিকা-রোশনাইয়ে প্রাচুর্যের লেশমাত্র নেই। মনে মনে সুখ-সমৃদ্ধির কল্পস্বর্গ, নিষ্ঠুর বাস্তবের নির্মম চাবুকে পদে পদে সমস্যার শরশয্যা। সুকান্তর সহজ সত্য কথার অনাড়ম্বর সরলতা, স্পষ্টতা ও ওজস্বিতা প্রতিশ্রুত শুভদিনের প্রতিচ্ছবি ক্ষেপণ করল তাদের মনের পর্দায়। বাস্তব সত্যের দুর্জয় দুঃসাহসী আত্মপ্রকাশ বিমুগ্ধ করল তাদের স্বপ্ন কামনাকে। সুতরাং একথা বলা শুধু রাজনীতির কথা নয়, অতি নগ্ন জীবনের কথাও। ঘুষ, মন্বন্তর, মহামারীর আঘাতে আঘাতে বাংলার সমাজ-জীবন যখন ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, তখন দেখা দিল যে 'দুর্ভিক্ষের কবি' সে 'প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখে মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।' উপবাসী উদরের মর্মচ্ছেদী হাহাকার তাকে বেদনার্ত ব্যাকুল করে তুলেছিল বলেই দৃষ্টি তার সমাজমুখী, মন সদা জাগ্রত, লেখনী বজ্র-কঠোর। বিদেশী শাসনে শোষণ জর্জরিত পীড়িত বাংলার মর্মান্তিক বেদনা তার কণ্ঠে যোগালো ভাষা, জমিদার-জোতদার-মজুতদার মিলমালিকের পৈশাচিক হৃদয়হীনতা সেই ভাষাকে দিল ইস্পাতের কাঠিন্য, আর বর্বর পাপাচারের দুর্ভেদ্য অচলায়তন ভেঙে সুখী সুস্থ সুন্দর সমাজের বনিয়াদ পত্তন করার অকুতোভয় বিশ্বাস তাকে করল বিদ্রোহের আবেগে প্রতিস্পন্দিত। 'বিদ্রোহ আজ

বিদ্রোহ চারিদিকে। আমি যাই তার দিন-পঞ্জিকা লিখে। মরণের সঙ্গে জীবনের সুকঠোর সংঘাতে' সুকান্তের আত্মীয়তা শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল আশাবাদের বলিষ্ঠ উত্তরসাধক হয়েও শব-সমাকীর্ণ বাংলার মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে তাকে বলতে হয়েছিল—

"আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।" [রবীন্দ্রনাথের প্রতি

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস সুবিদিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-সংঘাত লালসা-বিরংসা বিভীষিকার বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘৃণ্য পৈশাচিকতা, মন্বন্তর মহামারীতে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালীর অসহায় প্রাণবলি ইত্যাদি কলঙ্কের কালিমাময় অধ্যায় একদিকে; অন্যদিকে সংগঠন-বদ্ধ মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম, ডাকতার ধর্মঘট, আজাদহিন্দ ফৌজ ও নৌবাহিনীর বিদ্রোহ ইত্যাদি অগ্নিক্ষরা কাহিনী। মানুষের অগ্রগমনের সেই অধীশ্বর ইতিহাস অনির্বাণ দীপশিখার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে সুকান্তর কবিতায়। শুধু মৃত্যু আর পরাজয় নয়। বিপ্লবের জয়শঙ্খ বাজানোর কঠিন গুরুভার স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিল এই যুগসচেতন কবি। তাই সে বলতে পেরেছে—

"আজকে মজুরভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐকতান।
অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গীকাব্য এ মাটির বুকে।" [বিবৃতি

অথবা স্থির প্রত্যয়ে সে ঘোষণা করে—

"আর মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন॥" [ঐতিহাসিক

দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য মানবকে আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে না হলে পুড়ে ছাই হবে পৃথিবী। তাঁর ঐতিহাসিক আহ্বানে আরও অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকের মতো সানন্দে সাড়া দিল সুকান্ত।

নারীঘাতী শিশুঘাতী কুৎসিত—বীভৎসকে শুধু ধিক্কার দিয়েই ক্ষান্ত হল না সে, রৌদ্র-জ্বালা ভাষায় চ্যালেঞ্জ জানাল ঘাতক প্রতিপক্ষকে—

"শোন্ রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার !
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার ?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সেকথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনও ভুলিতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।" [বোধন

এ যেন বিপুল জনতার প্রতিনিধিরূপে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা, আত্মবিশ্বাসে অবিচল যুগ যুগ সঞ্চিত প্রচণ্ড ক্রোধের বিরাট বিস্ফোরণ। ভারতবর্ষের কৃষাণ-মজুর তখন সেই শিকল-ছেঁড়ার ক্ষমাহীন সংগ্রামে ব্রতী। সেই লড়াইয়ে শামিল হয়েছে নীচুতলার লক্ষ্য কোটি নির্যাতিত মানুষ। প্রতিরোধের প্রাকার গড়ে উঠেছে গ্রামে-শহরে-বন্দরে-জনপদে। সন্ত্রস্ত ভূরিভোজীর দল আক্রমণের অস্ত্র হানছে নিত্য নূতন পথে। নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় ফেটে পড়ছে তাদের ক্রোধ আর জিঘাংসা। মানুষ তাই ভুলতে বসেছে মেশিনগানের সামনে জুঁইফুলের গান। জনতা জানে অত্যাচারীর দয়া নেই, শাসকের মমতা নেই—সবলের স্বরূপ জানে বলেই জনতার চোখে ঘুম নেই। যা গোপনে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়, মুখে বিপ্লবের গরম বুলি আউড়ে ব্যক্তিস্বার্থের ফিকিরে ঘোরে, সেইসব ঘোলা জলে মৎস্য শিকারীদের বিশ্বাসঘাতকতাকে মার্জনা করার বিলাস ছিল না তার। পুরাতন পূতিগন্ধময় পৃথিবীকে নবজাতকের বাসযোগ্য করে তোলাই যে তার পরম সাহিত্যিক কর্তব্য—

"এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংস স্তূপ পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।" [ছাড়পত্র

সুকান্তর কবিতার গুণগত উৎকর্ষের চুলচেরা বিচার বা প্রকরণগত সিদ্ধির সুনিপুণ বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। অকালমৃত কবির পক্ষে পরিণতির মহৎ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সুযোগ মেলে নি—একটি সুমহান সম্ভাবনা, একটি বিরাট প্রতিশ্রুতি দুর্ভাগ্যক্রমে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য কাব্যের মূল লক্ষ্য যদি মানুষের হৃদয় জয় করা হয় তবে সুকান্তর কাব্যসাধনা অসাধারণ সার্থকতায় মণ্ডিত। এবং সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই তার এই অতুলনীয় জনপ্রিয়তার জাদুকাঠি। এ শুধু মনভোলানো মুখের ভালবাসা নয়, গরীবের দুঃখে দু'চোখে সাঁতার-পানি আর মনে মনে স্বার্থ-সিদ্ধির ষোল-আনা মতলব নয় —সুকান্তর মানবপ্রেমে তার সমগ্র সত্তার সামগ্রিক অনুভবে। ব্যক্তিসীমাকে অতিক্রম করেছে তা সমবেদনার সকরুণ সুমধুর অনুপ্রেরণায় নিপীড়িত মানুষের জীবনে বহন করে এনেছে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্জীবনী সুধা। সূর্যের কাছে সে-আলোক-প্রার্থনা করেছে পথের পাশের ছেলেটির জন্যও। 'রানার' কবিতাটি এই সমপ্রাণতার অতি সুন্দর অতি উজ্জ্বল উদাহরণ। মানবিক বঞ্চনা ও রিক্ততার এমন আশ্চর্য-নিবিড় আলেখ্য বাংলা কবিতায় সুবিরল। রাত্রির নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দ্যকে প্রকম্পিত করে পৃথিবীর সংবাদ 'মেলে' তুলে দিচ্ছে ক্ষুধার্ত রানার। দিন যায় রাত যায়, মাস যায়, বছর যায়, বেড়েই চলে রানারের চিঠির বোঝা; কত গ্রাম কত বন-প্রান্তর পেরিয়ে জমে ওঠে তার রাতের পাড়ি। রাত্রির অন্ধকারে প্রেতের মতো দুনিয়ার খবর বয়ে বেড়ায় সে। 'কত সুখে প্রেমে আবেগে স্মৃতিতে কত দুঃখে শোকে' প্রিয়জনকে চিঠি লেখে মানুষ। সে খবর বহন করে যে রানার তার জীবনের দুঃখের কাহিনী 'জানবে পথের তৃণ'—

"ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে,
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্পদামে।

অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।" [রানার]

রানারের অভিশপ্ত জীবনের মর্মান্তিক ট্রাজেডি সারা বিশ্বের বঞ্চিত মানুষের পীড়িত আত্মার আকুল আর্তনাদ। একটি জীবনের বেদনার রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে সর্বজনীন মানুষের ভাবনার কল্পলোক। মানুষের বিরহী হৃদয়ের সকরুণ আর্তিকে সুমধুর সংগীতের মতো মানবতার আমদরবারে পৌঁছে দিয়েছে সে। এমন কথা কেউ বলে না; সুকান্তর সমস্ত কবিতাই সমান সার্থক ও সুন্দর ও রসোত্তীর্ণ। কিন্তু জীবনের প্রস্তুতি-পর্বে বোধন, রানার, কলম, ঐতিহাসিক, ছাড়পত্র ইত্যাদি এমন কতকগুলি কবিতা সুকান্ত লিখেছে যা বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে অমরতার দাবি রাখে। নতুন যুগের যে শুভ উদ্বোধনের বাণী সে পরম প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেছে তার আবেদন ও উজ্জ্বলতা দিনের পর দিন বেড়ে যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

৫

নিতান্ত অকালে নির্বাপিত হয়েছে সুকান্ত-জীবন প্রদীপ। অথচ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় বড় বেশি প্রয়োজন ছিল সুকান্তর কাব্য-প্রতিভার। জীবনের নিঃসীম মমতায় সে ভালবেসেছিল মানুষকে, মানুষের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস নিয়ে সে বিদায় নিয়েছে সাধারণ মানুষের জগৎ থেকে। তার কবিতায় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা-নৈরাশ্যের, স্বপ্ন-কামনার মূল সুরটি সহজেই ধরা পড়েছিল। সচেতনতার এই কবচ, কুণ্ডল ছাড়া মাত্র একুশ বছর বয়সের জীবনে এমন দুর্লভ সাফল্য ও দেশজোড়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করা কখনই সম্ভবপর নয়। সুকান্তর কবিতা পড়তে পড়তে মনে পড়ে হাইনের কথা যিনি তার শবাধারে চেয়েছিলেন তরবারি; মনে পড়ে মায়াকফ্‌স্কির কথা যার কণ্ঠে ফেটে পড়েছে বিপ্লবী রাশিয়ার রণহুংকার। বেঁচে থাকলে সুকান্তও কি হতে পারতো না বিপ্লবী ভারতের চারণ কবি? মায়াকফ্‌স্কির কবিতার মূল সুরেরই অনুরণন যে কবিতায়। যেমন সুকান্তর কবিতায়—

"হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যে কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।

প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।" [হে মহাজীবন]

এর সঙ্গে তুলনায় মায়াকভ্‌স্কির সুবিখ্যাত উক্তি ;

What is Faust to me ?
A fiery rocoet
Slithering with Mephistopheles on the heavenly parquet.
I know
A nail in my boot that's hurting
It nightmarish more then the fantasy of Goethe.

আবার সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে একান্ত হয়ে সুকান্ত ঘোষণা করে তাঁর বিপ্লবী শপথ—

"প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
দেখ আজ তারা সবেগে সমুত্থিত ;
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।"

তুলনীয় রাশিয়ার বিপ্লবী কবির বজ্রকণ্ঠ ঘোষণা—

All my ringing poetic power.
I give to you attacking class.

অথবা মনে পড়ে ভিয়েৎনামের মহানায়ক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী ডাঃ হো চি মিনের কবিতার কথা। এই দার্শনিক রাজনৈতিক সৈনিক সন্ন্যাসী পরমপ্রাজ্ঞ মহাপুরুষ সুবিশাল কর্মযজ্ঞের মহাঋত্বিক। বন্দীজীবনের অবসরে লিখেছেন 'জেলখানার কবিতা।' একটু নমুনা—

"কালের হাওয়ায় কাব্যলক্ষ্মী-ইস্পাত প্রতিমূর্তি,
কবিতা লেখার হাতে যেন থাকে বারুদের তাজা গন্ধ…"

ভিয়েৎনামের অমর স্রষ্টাই কবিতার এই ভূমিকার কথা বলতে পারেন কারণ তিনি হাতেকলমে দুনিয়ার সেরা বিপ্লবী। সুকান্তর অপরিণত কবিজীবনের যে

বিশ্বাসের সূচনা লক্ষ্য করি তারই প্রত্যয় দৃঢ় পরিপক্ক রূপ আলোক-দূত হো'র কবিতায়—

"লড়তে জানতে হয়,
ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া
আমাদের এই যুগের কবিতা—
এবং কবিরা।" (সিদ্ধেশ্বর সেনের অনুবাদ)

বাংলাদেশের দুর্যোগের ঘনঘটা পূর্বাপেক্ষা ঘনীভূত। ভাঙা বাংলার এই ছিন্নমস্তা রূপ সুকান্তর সুদূর কল্পনারও অগোচরে ছিল নিশ্চয়ই। সে মানুষকে আশা দিয়েছে, ভালবাসা দিয়েছে, দিয়েছে ভাবী-যুগ-পত্তনের অবিচল প্রত্যয়। পূর্ববর্তী কবিরা সেই লক্ষ্য সাধনে কতখানি কৃতকাম সে অন্য আলোচনা। সুকান্ত স্পষ্টই বলেছে—

"যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবুও ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।" [আগামী]

সুকান্তকে চিনবার জন্য হো'র আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গের যবনিকা টানি—

"ঢেঁকিতে পাড় পড়ার সময় ধান
শত কষ্টেতে মরে ;
অথচ চাল ফুটে বেরুলেই, প্রাণ
সোনার অন্নে বাড়ে।
মানুষেরও বেলা অমনি, যে জগতে
আমরা আছি ;
দুর্ভাগ্যের আঘাত সয়েই সমস্ত বুক পেতে
মানুষের মতো বাঁচি।" (সিদ্ধেশ্বর সেনের অনুবাদ)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্ত ॥ সুবোধ চক্রবর্তী

সেদিন মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে যোগ করতে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের দেরি থাকায় হলের বাইরে বারান্দায় আনমনে দাঁড়িয়ে আছি। পনেরো-ষোল বছরের একটি ছেলে একের পর এক দেওয়ালে টাঙানো-ছবিগুলি দেখছিল। আঙুল দিয়ে একটা ছবি দেখিয়ে তার মাকে বলল—দেখ মা, রবীন্দ্রনাথের পাশে কী সুন্দর একটা ছোট্ট ছেলে দুষ্টুমিভরা হাসি-হাসি মুখে বসে আছে। সুন্দর দেখাচ্ছে।

কথাটা আমার কানে যেতেই ফিরে তাকালাম। কেন জানি না এক-পা দু-পা করে ছেলেটির ঠিক পাশে গিয়ে তার কাঁধে একটা হাত রেখে দাঁড়ালাম। নিতান্ত কৌতূহল বশে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ঐ ছেলেটিকে চেনো না ?

না তো—ছেলেটি উত্তর দিল।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

চিনতে না পারায় আমি দুঃখিত।

মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে আসলে বিশ্বকবির এক ছবি তোলা হয়। ছেলেটি যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল।

আমি বলে উঠলাম, না না এতে লজ্জার কিছু নেই।

এটা ওঁর খুব ছোটবেলার ছবি তো সে জন্য যারা জানে না তাদের পক্ষে চেনা সত্যি কষ্টকর। তুমি ওঁর কবিতা ও বই পড়েছো। ছেলেটি বলল, আমি এ বছর হায়ার সেকেণ্ডারী-পরীক্ষা দিয়েছি। যদিও আগে কিছু কিছু পড়া ছিল, কিন্তু পরীক্ষার পর ওঁর লেখা বইগুলি বার বার পড়েছি, তবু আবার পড়তে ইচ্ছে করে। তাছাড়া ওঁর জীবনীও দু-একটা বইতে পড়েছি। আমি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে বললাম—আমি তোমার মুখ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই। তুমি কি আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করবে ? ছেলেটি নম্রভাবে উত্তর দিল—আমি জানি না আপনি কে, আপনাকে সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বলে কতখানি আনন্দ দিতে পারবো তাও জানি না। তবু আমি কিছু বলবো। কারণ সুকান্তের কথা কারো কাছ থেকে শুনে, কারো সঙ্গে আলোচনা করে নিজে আনন্দ পাই। এই বলে পাশের একটা বেঞ্চ দেখিয়ে বলল, চলুন না ওখানে বসা যাক।

আমি ছেলেটিকে নিয়ে বেঞ্চটিতে বসলাম। ও বলতে শুরু করল, আমি এক মনে শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করলাম। ভারতের এক দুর্দিনে সুকান্তের আবির্ভাব ঘটেছিল। জন্ম লাভের পর থেকে নিশ্চিন্ত আরামে কাটাবার মতো এতটুকু শান্তি কোথাও খুঁজে পান নি। দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় ক'রে জন্মেছিলেন, স্বল্পস্থায়ী জীবনে কোনোদিনই এ বোঝা এতটুকু লাঘব হয় নি। চরম দারিদ্র্যেই টেনে এনেছিল তাঁর অকাল মৃত্যু। কোনোদিন অনাহারে, আবার কোনোদিন অর্ধাহারে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পদাস্ফালন কোনোদিনই তাঁর দৃঢ় মনে এতটুকু অবসাদ আনতে পারেন নি।

অন্যদিকে ভারতের চরম দুর্দিন। দেশ-মাতৃকা বিদেশী শয়তানের পদানত, লাঞ্ছিত-চির বঞ্চিত। কখনো ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর বুটের আওয়াজও শয়তানদের প্রদত্ত শাস্তি, বন্যা, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ, আবার কখনও বা বিদেশী যুদ্ধ বিমানের নির্বিবাদে ভারতের আকাশে আনাগোনা।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুকান্তের মনকে কম বিষিয়ে তোলে নি। এই তো তার ঘরে বাইরের অবস্থা।

যাক, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পাশে সুকান্তের ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে সুকান্ত যে কবিতাগুলি লিখেছিল আজ শুধু সেগুলিই আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে। ভবিষ্যতে আবার কোনো দিন সুযোগ আসলে আলোচনা করা যাবে, কি বলেন ?

সে ভার আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম, তোমার যে অংশটুকু বলতে ভাল লাগে তা-ই বলো।

আচ্ছা আচ্ছা, বলে একটু মুচকি হেসে সে আবার বলতে শুরু করল।

সুকান্তের শৈশবকালেই তাঁর মা সুনীতি দেবী তাঁকে ফাঁকি দিয়ে চলে যান। দারিদ্র্য-পীড়িত পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য মাতৃহারা নাবালক পুত্রের লালন-পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন নি। সুকান্ত তাঁর একান্ত অসহায় অবস্থায় জ্যাঠতুতো বোন রাণীদিকে একমাত্র অবলম্বন হিসাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। রাণীদিও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। রাণীদির অপত্য স্নেহে সুকান্ত শরীরে ও মনে বেড়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কবিসত্তার বীজ হয়তো রাণীদি তাঁর মধ্যে বপন করেছিলেন। তখন থেকেই অঙ্কুরিত বীজ একদিন সবে ডালপালা বিস্তার করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাসে অকালেই শুকিয়ে, কুঁকড়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে

গেল। রাণীদি তাঁকে কোলে ক'রে বেড়াতেন, আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথের নানা ছড়া ও কবিতা। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলো। রাণীদির সঙ্গে সুর মিলিয়ে শিশু সুকান্ত আধো আধো স্বরে কবিতা বলতেন। মাঝে মাঝে রাণীদি প্রশ্ন করতেন, সুকান্ত, এটা কার কবিতা? সঙ্গে সঙ্গে সুকান্ত লাফিয়ে বলে উঠলেন, "লবীন্দ্র নাথেল"। এমনিভাবে শিশু সুকান্তের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। তিনি চেয়েছিলেন কবিতা লিখতে, কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথের মতো বড় কবি হতে। তাই তো কিশোর বয়সে বন্ধু অরুণাচল বসুকে কৌতূহলবশত একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, তোরা আমায় হিংসা করিস নারে? তাঁর উচ্চপ্রশংসনীয় প্রতিভাকে যে হিংসা না ক'রে পারা যায় না এ কথা অরুণাচল সুকান্তকে জানালে সুকান্ত একগাল হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "সেদিক থেকে চিন্তা করলে তো আমি রবীন্দ্রনাথকেও হিংসা করি"। এটা ধ্রুব সত্য কথা। রবীন্দ্রনাথকে আজীবন হিংসা ক'রে গেছেন। কী অদ্ভুত সে হিংসা তাই তো তাঁকে দেখতে পাই রবীন্দ্র-অন্তঃপ্রাণ হিসাবে। কিন্তু বিধাতা কী নিষ্ঠুর! রাণীদির উপরও তার দৃষ্টি পড়ল। রাণীদিও সুকান্তকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কয়েকটা বছর কেটে গেল। সুকান্ত মাতৃস্নেহবঞ্চিত অবুঝ কাঙাল মন কুড়িয়ে পেল যেন তার হারিয়ে যাওয়া মাকে (সরলা বসু—বন্ধু অরুণাচল বসুর মা)। সুকান্তের বহুদিনের সঞ্চিত ব্যথা বেদনায় সরলা বসুর মাতৃসুলভ অকৃত্রিম স্নেহের প্রলেপ তাকে চাঙ্গা ক'রে তুলল।

সরলা বসু ছিলেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। কবিতা লেখার অভ্যাসও ছিল। সুকান্ত তাঁর কাছ থেকেও নানাভাবে কবিতা লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নানা গল্প পাঠ।

১৩৫০ সালের ভারতের বুকে নেমে এল এক নিদারুণ অভিশাপের করাল মূর্তি। একের পর এক দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্যা। তার উপর তো রয়েছে ইংরেজ মহামানবদের নিষ্ঠুর বুটের দাম্ভিক পদাস্ফালন। অকালে যুদ্ধ জাহাজের ঘন ঘন চোখ রাঙানি। পঞ্চাশের মন্বন্তর সুকান্তকে সর্বাধিক ব্যথিত করেছিল। মর্মাহত হলেন সুকান্ত, মন্বন্তর তাঁর সদ্য বিকশিত কিশোর-চিত্তে যে দাগ কাটল জীবনের শেষ দিনেও তা এতটুকু ম্লান হয় নি। তাই তো জন-দরদী বন্ধুকে

ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে দ্বারে দ্বারে, পাড়ায় পাড়ায়। অনাহার, অর্ধাহার ক্লিষ্ট দুর্বল শরীরকে বার বার টেনে গেছে পীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত অভিশপ্ত মানবদের দ্বারে দ্বারে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লাঞ্ছিত জনগণের করুণ আর্তনাদ সেদিন হয়েছিল সুকান্তর লেখনীর মাধ্যমে—

> "রবীন্দ্রনাথের দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
> জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
> দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
> প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।..."

[পরে অবশ্য প্রথম লাইনটি রূপ নেয় আমার সোনার দেশে অবশেষে...] এ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্য সবটুকু প্রকৃতিকে দায়ী করলে হয়তো ভুল হবে, এ দুর্ভিক্ষ মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর সবকয়টি দেশ রক্ত-পিপাসায় মেতে উঠল। সবল লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করল দুর্বলের উপর। রক্তের জোয়ারে সাঁতার কাটতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলি। সেই জোয়ার ভারতকে ক্ষমা করে নি—আঘাত করল ভারতের ভঙ্গুর দুর্বল তটভূমিতে। ইংরেজ সরকার সৈনিকদের জন্য খাবার মজুত করল। আর যা অবশিষ্ট এদিক ওদিক পড়েছিল তাও গিয়ে আশ্রয় নিল মজুতদার ও চোরাকারবারীর গুপ্তকক্ষে। দেখা দিল খাদ্যাভাব। স্বার্থান্বেষী লোভাতুর মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট মানুষের দুর্দশায় সুকান্ত অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তাই তো 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় সুকান্ত ব্যক্ত করেছেন—

> "এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
> প্রত্যেক নিভৃতক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
> এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
> নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।...
> তবুও নিশ্চিন্ত উপবাস
> আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
> আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
> প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।"...

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলিও সুকান্তের মনে বিশেষ আসন লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের ধরণ অনুসরণ ক'রে সুকান্ত লিখেছিলেন "অভিযান" নামে একটি গীতিনাট্য। অভিযান নাটকটি যদিও রূপকথা, কবির চিন্তাধারা

কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রূপকথার গল্প হিসাবেই প্রকাশ পায় নি। নাটকটি কবি গেঁথেছেন পঞ্চাশের মন্বন্তরের কিছু ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার বুকে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল সে দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের তথা ভারতের বাতাসকে করেছিল বিষাক্ত, কলুষিত। তাতে বাংলা মায়ের মুখে যে শোকের ছায়া, বুকে যে দুঃসহ যন্ত্রণা, দিকে দিকে মৃত্যু, ব্যাধি অনাহার ও হাহাকারের যে চিত্র কবি উপলব্ধি করেছেন যে বাস্তব চিত্রেরই আঙ্গিকে লেখা "অভিযান" নাটক। সুকান্তর মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি শোনার জন্য তাঁর বন্ধু-বান্ধব পরিচিতিদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ছিল। অনেকে আড়াল থেকে তাঁর কবিতা পাঠ শুনে চমকে উঠতেন। যেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আবৃত্তি করছেন। আর হাতের লেখা? সুকান্তের বাংলা হাতের লেখা দেখে বাংলাদেশের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকই রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা সন্দেহ করে ভুল করতেন। পরে অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের লেখা যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে নিজস্ব সত্তা লাভ ক'রে।

১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (বাংলা ২২শে শ্রাবণ) বিশ্ব কবির মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন বাংলা তথা ভারতবর্ষ। এ শোকের বন্যায় অভিভূত হল পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ। কবিগুরুর বিচ্ছেদ-বেদনায় শোকাতুর মানুষ দলে দলে কাতারে কাতারে গিয়ে হাজির হতে লাগল কবিগুরুর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সুকান্ত নিজেও ছিলেন শোকসন্তপ্তদের একজন। কবিগুরুর বিয়োগ ব্যথায় সুকান্তের কিশোর কবিমন কতখানি ব্যাকুল হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করার ভাষা আমার নেই।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে শোকযাত্রা হলে ফিরে এসে সুকান্তের একান্ত প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর বেদনাতুর মনের কথা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই তার লেখা "যাত্রা" কবিতায়।

> "অমৃতলোকের যাত্রী হে অমর কবি, কোন প্রস্থানের
> পথে তোমার একাকী অভিযান। প্রতিদিন তাই
> নিজেরে করেছে মুক্ত, বিদায়ের নিত্য আশঙ্কায়"···

আর এক জায়গায় কবি লিখেছেন—

> "···চেয়ে দেখি চিতা তব জ্বলে যায় অসহ্য দাহনে,
> ···তুমি কবি, তুমি শিল্পী, তুমি যে বিরাট, অভিনব
> সবারে কাঁদায়ে যাও চুপি চুপি একী লীলা তব॥"

রবীন্দ্রনাথের এক জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান উপলক্ষ্যে সুকান্ত "পঁচিশে

বৈশাখের উদ্দেশে" নামে কবিতাটি লিখেছিলেন। এ কবিতায় সুকান্ত তাঁর মনের এক বিশেষ ভাব ব্যক্ত করেছেন—

"আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ,
আর একবার তুমি জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।···
এবার নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্নচোখে, কণ্ঠে গণ সংগীতের সুর;
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুল নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।"

স্মৃতি নয় ॥ রাম বসু

সুকান্ত আমার অপরিচিত ছিলেন না। আবার তার সঙ্গে আমার এমন গভীর পরিচয়ও ছিল না যার জোরে স্মৃতিকথা লিখতে পারি। দেখাশুনা হয়েছে, কথাবার্তাও হয়েছে, কিন্তু তা নিতান্তই ভাসা-ভাসা। তার কারণ অনেক আছে। আমরা একসঙ্গে ছাত্র-ফেডারেশনের কাজ করেছি। ও এক কেন্দ্রে আমি অন্য কেন্দ্রে। তারপর ওকে বসিয়ে দেওয়া হল কিশোর বাহিনীর কাজে। তবু বড় বড় সভায় দেখেছি ও বসে আছে ওর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। ওর অসুখ করল। থাকল শ্যামবাজারের বাড়িতে। ঘরটা এখনো মনে আছে। ওর বিছানার সামনে জানালা। জানলোর ওপারে পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে চারা অশ্বত্থ গাছ। শুনেছি এই গাছটাই ছিল ওর বিখ্যাত কবিতার উৎস। এইরকম টুকরো কিছু স্মৃতি আছে। তা লিখে কি হবে? ওর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্র ধরে আমি ওর চরিত্রের কোনো কিছুতে আসতে পারি না। তাই, ওই প্রসঙ্গ থাক।

'ছাড়পত্র' কবিতাটা প্রকাশিত হয়েছিল পরিচয় পত্রিকায়। কলেজে ওই কবিতা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ হল আমাদের মধ্যে। মনে আছে, আমাদের 'দাদা' স্থানীয় কিছু কর্মী-নেতা ওই কবিতাকে ঠিক খোলা মনে নিতে পারে নি। পারে নি, তার সদম্ভ ঘোষণার জন্য।—'তারপর হবো ইতিহাস।' দাদারা বলেছিলেন, এত সাহস আসে কি করে?

আজ তার সাহসের কথা আমারও মনে হচ্ছে। সত্যিই, কোন্ সাহসে সে এতবড় কথা বলেছিল? যা বলেছিল, তা তো সে হল-ই। সুকান্ত আজ ইতিহাস। কারো ক্ষমতা আজ আর নেই সেই ইতিহাসকে মুছে দেয়।

ছাত্র ফেডারেশনের কাগজ, দ্য স্টুডেণ্ট-এ গৌতম চট্টোপাধ্যায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—ইনট্রডিয়ুসিং সুকান্ত ভট্টাচার্য। আমার মনে আছে নানা কথার মধ্যে গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—হিজ ভয়েস অলওয়েজ রিংইং এগেন্স্ট দ্য ক্লাস।

শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে কবিতা লিখছে সুকান্ত। আবার সেই দাদারা বিব্রত বোধ করলেন। তখন আমাদের নীতি ছিল, গান্ধী-জিন্না এক হও। আমরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতাম গান্ধী-জিন্না এক হলেই সাম্রাজ্যবাদ এদেশ ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না। এই সময় শ্রেণীর কথা তুললে ওরা ঘাবড়ে গিয়ে আর মিলনের পথে পা দেবে না। দাদারা তাই ভীষণ বিব্রত।

আমাদের ভাবনা-চিন্তা ঘোলাটে থাকলেও সুকান্ত সঠিক ভাবে ঘোলাটে আবিলতা কাটিয়ে অনির্বাণ সত্যকে ধরতে পেরেছিল—কংগ্রেস লীগ এক হও এই ভ্রান্ত তরী আঁকড়ে ধরেও। সুকান্ত বেশ কিছু আবেগ দীপ্ত কবিতা লিখেছেন যার মূলে আছে ওই ভ্রান্ত নীতি। কিন্তু সেগুলো যখন শরীর নিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন দেখা গেছে তার আবেদন ওই নীতির মধ্যে আটকে নেই, সে ছড়িয়ে পড়েছে জীবনের সার্বিকতায় এবং এখানেই সার্থক কবিতার পরীক্ষা।

যা হোক, সেই অনির্বাণ শ্রেণীসংগ্রামের সত্য গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় প্রক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে ধরা পড়েছে—শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল সুকান্ত। মানবিক স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য সে পেয়েছিল তার সময় থেকে, পরিবেশ ও জীবনের বাস্তবতা থেকে।

এত সাহস ছোকরা পায় কোথা থেকে? এই কথার এই উত্তর: সাহস পেয়েছিল যেহেতু সে শ্রেণীর ভূমিকা বুঝতে পেরে ইতিহাসের ইংগিতকে মানতে পেরেছিল কবির নিষ্ঠায়। যখন নেতারা ভুল বোঝাতে ব্যগ্র তখন সুকান্ত কিন্তু ভুল করে নি। সব কিছু সে তত্ত্ব দিয়ে বোঝে নি। বুঝেছে হৃদয় দিয়ে। তাই সে ইতিহাস।

সুকান্ত না থাকলেও তার সাহস রয়ে গেছে। বড় বড় নামীগুণী সমালোচক এবং পত্র-পত্রিকা আজ যখন বাংলা কবিতায় তার ভূমিকাকে ঘোষণা করতে দ্বিধান্বিত, আলোচনায় তার নাম যখন প্রায় অনুল্লেখিত, তখন 'সুকান্ত সমগ্র'

সব পুরোহিতদের উপেক্ষাকে উপহাস করে সাধারণ্যে আদৃত। সুকান্ত আশ্চর্যভাবে মধ্যবিত্ত পাঠকদের স্পর্শ করেছে। আমি সশ্রদ্ধ ঈর্ষায় তাকিয়ে থাকি।

বাংলা কবিতা যখন বন্ধ্যা বুদ্ধিচর্চায় আবদ্ধ, সাম্যবাদকে স্বীকার করাও যখন নিতান্তই বুদ্ধির পরিধিতে সীমায়িত, সেই সময় সুকান্ত প্রাণ-কল্লোলে সব দ্বিধা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বিস্তৃত হল পাঠকের পরিধি। নীরক্ত বুদ্ধিচর্চার জায়গায় দেখা দিল রক্ত-মাংসের জীবনচর্চা। ও পেরেছিল, কারণ, ও শ্রেণীর ভূমিকা বুঝেছিল।

স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে আজ এই কথাই মনে হচ্ছে।

সেই আশ্চর্য দিন ॥ শিশির ভট্টাচার্য

তখন আমাদের বয়সই বা কত। সবেমাত্র স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে কলেজে ঢুকেছি। বিদ্যাসাগর কলেজে। হঠাৎ একদিন শুনলাম সলিল চৌধুরী নামে একজন শিল্পী সংগীত-জগতে আলোড়ন এনেছেন।

আমার এক বন্ধু শান্তি চৌধুরী তিনিও ভাল গান গাইতেন। তাঁর মুখে শুনলাম, যাবেন গণনাট্য সঙ্ঘের সলিল চৌধুরীর দেওয়া সুরের গান শুনতে?

যাব।

কার গান জানেন? কার লেখা?

কার?

আশ্চর্য কণ্ঠে জবাব দিলেন বন্ধু, সুকান্ত ভট্টাচার্যের।

সুকান্ত ভট্টাচার্য। কবিকিশোর সুকান্ত যাঁর 'ছাড়পত্র' বের হল, অথচ তিনি দেখে যেতে পারলেন না। সেই কবি?

আমার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

কদিন আগে বেলেঘাটায় গিয়েছিলাম। ওখানকার দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন সুকান্ত। ওঁর একটা ছবি দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র জয়ন্ত মিত্র বললেন, জানেন কবি সুকান্ত আমাদেরই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

শুনে রোমাঞ্চিত হলাম। আমি এক দৃষ্টিতে সুকান্তর ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আশ্চর্য, কিশোর কবি সুকান্তর আজ বাংলাদেশের জনচিত্তকে জয় করেছেন।

সুকান্ত ছিলেন এক দুঃসাহসিক কবি যাঁর লেখনীতে বিস্মিত হয়েছে পাঠকসমাজ। মনে হল, এই রাস্তায়, ঐ বেলেঘাটার স্কুল-বাড়িটার প্রাঙ্গণে সুকান্তর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, তার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি।

বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র জয়ন্ত মিত্র বললেন, কিশোর কবি সুকান্তর কথা।

বললেন তাঁদের স্কুলের সুকান্তর গল্প। শুনেছেন মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে।

গল্প শুরু হল।—

বেলেঘাটার দেশবন্ধু হাইস্কুল। স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করবে। পত্রিকায় লেখে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা। কিছু কিছু ছাত্রদের আঁকা ছবিও ঠাঁই পায় পত্রিকায়। পত্রিকার নাম 'সপ্তমিকা'। যদিও একজন শিক্ষকমশাই এ বিষয়ে ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করেন তবুও প্রায় সব দায়িত্বই পালন করতে হয় একটি ছাত্রকে। তার নাম সুকান্ত। সুকান্ত ভট্টাচার্য। তিনিই পত্রিকার সম্পাদক। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র কতই বা তার বয়েস!

'সপ্তমিকা'কে নিয়ে ক্লাসের ছাত্রদের কি হৈ-চৈ। আর সুকান্তকে নিয়ে কত আলোচনা। কত গল্প।

স্কুলের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ক্লাসের পড়া। এক এক মাস্টারমশাই আসেন এক এক ক্লাসে। বিষয়ের বদল হয়।

ক্লাসের সব চেয়ে পেছনের বেঞ্চিতে বসে কথা বলে চলেছে সুকান্ত আর তার এক বন্ধু। বোধহয় আলোচনা হচ্ছে কোন লেখার বিষয়ে। মাস্টারমশাই যে পড়িয়ে যাচ্ছেন সেদিকে খেয়াল নেই।

আলোচনা করতে করতে সুকান্ত আর তার বন্ধু উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে কথা বলছে। তখন শিক্ষকমশাই ক্লাসের পড়া থামিয়ে চলে আসেন সুকান্ত আর বন্ধুর দিকে। মাস্টার খুব রেগে গেছেন। হয়তো কোন শাস্তি দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। এমন সময় ঐ ক্লাসের একটি ছাত্র বলে ওঠে সুকান্তকে দেখিয়ে, স্যার—খুব ভালো কবিতা লিখতে পারে।

বিস্ময়ের সীমা নেই শিক্ষকের। কিছু না বলে তিনি সুকান্তকে বলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

ক্লাসের পর সুকান্ত এসে হাজির হল। তার মনে হল, হয়তো বকুনি দেবেন মাস্টারমশাই।

মাস্টারমশাই বললেন, তুমি কবিতা লেখ।

—হ্যাঁ।

মুখে প্রসন্ন হাসি হেসে কাছে টেনে নিয়ে বললেন মাস্টারমশাই, তোমার নাম কি?

কিশোর কবি সুকান্ত জবাব দিলেন,—সুকান্ত ভট্টাচার্য।

প্রাক্তন ছাত্র জয়ন্ত মিত্র আমাকে বললেন, জানেন সুকান্তর আরেক বন্ধু অরুণাচল বসু ছিলেন এই বেলেঘাটায়। সুকান্তর সঙ্গে অরুণাচলের ছিল অভিন্ন হৃদয়। অরুণাচলের মা সরলাদেবীও নিজের ছেলের মতো ভালবাসতেন সুকান্তকে।

আমি জয়ন্তর মুখ থেকে সুকান্তর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনলাম। জয়ন্ত বললেন, আমার বয়স আঠারো এখন। আমি সুকান্তর কবিতা পড়তে পড়তে মুখস্থ করে ফেলেছি। সুকান্তের আঠারো বয়সের কবিতা শুনবেন?

এই বলে জয়ন্ত বললেন,—

"আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা
এ বয়সের কেউ মাথা নোয়াবার নয়
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।"

আমার চোখ দুটো অজান্তে জলে ভরে উঠেছিল সেদিন।

মনে মনে ভেবেছিলাম, হায় সুকান্ত যদি আজ আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকতেন, তাঁর কবিতা আজ সারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত। মনে হল আমার, সুকান্ত যা দিয়েছেন তাই বা কম কি?

কিন্তু সে তো সেদিনের কথা।

আঠারো বছরের জয়ন্তের মুখে সুকান্তর কথা শুনেছি, ওর ফাইলে সযত্নে রক্ষিত ছিল ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে দৈনিক স্বাধীনতা। সুকান্তকে কেন্দ্র করে স্মৃতি সংখ্যা! স্বাধীনতার কিশোর সভার পরিচালনা করতেন সুকান্ত।

যতদূর মনে পড়ে সুকান্ত স্মৃতি সংখ্যায় দৈনিক স্বাধীনতায় বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রাখাল ভট্টাচার্যের লেখা ছিল।

স্পষ্টই মনে আছে জয়ন্ত সেদিন স্বাধীনতার সেই পাতাটা খুলে বিষ্ণু দের 'বিস্ময়কর সুকান্ত' আর অজিত দত্তের 'সুকান্তর অঙ্গীকার' লেখা দুটো বার বার

দেখিয়ে বলেছিল, দেখেছেন শিশিরদা, সুকান্তের সম্বন্ধেও বিষ্ণু দে কি লিখেছেন।

আজ জয়ন্তর সব কথা মনে নেই। সময় কালকে অতিক্রম সেই সব দিন অতিক্রম করে এসেছি আমরা।

সুকান্তর লেখা আর গান জানি আজ প্রতিটি মানুষের কাছে এক হয়ে গিয়েছে। মনে পড়েছে বিদ্যাসাগর কলেজের কমনরুমে সুকান্তকে নিয়ে আমাদের তর্কবিতর্কের শেষ ছিল না।

গণনাট্য সঙ্ঘের সলিল চৌধুরীর দেওয়া সুর আর সুকান্তর লেখা রানার' সে কি আশ্চর্য অনুভূতি। সে গান সারা শহর থেকে দূরে, গ্রাম থেকে গ্রাম্যন্তরে পৌঁছেছে। তারপর সেই গানের কথা নৃত্যনাট্য হল 'রানার' যার নৃত্যনাট্য পরিচালনা করেছিলেন শ্রীশম্ভু ভট্টাচার্য। সেই সুর, সেই গান, সেই নাচ, আমাদের তরুণ মনে এক আশ্চর্য অনুভূতি এনে দিয়েছিল। আজ স্বাধীনতার স্পর্শে তার তোরণদ্বারে এসে মনে পড়ে একদিন দেবব্রত বিশ্বাসের গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সুকান্তর সেই আশ্চর্য কবিতার সুরের ধ্বনি হয়েছিল :

"এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম।"

পরেও ঐ অবাক পৃথিবী কবিতাটিকে গানে কণ্ঠদান করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আর সে গান যে কি রকম জনপ্রিয় হয়েছিল তা কারও কাছে অজানা নয়।

সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুকান্তের 'রানার' জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। কবিকিশোরের কথাকে যেন আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছি। মনে হয়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে তার প্রতিধ্বনি। সেই ধ্বনি আজও ভেসে ওঠে :

"এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনদিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।"

সেদিনের সেই স্মৃতিমুখর দিনগুলি আজ অনুভব করতে গিয়ে মনে পড়ে স্বাধীনতার কিশোরপাতার পরিচালনা করতেন সুকান্ত। আর আমরা স্কুলের ছাত্ররা সেই স্বাধীনতার ছোটদের পাতায় সব আশ্চর্য আশ্চর্য ছড়া গান আর গল্প পড়তাম।

সেই আশ্চর্য দিন

ভবানী দত্ত লেনের কিশোর সভার সংগঠনে আমাদের সেইসব হারানো দিনগুলি আর ফিরে আসবে না ?

তারপর অনেক দিন পরে আমি একদিন ভবানী দত্ত লেনে দিলীপ ভট্টাচার্যের খবর নিতে গিয়ে সুকান্তর চলে যাওয়ার ইতিহাস শুনতে পেলাম। শুনতে শুনতে সেদিন আমার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিল, মনে হয়েছিল :

"আজ ভাবি মনে
শুরুতেই কেন শেষ
কেন মৃত্যু মুকুলের বনে।
এ কি ভাগ্য লিখা,
বই না লিখিতে বাদ যায়
বইয়ের ভূমিকা।"

(দৈনিক কিশোর সুকান্ত স্মরণে ১৯৪৭)

সুকান্তের তিরোভাবের পর অনেক বছর পার হয়ে গেছে। আমরাও এগিয়ে চলেছি সময় স্মৃতিকে বহন করে। কর্মপ্রবাহের অশান্ত তাগিদে আমাদের সেই ছেলেবেলার দিনগুলির কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। ভাবতাম, কিশোর দৈনিক পত্রিকার কথা, মনে আসত 'কিশোর বাহিনী'র কথা। আর মনে পড়তো এক কিশোর কবিকে। তিনি হলেন সুকান্ত। তাঁর কবিতার বইগুলি তখনও জনপ্রিয় হয় নি, তবুও লোকের মুখে মুখে, স্কুলপাঠ্যের তালিকায় রেকর্ডে সুকান্তর কবিতা ও গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

জনপ্রিয় বলি কেন, জনতার মধ্যেও তিনি যেন প্রাণ পেয়েছেন। তাই বিস্ময়ে ভাবি একমাত্র সুকান্তই একটা যুগের প্রতিনিধি যেন। মনে হয়, তাঁর জীবন কত সংক্ষিপ্ত, তবুও সেই সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে দিয়ে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয় আমাদের। তবুও আমাদের মনে আজো সুকান্তর প্রতি আমরা কি তাঁর যোগ্য মর্যাদা দিয়েছি।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বর্গত কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠির কয়েকটা কথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮. ৫. ৫০ তারিখে সুকান্তর স্মৃতি তর্পণ কমিটিকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—···সমগ্র দৃষ্টিতে সুকান্তর সৃষ্টির বিচার আজ বিশেষভাবে দরকার। গ্রহণ করার দিক থেকে ধরলে আমরা সত্যিই সুকান্তের কাছে অপরাধী হয়ে আছি—ঠিকভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারি নি, যথাযোগ্য মূল্য দিই নি।

শ্রদ্ধেয় স্বর্গত কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আক্ষেপটুকু আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। তবুও আজ আমাদের সুকান্তকে চেনার ও বোঝার দিন এসেছে। আজ সুকান্তর স্মৃতিকথা লিখতে–গিয়ে ভাবি একটি জীবনের স্বপ্ন সাধ ভেঙে গুঁড়িয়ে অকালে যে কবি চলে গেলেন, তাঁর সৃষ্টির বিচার বা তর্কের কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু আজ দরকার কবিতাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

শুনেছিলাম সুকান্তর কবিতাও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার দৃষ্টান্তও দেখেছি। কিন্তু আরও ব্যাপক আরও বিস্তার করা যায় না কি? আমরা সুকান্তর অনুরাগী পাঠক, তাঁকে দেখবার বা তাঁর সঙ্গে মিশবার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু যাঁরা দেখেছেন যাঁরা মিশেছিলেন, তাঁদের ওপরেই সে ভার রইল সুকান্তকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার।

আমার প্রবন্ধ শেষ করবার আগে আর একটি ঘটনা না লিখে পারছি না।

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে একটা কাজের জন্য আমাকে বিহারে যেতে হয়েছিল। গিয়েছিলাম বিহারের এক অখ্যাত গ্রামে। নাম তাঁর ডাঙ্গোয়াপোষী। সেই গ্রামে বাংলা ভাষায় কথা বলার লোক কম। বাকি সব হিন্দি ভাষায় কথা বলেন।

একটা ছোট্ট এক অবাঙালীর চায়ের দোকানে সুকান্তের একটা ছবি দেখেছিলাম। ন্যাশনাল পাবলিশার্সের একটা ক্যালেণ্ডারে সুকান্তের একটা বড় ছবি। আর সেই ছবিটা টাঙানো হয়েছে বিহারের এক চায়ের দোকানে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে দোকানের মালিককে প্রশ্ন করলাম, ছবিটা মানে ক্যালেণ্ডারটা কি করে এল?

আমার কথা শুনে দোকানদার হিন্দি আর বাংলা মিশিয়ে আমাকে যা বললে তার অর্থ হল এই যে:

"কেন? আপনি কি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম শোনেন নি? ইনি তো আপনাদেরই বাংলাদেশের কবি। আমরা সুকান্তের কবিতার ভক্ত। ওঁর লেখা কবিতার অন্য অনুবাদও আমরা পড়েছি আগ্রহে। বাংলা কবিতাও পড়েছি। আমি বাংলা পড়তে পারি। এ ছবিটা কলকাতার এক বইয়ের দোকান থেকে বই কিনতে গিয়ে পেয়েছিলাম। সেই থেকেই ঐ ছবিটা আমার কাছে আছে। আমাদের এখানে যাঁরা সাহিত্য ভালবাসেন, কবিতা পড়েন তাঁদের আমি সুকান্তর কথা বলি।"

আমার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। একদিকে আনন্দ আর একদিকে বেদনা-মিশ্রিত মনে হল আমার, শহর থেকে দূর বাংলা থেকে ভারতে, ভারতের এক গ্রামান্তরে এক ছোট্ট দোকানের মালিক সুকান্তকে তার মনের কাছে ধরে রেখেছেন। সুকান্ত আজ শুধু ইতিহাস নয়, সুকান্ত আজ সমগ্র জনতার জীবনের কাছে জীবন্ত। তারপর অনেক দিন পর কলকাতায় ফিরে এসে আমার বন্ধুদের কাছে এ ঘটনার উল্লেখ করতে এক বন্ধু বললেন, সরলা বসুর একটা লাইন মনে আছে তোমার? সুকান্ত বাংলার পল্লীগ্রামের কথা বলতে না পারলেও বিহারের পল্লীগ্রামের কথা চমৎকার বলতে পারতেন।

সুকান্তকে নিয়ে অনেকেই অনেক কথা লিখবেন। আমিও লিখতে গিয়ে শুধু একটা কথাই বার বার মনে পড়ছে—"গ্রহণ করার দিক থেকে ধরলে আমরা সত্যিই সুকান্তর কাছে অপরাধী হয়ে আছি—ঠিকভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারি নি, যথাযোগ্য মূল্য দিই নি।"

সুকান্ত ও আমি ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

খুব সম্ভব ১৯৪৪ সালের একেবারে শেষে অথবা ১৯৪৫-এর গোড়ায় সুকান্তর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার। 'অরণি' পত্রিকার আপিসে। চেহারায় ছোটখাট, শ্যামলা রঙ্। লাজুক-লাজুক মুখ। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত, চোখে-পড়ার-মতো বিশিষ্ট। কথা কম বলত। ১৯৪৫-১৯৪৭-এর মধ্যে আরও কয়েকবার দেখাশোনা। ওই 'অরণি' আপিসে, ৪৬নং ধর্মতলায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘে, 'স্বাধীনতা' দৈনিকের আপিসে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৬ সালে প্রগতি লেখক সঙ্ঘে একবার ওকে স্বরচিত 'রানার' কবিতাটি পড়তে শুনি। বয়সের তুলনায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বোধির গভীরতা বেশি বলে মনে হত। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয় নি। জানাশোনা, এই পর্যন্ত।

তিরিশের রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার মদে মাতাল তখন। সুকান্তকে একটু যেন মামুলি, একটু বেশি রবীন্দ্রানুগ মনে হয়েছিল। অবিশ্যি 'প্রার্থী' ও 'লেনিন'-এর মতো কবিতা তখনই মুগ্ধ করেছিল। কবিত্ব, রচনানৈপুণ্য, সততা, বুদ্ধিমত্তা চোখে পড়েছিল। বয়সের তুলনায় রচনায় পরিণতির শীলমোহর মনেও

ধরেছিল। তবু সব মিলিয়ে ঠেকেছিল কেমন যেন একরঙা। যেন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য আর কবিতায় তার মজাদার রঙ্-ফেরার একটা অভাব। বয়সের বাঁকে বাঁকে কবিতার নদী ভাটির টানে তীব্রতা হারায় হয়তো, কিন্তু গভীরতা পায়। সে-সুযোগ সুকান্তর জীবনে আসে নি। তরুণ সুকান্ত তাই অভিভূত করে নি। ভালো লেগেছিল, এই পর্যন্ত।

তারপর একসময় নিজেরই লেখার গরজে, বিকাশের তাগিদে মনের মধ্যে নতুন বোধেরভাঙা জাগল। রবীন্দ্র-রচনার শক্ত মাটিতে পা রেখে আধুনিক চেতনার দিকে হাত বাড়ানো আর তত মামুলিয়ানা ঠেকল না। দেশে-কালে-প্রাত্যহিকতায় ছড়ানো মানুষের সুখ-দুঃখ-আবেগের ব্যাপ্ত পটভূমি কবিতার বিষয় বলে পূর্ববর্তী যে প্রত্যয় ছিল তা দৃঢ়তর হল। মনে হল কবিতাকে একই সঙ্গে আধুনিক আবার জনপ্রিয় হতে হলে, আধুনিক কবিতাকে সাধারণের দোরে পৌঁছে দিতে হলে এছাড়া অন্য পথ নেই। বুঝতে পারলুম, সুকান্ত সচেতনভাবে অথবা নিজের অজ্ঞাতে এই পথেরই পথিক ছিল। সমালোচক অবিশ্যি একে কবিতার অব্যাপারের পায়ে, কবিতাবহির্ভূত ঘটনার ওপড় কবিতাকে দাঁড় করানো বলে নিন্দে করতে থাকলেন। আমি কিন্তু আমার 'তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা', 'মেঘবৃষ্টিঝড়'-এর শেষাংশ এবং 'কটি কবিতা ও একলব্য'-এ নিজের মতো ক'রে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করলুম সুকান্তকে।

বিপ্লবের কবি সুকান্ত ॥ কৃষ্ণ ধর

সুকান্তর কথা কী লিখব। বাংলাদেশে সুকান্তর চেয়ে প্রিয় কবি আর কে? একুশ বছর বয়সে সুকান্তকে আমরা হারিয়েছি। সে আজ কতদিন হয়ে গেল। সুকান্ত বেঁচে থাকলে আজ আমার বয়সী হত। একই সালে আমরা জন্মেছি। সুকান্তর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পাই নি। সে অনেক এগিয়ে ছিল, এখনো আছে। সুকান্ত বাংলাদেশের মাথার মণি। বহু সভায়, বহু কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় আমাকে যেতে হয়। সব জায়গাতেই শুনতো পাই সুকান্তর কবিতা। বাংলাদেশের রক্তের সঙ্গে মিশে সুকান্তর কবিতা এক আশ্চর্য উত্তরাধিকারে উজ্জ্বল। সুকান্ত আমাদের সর্বস্ব।

বিপ্লবের কবি সুকান্ত

কী লিখেছিল সুকান্ত? সুকান্ত বাংলাদেশের যৌবনের কবি। যে-সময়ে তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশ তখন বিদ্রোহে, বিক্ষোভে উত্তাল। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শোষণ আর শাসনের বিরুদ্ধে এত বিদ্রোহ কখনো দেখে নি কেউ। সুকান্ত এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আবিষ্কার করেছিল কমিউনিজমকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে। সে কোনো তাত্ত্বিক পণ্ডিত ছিল না। একজন কবি যেভাবে জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করে, সুকান্তর কাছে মার্কসবাদ তেমনিভাবে সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল। খুব অল্পই আয়ু পেয়েছিল সুকান্ত কবিতা লেখার। সুকান্তর যে কবিতা আমরা পেয়েছি তার সবগুলিই সম্ভবত ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭-এ তার মৃত্যুর আগে লেখা। এত স্বল্প পরিসরের কবি-জীবনের আয়ুতে বাংলাদেশে আরেকজন কবি যুগান্তকারী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি মাইকেল মধুসূদন। মাইকেল সুকান্তর চেয়ে দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন সত্য। কিন্তু তাঁর বাংলা কবিতাও পাঁচ-সাত বছরেই সব লেখা হয়েছিল।

সুকান্ত চেয়েছিল একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট ও সাচ্চা কবি হতে। অল্পায়ু এই সদ্য-কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক তাই হয়েছিল। বাংলাদেশে সুকান্তই দেখিয়ে গেল কী ক'রে সাচ্চা কমিউনিস্ট হয়েও সাচ্চা কবি হওয়া যায়। সুকান্তর ব্যক্তি-জীবন ও কবি-জীবনের মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য ছিল না। ব্যক্তি-জীবনে বুর্জোয়া, কবিতায় বিপ্লব এই মধ্যবিত্ত সুলভ চাতুরীকে সুকান্ত অল্প বয়সেই ঘৃণা করতে শিখেছিল। তাই অনেক মেকী বিপ্লবী কবির কবিতা জনসাধারণ সহজেই বর্জন করতে পারল। সুকান্তর কবিতাকে নিল বুকে ক'রে। একজন কমিউনিস্ট কবি কী ক'রে হতে হয় তা সুকান্তই নিজের জীবন দিয়ে আমাদের চিনিয়ে গেল। এ যেন বুকের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করা। আক্ষরিক ও প্রতীকী উভয় অর্থেই তা সত্য। তার প্রতিটি কালির ছত্রে আগুন-ঝরানো দেশপ্রেম বিষাদ আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং সর্বহারা মানুষের প্রতি অভ্রান্ত ভালবাসার উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর। সুকান্ত বিপ্লবের কবি, কমিউনিজমের কবি, সমাজতন্ত্রের কবি। এই তিনক্ষেত্রে সুকান্তকে এখনো কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে নি, একথা আমি স্পষ্ট ভাষাতেই বলতে চাই। আমাদের দেশে যদি কেউ সেদিন থাকতেন তাহলে সুকান্তকে বুকে তুলে নিতেন। আমাদের দেশে কোনোদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সুকান্তর কবিতা দিয়ে তার অভিষেক করতে হবে। সুকান্ত তার অভ্রান্ত বিশ্বাসে এবং অসামান্য কবিত্ব শক্তিতে আমাদের সামনে ভাবীকালের নিখুঁত

ছবি তুলে ধরে গেছে। সুকান্ত যে কী আশ্চর্য আবেগে কবিতাকে যুদ্ধ শিল্পে উত্তীর্ণ ক'রে গেছে তা বিচার করতে বসলে মুগ্ধ হই। তার বয়স ছিল অল্প। কিন্তু এই অল্প বয়সেই কী আশ্চর্য অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছিল যাকে এমন প্রগাঢ় বিশ্বাসে কাব্যে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল। সুকান্ত জন্মেছিল এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। সে পরিবারে বিপ্লবের আবহাওয়া না থাকারই কথা। কবিতা ও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে নিতান্ত পোশাকী জিনিস। লুকিয়েচুরিয়ে লিখতে হয়। সেই পরিবারেই সুকান্ত বারো-চৌদ্দ বৎসর বয়সে রীতিমতো কবি। জীবনের দুঃখের দিকটা সে দেখেছিল অল্প বয়সেই। এ দুঃখ কোনো ব্যক্তিগত ব্যর্থতা বা হতাশার নয়। তার চারপাশের দুঃখী, শ্রমিক, বস্তিবাসী, এদের দেখে সে বুঝতে পেরেছিল সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের শোষণের স্বরূপ। তাই শত্রুকে তার চিনতে ভুল হয় নি। বলেছিল, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি। জীবনের কোন্ পথ বেছে নিতে হবে তাও সে বুঝতে পেরেছিল তখনি। আমার তো মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যে 'অখ্যাত জনের নির্বাক মনের কবি'র কথা লিখে গেছেন তার জন্য তিনি কান পেতেছিলেন সে কবি নিঃসন্দেহে সুকান্ত ভট্টাচার্য। মাত্র একুশ বছর বয়সে মৃত্যু যাকে এই জন্মদুঃখিনী দেশের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সুকান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মালেও প্রলেতারিয়েত কবি। মধ্যবিত্তের সংস্কার, ছলনা, আত্মম্ভরিতার কোনো চিহ্ন তার জীবনে এবং কবিতায় নেই। আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই সুকান্তের কবিতা বিপ্লবের ও সমাজতন্ত্রের কবিতা।

অনেক প্রাজ্ঞ কবি ও সমালোচক যারা সুকান্তর রাজনীতি পছন্দ করতেন না কিন্তু তাঁর কবিত্ব-শক্তিকে অস্বীকার করার ছিল না ক্ষমতা তাঁরা ঠারেঠুরে একথা বলতে চেয়েছেন যে সুকান্ত রাজনীতি না করলে আরও ভাল কবিতা লিখতে পারত। এরা কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও স্বীকার করতে চায় না। আমি বলি, রাজনীতি তো আর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তু নয়। সুকান্তর রাজনীতি ছিল মানুষের শোষণ আর দুঃখজয়ের রাজনীতি। সুকান্তর কবিতা তারই সার্থক শিল্পরূপ। সুকান্ত সজ্ঞানে মার্ক্সবাদকে জীবনসংগ্রামের দিশারী রূপে গ্রহণ করেছিল। শুধু মুখে নয়। রাবীন্দ্রিক ভাষায় 'জীবনে জীবন' যোগ করার রাজনীতিই সে গ্রহণ করেছিল। সেই নিখাদ জলন্ত বিশ্বাস সুকান্তকে দিয়েছিল কবিতা লেখার প্রেরণা। তার কবিতায় আমরা পাই সেই অনির্বাণ আত্মপ্রত্যয়ের উজ্জ্বল বিকাশ। তার মধ্যে মেকী বিপ্লবীয়ানা ছিল না। তার সাধ্যমতো সে দেশের সংগ্রামী মানুষদের সঙ্গে থেকে তাদের কাজে সাহায্য করেছে।

সুকান্ত তার স্বল্পায়ু জীবনের সবটাই এই বিশ্বাসের জন্য উৎসর্গ ক'রে গেছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর ফ্যাসিবাদের আগুনে দেশ জলছে তখন। সে বয়সে একজন কিশোর পারিবারিক আশ্রয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, স্কুল কলেজে পড়ে নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করে সুকান্ত তখন তার অর্জিত পুঁথিগত জ্ঞান দিয়ে পদাতিক হয়ে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়ায় মানুষের দুঃখ দূর করার সংকল্পে। এবং পুঁথির সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখবার জন্য। তার সম্বল ছিল আশ্চর্য অনুভূতি-প্রবণ মন আর দুর্জয় প্রাণশক্তি। কে তাকে এই দুর্লভ জীবনচর্চায় দীক্ষিত করেছিল জানি না। সুকান্ত তার বাঞ্ছিত পথ পেয়ে গেল। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নাবিক যেমন কম্পাসের দিকে দৃষ্টি রেখে অন্ধকারে চলে গন্তব্যে পৌঁছবার নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে, সুকান্তও তেমনি মার্কসবাদকে কম্পাস হিসাবে গ্রহণ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জীবনসংগ্রামের উত্তাল সমুদ্রে। আশা ছিল লক্ষ্যে সে পৌঁছুবেই ধ্রুব। সুকান্ত কিছুই দেখে যেতে পারে নি। যে কিশোর বলেছিল, বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন কিংবা,

> "চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
> প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
> এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
> নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

কে জানত এই দুর্ভাগা দেশে চিকিৎসার অভাবে মাত্র একুশ বছর বয়সে মুখে রক্ত উঠে একটি উজ্জ্বল প্রাণ এভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে?

বাংলাদেশে সুকান্তর আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু প্রগতিবাদী সাহিত্যের প্রকাণ্ড ক্ষতি। এ আর পূরণ হল না। সুকান্তের মৃত্যু আরোও শোকাবহ এই কারণে যে সে কী হতে পারত তা দেখবার সুযোগ আমরা পেলুম না। বাংলাদেশে মার্কসবাদী সাহিত্যে সর্বজনস্বীকৃত সৃজনশীল শিল্পী খুব বেশি নেই। বিপ্লবের কথা বললে কিংবা লেখার মধ্যে চমক লাগানো স্লোগান দিলেই মার্কসবাদী বা জীবনবাদী সাহিত্য হয় না। টলস্টয় বিপ্লবী ছিলেন না। তবু তাঁকে লেনিন বলেছেন একজন মহান্ শিল্পী। সুকান্তকে নিয়ে আমাদের গর্ব এই যে সে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট এবং মহান্ শিল্পী। বাংলাদেশের সাহিত্যে যে মানবিক উত্তরাধিকার গড়ে উঠেছে সুকান্তর কবিতা তার মধ্যে উজ্জ্বল সৃষ্টি রূপেই গণ্য হবে।

সুকান্ত সেই কিশোর বয়সেই সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী হয়ে

উঠেছিল। আজ ভাবতে অবাক লাগে কীভাবে সে তখন লিখতে পেরেছিল—

"ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধ'রে
জেনো গচ্ছিত আছে।
... ...
জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে॥" [ঠিকানা

সুকান্তর কবিতা খুবই স্পষ্ট, যেমন স্পষ্ট প্রতিদিনের সূর্যালোক, যেমন স্পষ্ট জননীর ভালবাসা, যেমন স্পষ্ট ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না। এতে তার কবিতার শিল্পগুণের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে আমি মনে করি না। সুকান্তর কবিতা আজ বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের পর এত জনপ্রিয় কবি বাংলাদেশে আর নেই। সুকান্তর কবিতা স্লোগানে ব্যবহৃত হয়। শিশুরা আবৃত্তি করে, মিছিলে গানে রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়া একজন সৎ আদর্শবাদী কবির আর কী কাম্য হতে পারে? একজন কবির অমরত্ব বলতে যা বুঝি সুকান্ত সেই দুর্লভ অমরত্ব উপার্জন করেছে। সুকান্ত কি জানত, তাঁর বাংলাদেশ তাঁর পাশে বসে সংগ্রামী মানুষ এভাবে তাঁকে গ্রহণ করবে? সে বলেছিল—

"ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।"
[আগামী

এ যেন ভবিষ্যদ্বাণীর মতো। আমাদের দুর্ভাগ্য অঙ্কুরেই সে বিনিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিতই সে ভাবীকালের বনস্পতি। বাংলাদেশের বৃষ্টি আর মাটির রসে, সর্বহারা মানুষের প্রাণের আমন্ত্রণে, সুকান্ত আজ বনস্পতির তুল্য কবি। তার সময়ে জন্মেছিলাম বলে আমার গৌরবের অন্ত নেই।

বাংলাদেশের সমালোচকরা আজকাল সুকান্ত নিয়ে আলোচনা করেন কদাচিৎ।

কিশোর কবি বলে তাকে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করার চেষ্টাও কখনো কখনো দেখি। এদেশের প্রগতিবাদী শিল্পসাহিত্যের ব্যর্থতাই সুকান্তর সাহিত্যকে যথার্থ নিরিখে বিচার করতে অক্ষম হন। এজন্য দুঃখ ক'রে লাভ নেই। সুকান্ত তার নিজের জীবনের দৃষ্টান্তে এবং কবিতায় বাংলাদেশের মানুষের কাছে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কৃষাণের শ্রমিকের জীবনের শরিক হবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উচ্চারিত, কবিতার জগতে সুকান্ত আমাদের সেই ইচ্ছাপূরণ। নবজাতকের জন্য যে-পৃথিবীকে বাসযোগ্য ক'রে যাবার দৃপ্ত ঘোষণা আমরা সুকান্তর কবিতায় পাই, যে-পৃথিবীর স্বপ্ন ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে যেদিন সফল হবে, সুকান্তর আত্মদানের সার্থকতা হবে সেদিন।

আমরা তার জন্য অপেক্ষা করি। বলি :—

"হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।" [বোধন

বার বার সুকান্ত ॥ অমিতাভ দাশগুপ্ত

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ—সুকান্ত লিখলেন। তারপর আর তিন বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। না, আমি কোনো নাটকীয়তা করতে চাইছি না। হয়তো অনিবার্যভাবেই তিনি মারা গেছেন। তবে আমাদের কাছে এই দুঃসহতা এবং মৃত্যু একটি সমান্তরাল রেখায় ছুটে আসে। অল্প বয়স থেকে খুব চড়া তারে নিজেকে বেঁধে নিলে আঙুলের একটু এধার-ওধার হয়ে সমস্ত যন্ত্রটা ভেঙে চুরমে যায়। শুনেছি, সুকান্তর কবিতা লেখা ও কবিতা পাঠ করা সবটাই একটা প্রচণ্ড

আবেগতাড়িত ঝড়ের ব্যাপার ছিল। সে ঝড় শিরাধমনী রক্ত-মাংসের শরীরে ধরে রাখতে পারে না। সুকান্ত পারেন নি।

২

কলকাতার শহরতলিতে একটি কারখানা। হাজার তিনেক শ্রমিক কাজ করেন। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে অসংখ্য অভিযোগ তাঁদের। লাগাতার ধর্মঘট হয়। ঘেরাও। বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। মালিক উত্তর দেয় কারখানা বন্ধ করে দিয়ে। বছর ঘুরে যায়। অর্ধাশন অনশন মাথায় নিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে বাহাদুর শ্রমিকরা লড়ে যেতে থাকেন। অবশেষে আবার কারখানার গেট খোলে। ইউনিয়ন জনসভা ডেকেছিলেন বিকেলে। নিশানে নিশানে চোখের ভোজ একেবারে। ক্লাস টেন-এর বেশি পড়তে পারে নি আহ্সান। বট্‌লিং-এর কাজ করে। ঝর্ণার মতো চকচকে মুখ, রোগা চটপটে শরীর, লাফ দিয়ে মাইক ধরে দাঁড়ায়। এ ছোকরা আবার কি বলবে—অস্ফুট গুঞ্জরণ, চাপা বিরক্তি পোড় খাওয়া টোল-খাওয়া শ্রমিকদের চোখে মুখে। তারা ইউনিয়নের নেতাদের কাছ থেকে কাজের কথা শুনতে চায়। ততক্ষণ আহ্সানের কাঁপা তীক্ষ্ণ গলায় শুরু হয়ে গেছে—

"কোথাও নেই কো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যায়
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ভাঙা নৌকোর পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল।"

পদ্য পড়ছে আহ্সান। তা হোক—রুক্ষ তামাটে চুলগুলিকে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে যেয়ে পাঁজরের খুব নিচু থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে প্রসেসিং ডিপার্টমেন্টের ঝানু কারিগর রামবিলাসের। লক্-আউটের তেষট্টি দিনে তার উনিশ বছরের জোয়ান ছেলে প্রায় বিনা পথ্যি বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। প্রথমদিকের দিশেহারা গলা ক্রমশ আশ্বস্ত, সংহত হয়ে আসতে থাকে। উঁচু গ্রামের পর্দা ছুঁয়ে যায়।

"তুমি তো প্রহর গোনো, তারা মুদ্রা গনে কোটি কোটি,
...শূন্য মাঠে কঙ্কাল-করোটি।
তোমাকে বিদ্রূপ করে, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে—
কুজ্ঝটি তোমার চোখে, তুমি ঘুরে ফেরো দুর্বিপাকে।"

ঝড়ের গভীরে কেন্দ্র। হাজার চোখের একাগ্র লক্ষ্য হয়ে উঠতে থাকে মুখচোরা, মিছিলের শেষ সারির অতি নগণ্য অহ্‌সান। শরীরের মূর্তি ভেঙে ফেলে আজান বা উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণের মতো আয়তনবান চারপাশে অসংখ্য বুকে চারিয়ে যেতে থাকে একদম আঁত থেকে উঠে আসা শব্দগুলি—

"তোমার ফসল, তোমার মাটি
তাদের জীয়ন ও মরণ-কাঠি
তোমার চেতনা চালিত হাতে।
এখনও কাঁপবে আশঙ্কাতে ?
স্বদেশ-প্রেমের ব্যঙ্গমা পাখি
মারণ-মন্ত্র বলে, শোনো তা কি ?
এখনও কি তুমি আমি স্বতন্ত্র ?"

একটি কবিতাতেই যেন মুশেয়ারা বসে গেছে। ঈষদ্‌ভিন্ন ঠোঁট, শ্রবণ উৎকর্ণ ক'রে শুনছে জনমানুষ যেন একটা শব্দ পেরিয়ে না যায়। এরপর বক্তৃতা হবে—হতে পারে। বোধহয় কোনো দরকার থাকে না তার। ফেরার পথে কারখানা হলুদ-রঙা চওড়া পাঁচিলের কাঠকয়লায় ফুটিয়ে তোলা দুটি আঁকা-বাঁকা লাইনের সামনে দাঁড়াই। বিকেলেই লেখা হয়েছে।

"রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে
ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।"

রুটির থেকে আরেকটু বেশি। শিল্প। ঘরে ফেরা মানুষদের অসংখ্য চোখে সুকান্তর অবয়বহীন ছবি। মধ্যবিত্ত, সংশয়বাদী রক্ত বিশ্বাস করতে চায় না, এ ভাবে তিনি আছেন।

৩

সুকান্ত তিনভাবে আমার কাছে এসেছেন। প্রথমে আমাদের বিচারবিহীন অভিভূত হওয়ার বয়সে। মনে পড়ে এক জায়গায় প্রায় এহেন লিখেছিলাম।···

আমাদের কৈশোর বলে কিছু ছিল না সেদিন। গ্রাম-শহরে যুদ্ধের দিনগুলোয় মাঝরাত থেকে কেরোসিন তেল, চাল আর কাপড়ের জন্ত শ্রান্তিহীন লাইন দিতে হয়। আমার যৌবন কাটে খাদ্যের সারিতে, প্রতীক্ষায়। মোটা, রুলটানা লাল

কাগজে খুদে খুদে ক'রে কৃপণের মতো জায়গা বাঁচিয়ে লিখতে হত। পিঠে পিঠ দিয়ে এভাবেই একটানা রেলের বগির মতো আসে যুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, আগস্ট বিপ্লব, ১৬ই আগস্টের দাঙ্গা, দেশবিভাগ। এই বার বার বিপর্যয়ে আমাদের কৈশোর—প্রথম তারুণ্য অস্বীকৃত অভিশপ্ত।

বঞ্চিত শরীর—মন জুড়ে তাই কেবল মার খাওয়ার জ্বালা ছড়িয়ে ছিল। ১৯৪৯ সালে বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ ইশ্‌তেহার বিলি করতে গিয়ে, খাদ্য আন্দোলনের শহীদের ভেজা শব নিয়ে মিছিলে হেঁটে ব্যর্থ ক্ষোভে উদাসীন কলকাতার পাথর-বাঁধানো পথে মুখ থুবড়ে ফেটে যেত যে জ্বালা। সেই আগুনের দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে পলাতক। পথে গঞ্জে ক্রোধে বিপ্লবে শামিল ছিলেন সুকান্ত। তাঁর প্রত্যাশার সঙ্গে রক্তে-মাংসে জড়িয়ে যেন আমাদের তাজা প্রাণের অমোঘ বিশ্বাস—

> "ভারতবর্ষ! কার প্রতীক্ষা করো,
> কান পেতে কার শুনছো পদধ্বনি
> বিদ্রোহে হবে পাথরেরা থরোথরো
> কবে দেখা দেবে লক্ষ প্রাণের খনি?"

আমাদের প্রথম বয়স ও প্রথম পর্যায়ের সুকান্ত-পরিচয় এভাবেই শুরু ও শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সুকান্ত যেন কবিই রইলেন না আমাদের কাছে। এমনকি, খুবই লজ্জিত হয়ে পড়তাম ভেবে যে এককালে এমন অ-কবির লেখা নিয়ে মূর্খের মতো প্রবল নাচানাচি করেছি। মেধা, বোধ, বিবেচনা ইত্যাদি বড় বড় শব্দগুলি তখন অভিধান ছেড়ে আমাদের মাথায় নেমে এসেছে। অনেকেই মনে করছেন সাহিত্য-বিষয়ে সাম্যবাদী এমন কি মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সংকীর্ণ ও একপেশে। বেকারী ও দারিদ্র্যের সঙ্গমে জন্মানো যেন-তেন প্রকারণে রুটি রুজি ও কিছুটা সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জনের জন্য দ্বি-মুখী জীবনযাপন ও সুবিধাবাদের পায়ে দাস্যবৃত্তি এ সময় আমাদের চরিত্রে তাদের শিকড় চালিয়ে দিয়েছে। পিওর পোইট্রি বা পরিশুদ্ধ কবিতা। ঈশ্বর, নির্জনতা, নিঃসঙ্গ হলুদ বাড়ি, কামদা যুবতী, পুরাণ ইতিহাস, সুকুমার শিল্প, কারিগরির মিহি কাজ—এসব জিনিস নিয়ে খুব মাখামাখি করছি সবাই। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সুকান্ত তখন আমাদের সবার কাছে একেবারে অবসোলিট্ হয়ে গিয়েছিলেন। এখনও। এই সত্তরের অগ্নিগর্ভ বাঙলাদেশের বিস্ফোরণের মুহূর্তে, আমাদের অনেক মাতব্বর শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে সুকান্ত, কি স্লোগানের চেয়ে বেশি?

আজ, চারপাশের থমথমে, আগুনপারা বাঙলায় আমাদের যাবতীয় ভণ্ডামি, অসভ্যতা ও চাতুর্যের ওপর ক্রোধ ও ধিক্কারের বারুদ জমছে। এখন কেবল পলতেয় আগুন চলে যাওয়ার অপেক্ষা। '৭০ সালের বাঙলা, রাজনীতি, মানুষ, শিল্প সব একদম পালটে যেতে বসেছে। এই নতুন মানচিত্রে সে ভাবে বাঁচা তো দূরের কথা, টিঁকে থাকবার জন্য আমাদের ঢের ঘর্ম ও অশ্রুপাত করতে হবে। বাঙলার হাজার হাজার লড়াকু কিষাণদের ঘরের একটি ছেলেও আমাদের কবিতা পড়ে নি। কুলি ধাওড়ায়, শ্রমিকদের মহল্লায় মহল্লায় সারিতে সারিতে একটি বারের জন্য আমাদের কবিতা প্রতিবেশীর মতো জীবনে, হরতালে লড়াই-এ অনিবার্য বা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। শহরের বুদ্ধিদীপ্ত, সংগ্রামী, তরুণরা ভুলক্রমেও আমাদের কবিতার অন্তর একটি পঙ্‌ক্তি নিয়ে পোস্টার তৈরি করে না। আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থ, অসহায়, মূর্খ শবদেহের ওপর দিয়ে সুকান্ত আবার, রাজকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে আসছেন। সুকান্তের 'চিল'-এর মতোই তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যু প্রকৃতির পরম ব্যর্থতার শেষে আমরা সময়ের নিষ্ঠুর ফুটপাথে নালা-নর্দমায় মুখ গুঁজে পড়ে আছি।

সুকান্ত : কবি সুকান্ত ॥ কেদার ভাদুড়ী

কবিতা কী, কবিতা কেন, এ দুই প্রশ্ন নিয়ে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত অনেক মহাভারত সৃষ্টি হয়েছে। কবিতা কী—এ প্রশ্নের উত্তর আমরা বোধহয় আজও পাই নি। নানা মুনির নানা মতের মতো প্রশ্নটা একটা জুতসই তাগিদে নিজেকেই নিজে ধোঁয়াশা ক'রে রেখেছে। কিন্তু কেন এ প্রশ্নের উত্তর সুকান্ততে এসে এতই সহজ হয়ে উঠেছে যে ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয়।

শেলী বলেছেন, কবিতা পরম মনের চরম অভিব্যক্তি। সুকান্তের কবিতা সুকান্ত মনের স্বাভাবিক পরিণতি। 'জন্মেই যে পদাঘাতই···পেলাম' বলে 'অবাক পৃথিবী'-কে 'সেলাম' জানাতে পারে তার পক্ষে অগ্নিগর্ভ বিশ্বাসের কাব্যিক বোধন কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। পদার্থ থেকে প্রাণময়তার এমন কাব্যকোষ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে সেই যুগে অপর নজির্ নেই।

অনেকেই বলবেন নজরুল। কিন্তু নজরুলের মধ্যে রোমান্টিক সৈনিকবৃত্তির রূপসী

অনুপ্রাস প্রায়শই চোখে পড়ে। আমরা বজ্রমুষ্ঠি হাত উর্ধ্বে তুলে ধরে ভীম ভাস-মান মাইন হতে চাই। আমরা হতে চাই 'চির উন্নত শির'। সুকান্তের মধ্যে সেই হাত 'উত্তোলিত উদ্ভাসিত কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়'। তারপরেই আবার সুবোধ্য স্বাভাবিক—'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—'।

তফাতটা ,তাই ধ্বনিতে নয়, শোনিতে ; মন্ত্রে নয়, মিছিলে। বিদ্রোহের থেকে বিপ্লবে। কিন্তু কেন? মার্কসবাদের মন্ত্রশিষ্য সুকান্তের চোখ সোজা দেখতে পেল 'ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে, অবশ্য খাবার খেতে নয়—খাবার হিসেবে।'

'একটি মোরগের কাহিনী' সুকান্তের যেন নিজেরই জীবনের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের সুতীক্ষ্ণ চিৎকার সুকান্তের কবিতা। দল বেঁধে ধর্মঘট করার মতনই একাত্ম আত্মীয়তার অনন্য প্রতিভা। সেক্সপীয়র যেতে যেতেই যেমন স্বর্ধ মিলটনের আবির্ভাব, রবীন্দ্রনাথ যেতে যেতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সুকান্তের আবির্ভাব, বোধ হয় বাংলা কাব্যের ইতিহাসে আর দৃষ্টান্ত নেই। কেন এমনটা হয়? বোধহয় ডক্টর খোরানা এর প্রাথমিক ভূমিকা দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু সুকান্ত নির্যাতিত মানবাত্মার প্রতিনিধি হিসেবেই আমাদের কাছে স্পষ্টতর—

"অন্ধকার ভারতবর্ষ : বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি ; পরস্পর অযথা সন্দেহ ;
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভর্ৎসনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন।"

অবশ্য লেনিন এখন নিঃশব্দ নয়, সশব্দ। তবু 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে' যে লাল রক্ত চলাচল, তাই তার কাব্যে এমন মহৎ সুন্দর প্রতিনিধিত্ব। সেখানে সুকান্ত আপন স্বাধীন।

রবীন্দ্র দর্শন নেই সুকান্তের চোখে। জীবনানন্দর বাঙলা নেই সুকান্তের বুকে। নেই 'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর সবুজ ঘাসের দেশ', নেই 'মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালবাসে'-র মতো অপরূপ বেদনানন্দ কথা। সুকান্তের মধ্যে নেই কাব্যরসের পঞ্চনদ। স্বননে মননে স্বাস্থ্যে রূপে লাবণ্যে সমুদ্র তন্ময়তা। না থাক্। একুশ বছরের বাঙালী সাধক-কবির জীবনে এর চেয়ে বেশী আশা করাই অন্যায়, বিশেষত যখন—

"আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।"

সেই কবে কবি-প্রাণে লড়াকু স্বপ্নের সাধ এক হয়েছিল, আজও তার স্পর্শ গভীরতর হয়ে বাংলার দৃশ্যপটে প্রস্তুতি এনে দিল। একদিন আসবে যখন ঐক্যের খাতিরে অনৈক্য হতাশ হয়ে কোথায় মিলিয়ে যাবে, নিরন্ন মুখে আসবে অন্ন, শান্তির আসরে সাম্য একমাত্র গতিতে পরিণত হবে—প্রগতি যার নাম। সেই সুদূর দিনে হয়তো অনিবার্যভাবেই সুকান্ত-ভূমিকা হ্রাস পেতে পেতে হ্রস্বতর হবে। মানব প্রকৃতির বিশ্বজনীন আবেদনে টান পড়বে। যুগোত্তরের সাধনায় কালজয়ী শক্তি শুধু শবদেহেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ভয় হয়। কিন্তু নিছক সে ভয় সুকান্ত একটি ধারার প্রবর্তক। হাজার আধুনিকতায় তার আবেদন অম্লান। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের দৃষ্টি বোধ রাজনৈতিক ভাঁড়ামির মধ্যেও একটি স্টেনলেশ স্টীল ব্লেডের মতো সমস্ত অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে এক জাগ্রত লাল সৈনিক। তাই পাইন পপলার তলে রক্তস্নাতা ধর্ষিতা 'কাশ্মীরকে নিয়েও এক কঠিনতর কাব্য—

"দম-আটকানো কুয়াশা তো আর নেই
নেই আর সেই বিশ্রী তুষার বৃষ্টি,
সূর্য ছুঁয়েছে, 'ভূস্বর্গ চঞ্চল'
সহসা জেগেই চমকে উঠেছে দৃষ্টি।"

আজ স্পষ্টই দেখতে পাই 'আঠারো বছর বয়েসের দুঃসাহস' অনেক কবি, না-কবির মধ্যেও। 'কর্ষিত মাটির পথে পথে নতুন সভ্যতা গড়ে পথ'। সুকান্তের সার্থকতা বোধহয় সেইখানেই। আর—বোধহয়—

"দুচোখে আমার আজ বিচ্ছুরিত মাঠের আগুন,
নিঃশব্দে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তরঙ্গিত প্রাণের জোয়ার
মৌশুমী হাওয়ায় আসে জীবনের ডাক :
শহরের চুল্লী ঘিরে পতঙ্গের কানে।"

সুকান্ত ভট্টাচার্যের অনন্যতা ॥ মণীন্দ্র রায়

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অকাল মৃত্যু একটি শোচনীয় ঘটনা। কিন্তু আমরা যারা তাঁর অনুরাগী পাঠক তাঁদের পক্ষে কিছুটা সান্ত্বনার বিষয় এই যে সুকান্ত তাঁর অপরিণত যৌবনেই এমন কবিতা লিখে গেছেন যা সুপরিণত ও সার্থক, এবং যাতে তাঁর অনন্যতার স্বাক্ষর স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

কী সেই অনন্যতা, তার বিচারই আমার মনে হয় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা এবং আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে সে কবিতার গুরুত্বকে বুঝে দেখবার সব থেকে ভালো উপায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর, অর্থাৎ বিশের দশক থেকে বাংলা কবিতার যে নতুন মোড় দেখা দিতে শুরু করল, তাতে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু দুদিকেই নানারকম পরিবর্তন দেখা দিল। এর অনিবার্যতা ও সার্থকতা নিয়ে আজ আর কোনো তর্কের অবকাশ নেই। ভিতরে ও বাইরে এই রূপান্তরের তাগিদ যে একটি যুগলক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ তা সুস্পষ্ট। একদিকে নিকট অতীতের রুশ-বিপ্লব ও সেদেশে নতুন সমাজ গঠনের খবর, এবং অন্যদিকে স্বদেশে আধা-ঔপনিবেশিক সমাজের বদ্ধজলা ও বিদেশী শাসন, আমাদের মূল্যবোধের জগতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে চলছিল। কী ক'রে এরই ফলে বাংলা কবিতা যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, নজরুল, মোহিতলালের হাত ঘুরে প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্র দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিদের জগতে পৌঁছে গেল তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এঁদের, এবং এঁদের বন্ধুদের বাংলা কবিতা জটিল, সূক্ষ্ম, উঁচু-নীচু, কঠিন তীক্ষ্ণ ও বহুতল বিশিষ্ট হয়ে উঠল। এ কবিতায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার অন্যরকম। এবং স্বদেশ ও বিদেশের হাল-আমল আর অতীত-ইতিহাসের মূল্যায়নের ধরনটাও অন্যজাতের। অবশ্য কবিরা যে সব ব্যাপারেই একমত ছিলেন তা নয়। বেশির ভাগ সময়েই তাঁদের মতভেদ ছিল প্রচণ্ড, এবং সেটা অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু মিল ছিল তাঁদের একটা বড় জায়গায়, সেটা হল আমাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ-গুলিকে নতুনভাবে বিচার ক'রে দেখার তাগিদ-সম্পর্কে একটা সপ্রাণ দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্যতা। বলা বাহুল্য, এর ফলে কবিরা সকলেই যে প্রগতিশীলতার দিকে

ঝুঁকে ছিলেন তা নয়, কেউ কেউ যৌন স্বাধীনতা, কেউবা বুদ্ধির নৈরাজ্য, আবার অন্য কেউ আঙ্গিকের খেলনা নিয়েই খুশি হয়ে রইলেন। কেউ কেউ জীবনের অনিবার্য টানে ঝুঁকলেন সমাজতন্ত্রের দিকে, যেমন—বিষ্ণু দে, এবং তাঁর অনতি-পরবর্তী সহযাত্রী সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু একটা মৌলিক সপ্রশ্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু ক'রে শেষ অবধি এঁদের জীবনকে গ্রহণ করার ধরনের মধ্যে যতো পার্থক্যই ঘটুক, আরো একটা মূল ব্যাপারে এঁদের মিল ছিল, সেটা হল নাগরিকতা, এবং বৃহত্তর পাঠক-সাধারণের কাছ থেকে বাংলা কবিতার ক্রম-অপসরণ অর্থাৎ বাংলা আধুনিকতার অভিশাপে বহু বিন্যস্ত, জটিল ও গভীর হল বটে, কিন্তু তাঁর আবেদনও হল সীমাবদ্ধ। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সব থেকে বড় অবদান হল এই যে, আধুনিক বাংলা কবিতাকে তিনি লোকমানসের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে শিকড়ে সত্যিকারের মাটির সন্ধান দিলেন। চেষ্টা অবশ্য অনেক আগে থেকেই চলছিল। সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন, কৃষক মজুরের নাম ক'রে নানারকম শপথও তাঁরা উচ্চারণ করছিলেন, কিন্তু তা শহুরে পাঠককে যে পরিমাণে উৎসাহিত করছিল, গ্রাম-বাংলার মানুষকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু সুকান্তের কবিতা অল্প সময়ের মধ্যেই সেই অসাধ্যসাধনটি ঘটিয়ে দিল। কেমন ক'রে? প্রধানত, জীবন সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ তাঁর কেবল মস্তিষ্কের জগতে আটকা না থেকে অন্তঃকরণের জগতেও সঞ্চারিত হয়েছিল বলে তাঁর মনে যে আবেগ জেগেছিল, সেই আবেগের দ্বারা, আর দ্বিতীয়ত, এই আবেগময় সহমর্মিতাই তাঁর দৃষ্টিকে শহুরে গণ্ডি ছাড়িয়ে গোটা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে দিয়েছিল বলে। এর ফলে সুকান্ত তাঁর কাব্যভাষাকে করলেন সাধারণ মানুষের গ্রহণ ক্ষমতার কাছাকাছি; কিংবা বলা উচিত, সাধারণ মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁর ভাষা এরকম ছাড়া জটিলতর আঙ্গিকে প্রকাশিতই হল না। অথচ এজন্যে তিনি যে আধুনিকতাকে বর্জন করেছেন তা নয়। তাঁর উপমা, ঋজুতা বলার ভঙ্গি এবং বক্তব্য শতকরা একশ ভাগ আধুনিক। আধুনিকতার যন্ত্রণা, বিষাদ এবং বিদ্রোহ সবই তাঁর কবিতায় উপস্থিত। এবং প্রতীকধর্মী বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তিনি সক্রিয়ভাবে উদ্ভাবনী শীল ও আধুনিক। (দ্রষ্টব্য: একটি মোরগের কাহিনী, বা রানার।) কিন্তু আধুনিকতা কখনোই তাঁকে পাগলা ষাঁড়ের মতো বিপথ-চালিত করে নি, তিনিই বরং সে বাহনটির কাঁধের ওর লাঙল জুতে তাকে দিয়ে নতুন জমি চাষ করিয়ে নিয়েছেন, এবং তা থেকে সোনার ফসলও তুলেছেন।

বাংলা কবিতাকে এইভাবে তার ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে নতুন মুক্তির হদিশ দেবার জন্যে তিনি চিরস্মরণীয়, এবং এইজন্যেই তিনি অনন্য। তাঁর মৃত্যুর প্রায় তেইশ বছর পরেও যে আর কোনো নবীন কবি তাঁর কৃতিত্বের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারলেন না। এও তাঁর মহত্ত্বের আরেকটি পরিমাপ।

সুকান্ত-সংগীত ॥ শৈলেশ ভড়

বর্তমানে আমাদের বাঙলা সংগীতের ধারা বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী। আজ বহু প্রবীণ ও নবীন কবি এই সংগীতের আসরে তাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং করছেন। এঁদের মধ্যে কবি সুকান্ত অন্যতম। দুঃখের বিষয় তাঁর জীবনের গতি অকালে রুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তবু তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর কাব্যে, তাঁর রচনায়।

আমাদের যৌবনে আই পি টি এ দলে তাঁর বহু গান শুনেছি। শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এমন কি আজও সে-সব গান শুনে আমাদের মনে দোলা লাগে। পুরনো দিনের আরো অনেক গানই তো শুনি, কিন্তু সবাই তো মনে সাড়া জাগাতে পারে না। তার একমাত্র কারণ তাঁর গানের সঙ্গে প্রাণের যোগ ছিল। এমন গান ক'জন লিখতে পারে। আর অত অল্পবয়সে অর্থাৎ মাত্র একুশ বছর বয়সে কোন্ কবির ভাগ্যে এমন সফলতা এসেছে তা আঙুল গুণে বলা যায়।

কবির গীতিগুচ্ছ গ্রন্থের গানগুলি যেমন ছন্দমধুর তেমনি উচ্চমানের। সহজ কথায় গভীর ভাবের আভাস আছে। যতদূর জানি সব গান সুরারোপিত হয় নি। তবে আশা করি এমন একদিন আসবে যখন সবগুলি সুরসংযোজিত হয়ে প্রচারিত হবে।

'রানার' গান আজ বহুপ্রচারিত। 'অবাক পৃথিবী'ও তাই, সুকান্তর এই গান দুটিতে সুর দিলেন সলিল চৌধুরী আর রেকর্ড করলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তখন দেখতে দেখতে সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। শুধু শ্রোতাদের মধ্যে নয় শিল্পীদের মধ্যেও শুরু হল আলোড়ন। এ সময়ের কথা আমার বেশ মনে আছে। সে উত্তেজনা, সে উন্মাদনা আজকের যুবকেরা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারবেন না। আর আমিও ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারব না।

সে সময় যে অনুষ্ঠানেই হেমন্তবাবু আমন্ত্রিত হয়েছেন সেখানেই 'রানার' গাইবার জন্যে অনুরোধ এসেছে চারিদিক থেকে সমস্বরে আর গায়ক শ্রদ্ধার সঙ্গে সে অনুরোধ রক্ষা করেছেন। বর্তমানে কয়েকজন নৃত্যশিল্পী এই গানে নৃত্যরূপ দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন।

আমার মনে হয় সংগীত-জগতে সুকান্ত আরো অনেকদূর এগোতে পারতেন যদি তিনি বেঁচে থাকতেন। এমন অনেক ভালো গান তিনি লিখে গেছেন যা যোগ্য সুরকারের হাতে পড়লে আবার প্রচণ্ড সাড়া জাগাতে পারে।

কিন্তু কে তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। সবাই যে যার নিজের নিয়ে ব্যস্ত। বর্তমান যুগের ধারাটাই এই হয়ে দাঁড়িয়েছে। দোষ দেওয়া যায় না কাউকেই। তবু আমরা সর্বান্তঃকরণে আশাকরি যে নবীন সুরকার একদিন আসবেন যিনি সুকান্তর নীরব কাব্যবীণাখানি আবার তাঁর কোলের ওপর তুলে নিয়ে সংগীত-জগৎকে মাতিয়ে তুলবেন। আমরা আজ সেই সুরকারের আগমনের দিন গুণছি।

বেতারে সুকান্ত আজও অবহেলিত। ইচ্ছে থাকলেও কেউ তার গান গাইতে পারবে না। কারণ রচয়িতার তালিকায় তাঁর নাম নেই। রেকর্ডেও তার গান আর কেউ গাইছেন না। বাংলা চলচ্চিত্রে আজও তাঁর কোনো গান গৃহীত হয় নি। মৃতের প্রতি এই তো আমাদের সমবেদনা। হায় বাঙালী কবি!

সুকান্তর গীতিগুচ্ছের রচনাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বেশির ভাগ রচনাই প্রেমের পর্যায়ের—নিপীড়িত অসহায় মানুষের মর্মবেদনার হাহাকার। অথবা নৈরাশ্য থেকে মুক্তির আকুলতায় উদ্দীপিত। প্রকৃতি পর্যায়ের গানের সংখ্যা খুবই অল্প। এক কথায় বলা যেতে পারে জীবনের জয়গানেই ভরে আছে গীতিগুচ্ছ কাব্যগ্রন্থ।

'এই নিবিড় বাদল দিনে', 'মেঘ বিনিন্দিত স্বরে', 'শীতের হাওয়া ছুঁইয়ে গেল ফুলের বনে', 'গুঞ্জরিয়া এল অলি' ইত্যাদি গানগুলিকে প্রকৃতি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

'হে পাষাণ আমি নির্ঝরিণী', 'শয়নশিয়রে ভোরের পাখির রবে', 'দাঁড়াও ক্ষণিক পথিক হে', 'ওকে যায় চলে কথা না বলে' ইত্যাদি গানগুলি নিঃসন্দেহে প্রেম পর্যায়ের। বলা বাহুল্য কবি জীবিত থাকলে এবং উৎসাহ পেলে গানের সংখ্যা নিশ্চয়ই আরো বৃদ্ধি পেত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে অসময়ে আমরা তাঁকে হারিয়েছি।

সুরকাররা বলে থাকেন যে গানের কথাগুলি যদি দুই বা তিন অক্ষরে হয় তাহলে তাতে সুর দেওয়া সহজ। অর্থাৎ সে সব রচনায় সুরের অবকাশ প্রচুর এবং সেই সঙ্গে ছন্দের চলনেও যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সুকান্তর গানগুলি এমনি ছোট ছোট কথা দিয়ে তৈরি। ফলে সুরের এবং ছন্দের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আমাদের মনে হয় নবীন সুরকাররা যদি এই কবির গানের মর্মার্থ যথাযথভাবে আত্মীকরণ ক'রে সুর প্রয়োগে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই একদিন সফলকাম হবেন। আর সেই গানগুলি যদি দরদী শিল্পীদের দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করেন তাহলে কবি এবং সুরকারের মতো শিল্পীরাও যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করতে পারবেন।

অন্তত একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে ক্ষতি কী। আমরা সেই নবীন সুরকার ও শিল্পীর আশায় অপেক্ষা ক'রে থাকবো। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী।

নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

পূর্বাভাসে কোরক যন্ত্রণা ॥ রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

অভিসারী কবিদের সবথেকে বড় মূলধন যন্ত্রণা। অনেক সময় এই যন্ত্রণাকে অহৈতুকী মনে করা হয়েছে কিন্তু সমাজকালের প্রেক্ষাপটে হেতুগুলো রীতিমতো স্পষ্ট। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অসহনীয় কাতরতায় তাঁরা বরাবরই মুখর। এই অসহনীয় দুঃখবোধ কবি-চিত্তকে বিচলিত করে দুটি কারণে, প্রথমত সুতীব্র অনুভূতি আর দ্বিতীয়ত তীক্ষ্ণ বিচারপ্রবণতা। বোধ ও অভিজ্ঞতা এইক্ষেত্রে কবিকে সহায়তা করে সবচেয়ে বেশি—যেটা বয়সের ওপর নির্ভর করে না। সুকান্ত ভট্টাচার্যকে কৈশোরেই এই যন্ত্রণা পেয়ে বসেছিল। বাঙলাদেশের এক বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে তাঁর জন্ম—পৃথিবীকে দেখবার জন্যে যখন কিশোরের কৌতূহল উন্মুখ তখন তার আশপাশের পৃথিবীতে সংগ্রাম সংঘর্ষ, হত্যা, দমন, জিঘাংসার রক্তাক্ত আলপনা। অস্তিত্বের জন্যে মানুষের লড়াই যখন মানবিক দোহাইকেও এড়িয়ে গেছে তখনই সুকান্ত কবি হতে চেয়েছেন, ফলে সেই অসাধারণ বিপন্ন অস্তিত্বের কথা তাঁর চেতনায় সিংহাসন পেতে সমাসীন হয়েছিল।

সেই বিপন্ন অস্তিত্ব আর ভঙ্গুর মূল্যবোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুকান্ত গোধূলির আকাশে তাকিয়েছেন। রঙ দেখেন নি, সূর্যাস্তের সেই রঙে ছিল রক্তিম অবক্ষয় ও হতাশা—ফুরিয়ে যাওয়ার নিষ্করুণ দীর্ঘশ্বাস। আরক্তিম ভালোবাসার পটভূমিতে কবির সামনে চিরপরিচিত মানুষেরা অপরিচয়ের আলো নিয়ে এসে দাঁড়ালো। নতুন ক'রে তাদের চিনলেন—ভালোবাসলেন। তারপর আর একক মানুষ নয়—মানুষের মিছিল। মিছিলের মানুষের ব্যক্তিগত মত নেই—থকতে নেই। তাই সুকান্তের দেখা মানুষের মিছিলের সারিবদ্ধ জনতা যারা সামগ্রিক প্রয়োজনে লড়াইয়ের ময়দানে চলেছে। অবধারিত মৃত্যুর মূল্যে কেনা জীবনের জয় কবি ও কবির মানুষেরা স্বীকার ক'রে নিয়েছে। 'যন্ত্রণায় কণ্টকিত গাছে এবার ঝাঁটা গোলাপ ফুটতে শুরু করল। সুকান্তের সমগ্র কাব্যকে তাই মনে হয় রক্ত মেশানো মাটি দিয়ে গড়ে তোলা সুমার্জিত শিল্পের নিয়মভঙ্গকারী এক উদ্ধত শহীদ মিনার। সূক্ষ্ম শিল্পের বিচারে যে রায় ঘোষণা হোক না কেন—প্রাণশিল্পের বিচারে তার মূল্যমান প্রতিষ্ঠিত।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিসারী কবিরা ঈশ্বর সম্পর্কে নিস্পৃহ অথবা আস্থাহীন। কখনো বা ঠিক উল্টো। সংগ্রামকে অনেক কবি এড়িয়ে গেছেন, কেউ আঁকড়ে ধরেছেন। সুস্থ জীবন ও জগতের প্রত্যাশা সকলের থাকলেও শেলী অভিসারী গোষ্ঠীর মধ্যে একটু ভিন্নমার্গী। সংগ্রাম-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে এগিয়ে আনবে এটা কেবলমাত্র তাঁর বিশ্বাস নয়, দৃপ্ত ঘোষণা ওড্ টু দ্য ওয়েস্টউইণ্ডের মধ্যেই। বর্তমান-বিরক্তি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। গড়ে তোলার সংগ্রামই অভিসারী যন্ত্রণাবোধের ফলশ্রুতি। তবু অনেক সময় সংগ্রামের পরিবর্তে অথবা সংগ্রামের প্রয়োজন হিসাবে দৈবশক্তির সহায়তা প্রার্থনা করতে গিয়েই একাধিক অভিসারী কবি ঈশ্বরের কাছে নতজানু। ঈশ্বর ভালো কি মন্দ সে বিচার না ক'রে স্পষ্টতই মেনে নিতে হবে ঈশ্বরকে অবলম্বন করলে সংগ্রামী মানুষের আত্মিক দুর্বলতা চিনতে অসুবিধে হয় না। সেই দুর্বলতাকে অতিক্রম করতেই পরম-আত্মিক সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টায় যে সব কবিরা ঈশ্বরের কাছে নতজানু—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাঁদেরই মূলকেন্দ্রে—মধ্যমণি শিল্পী। এবং অক্ষয় তাঁর প্রতিষ্ঠা।

আমাদের রবীন্দ্রনাথও ঈশ্বর-অনুগত অভিসারী কবিদের মধ্যে আর একটি শিবির গড়ে তুলেছেন যেখানে সুকান্ত ভট্টাচার্যেরা প্রবেশ করেন না। ঈশ্বরানুগত কবিদের লেখায় 'সংগ্রাম বোধ' ক্রমান্বয়ে চেতনায় সঞ্চারিত হতে চেষ্টা করে—

সংঘর্ষের দাবানল উদ্দীপিত করে না। এঁরা সকলেই যন্ত্রণা-বিদগ্ধ—পরিণতিতে কেউ ভস্মীভূত—অনেকে উত্তীর্ণে উজ্জ্বল। সুকান্ত ভট্টাচার্যের বয়েস ও যন্ত্রণাবোধ সেই পরিণতি ও উত্তরণের দরজায় পৌঁছতে পারে নি। একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

তবু সুকান্তের যন্ত্রণাবোধ সত্য।

পূর্বাভাসের কবিতাগুলো বেশির ভাগ লেখা উনিশশো চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশের মধ্যে অর্থাৎ সুকান্তর বয়েস তখন ষোলো থেকে আঠারো। চুয়াল্লিশ ও পরবর্তীকালের কবিতাও কয়েকটি আছে। কবিতার কতকগুলো চিত্রকল্পের মধ্যেই সুকান্তের যন্ত্রণাবোধ প্রোথিত সত্তা নিয়ে আর্তি-মুখর। চল্লিশ সালে উনিশে নভেম্বর বিদীর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ থেকে তিনি যন্ত্রণাক্ত রূপকল্পে প্রতিসারিত হয়েছেন—

"সুষুপ্ত যক্ষেরা নিত্য কাঁদিছে ক্ষুধায়
ধূর্ত দাবাগ্নি আজ জ্বলে চুপে চুপে,
প্রমত্ত কস্তুরী মৃগ ক্ষুব্ধ চেতনায়
বিপন্ন করুণ ডাকে তোলে আর্তনাদ।

মৃত্যু অভিযাত্রী মানুষকে কবি সেদিন দেখেছিলেন। যৌবনের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে নবনায়ক সুকান্ত রঙিন স্বপ্নের প্রজাপতি দেখেন নি—পরিবর্তে অসহনীয় যন্ত্রণার ছবি কালো কালিতে আঁকা হল।

"সুপ্তোত্থিত পিরামিড দুঃসহ জ্বালায়
পৈশাচিক ক্রুর হাসি হেসে
বিস্তীর্ণ অরণ্য মাঝে কুঠার চালায়।
কালো মৃত্যু ফিরে যায় এসে॥"

পদাহত মৃত্যু কিন্তু ফিরে এল কয়েকদিন পরেই 'স্বপ্নপথ' তারই সাক্ষ্য। আলোর প্রজাপতিরা পলাতক দুরাশার স্রোতে ভগ্নপোতের মৃতদেহ। আমাদের সুস্থ হয়ে বাঁচতে চাওয়া যখন মুখ থুবড়ে পড়ল তখনই নতুন অভিযাত্রী সুকান্ত কেঁদে উঠেছেন অতিতীব্র স্পর্শকাতরতায়। রক্তাক্ত মানুষের অভিষেক সেদিন কিশোর কবির অশ্রুপাতে—

"একদিন পথে যেতে যেতে
উষ্ণ বক্ষ উঠেছিল মেতে
যাহাদের, তারাই সংঘাতে
মৃত্যুমুখী, ব্যর্থ রক্তপাতে॥"

আরোগ্য কাব্যের রবীন্দ্রনাথ যে নতুন মমতায় পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরেছেন সমধর্মী আকৃতিতে সুকান্ত মাটি ঘাসকে ভালোবেসেছেন 'হে পৃথিবী' কবিতায়। বয়েসটা তখন উনিশের তবু কি গভীরে তার কবিমনের সঞ্চরণ। মিছিলেরা ঘাস দলে চলে গেছে বরাবর—কবি চেয়েছে সেই মিছিলের পতাকায় শপথ লিখে দিতে। তবু প্রভাত পাখির গানে কান ভরেছেন, ঘাসে ঘাসে সেই কবিমনের অভিসারী বিস্ময়বোধের শিহরণ কেঁপে কেঁপে উঠেছে—জীবনকে অভিনন্দন জানিয়েছে—প্রভাত পাখির কলস্বরে | যে লগ্নে করেছি অভিযান, | আর তার তিক্ত অবসান | তবুতো পথের পাশে পাশে | প্রতি ঘাসে ঘাসে | লেগেছে বিস্ময় | সেই মোর জয়॥

পূর্বাভাসের কবি আরো গভীরতায় নেমেছেন 'স্মারক' কবিতায়। চঞ্চল হাওয়ায়, খুশি রজনীগন্ধার বনে, বলাকার পাখায়, বন্যার মহাবেগে অভিসারী চেতনা অতিতীব্র গতিবেগে অনুভববেদ্য। জীবনে পূর্ণতার জন্যে সংগ্রামী কবির সেই উন্মুখ অথচ ব্যর্থ প্রতীক্ষা, এক অনুপম অশ্রুশিল্প। শ্রাবণের মেঘের সজলতা আর রজনীগন্ধার মৃদুমন্থর সুগন্ধ সেই বেদনাকে ঘনীভূত ক'রে তুলেছে—

"কাহার চকিত-চাহনি অধীর পিছনের পানে চেয়ে
কাঁদিয়া কাটায় রাতি,
আলেয়ার বুকে জ্যোৎস্নার ছবি সহসা দেখিতে পেয়ে
জ্বালে নাই তার বাতি;
কাঁদিয়া কাটায় রাতি।"

চল্লিশ সালের নভেম্বরেই সুকান্ত 'নিবৃত্তির পূর্বে' কবিতায় দেখলেন—এবং চিনলেন: দৃষ্টিহীন আকাশের নিষ্ঠুর সান্ত্বনা: | ধু-ধু করে চেরাপুঞ্জী—সহিষ্ণু হৃদয়।

ক্যাপিটালিস্ট সমাজব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট কবিদের মতোই সুকান্ত যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছেন—আশাহীনতার মরুপ্রান্তে সমাধিস্থ হবার আগে মুখ তুলে দেখলেন নিজেরই রক্তে উত্তপ্ত বালুকা ভিজে উঠেছে—পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনে হল সাধারণ মানুষেরা নিতান্ত 'বুদ্বুদ মাত্র'। এ অনুভূতি বৈদিক চেতনার সমগোত্রীয় নয়—ঈশ্বরের কাছে নতজানু ভক্তের সত্যদর্শনও নয়। দুঃখ ক্রমশ শ্লেষাক্ত পথ খুঁজছে—আর সেই কারণেই তাঁর মনে হয়েছিল—এ-পৃথিবী অত্যন্ত কুশলী, | যেখানে কীর্তির নামাবলী, | আমাদের স্থান নেই সেথা···আমরা শক্তের ভক্ত, নহি তো বিজেতা॥

চল্লিশের ডিসেম্বরেই সুকান্ত দুঃখভার নামিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলেন চাইলেন রীতিমতো শক্ত হয়ে। প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখী হতে হবে তাই তিনি সতর্ক পদাতিক; মনেরে জানায় সাবধান হুঁশিয়ার; | খুঁজে নিতে হবে পুরাতন হাতিয়ার | পাণ্ডুর পৃথিবীতে।

অভিসারী কবির দুঃখবোধ এক অবসাদ টেনে আনে। নতুন যুবক সুকান্তকেও সেই অভিসারী যন্ত্রণা ও অবসাদ রেহাই দেয় নি। গোধূলিতে দেখেছেন শেষ হয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি—সন্ধ্যার মধ্যে পেয়েছেন স্থির বিষণ্নতা, তারাদের নীল আলোতে অসহ অবসন্নতা। একচল্লিশ সালে অক্টোবরের লেখা 'আলো-অন্ধকার' কবিতা সেই অবসন্নতার একটা বড় দলিল। এই অবসন্নতা থেকে মুক্তি পরের বছর জুনে। নতুনকে গড়তে গিয়ে পুরনোকে ভেঙে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিল। জীর্ণতাকে মেরামত ক'রে মানুষের আর চলতে পারে না, এতএব দুঃখের অবসাদের সমুদ্রে 'তরঙ্গ ভঙ্গ' দেখা দেবে এতে আর আশ্চর্য কি? অবসাদ উত্তীর্ণ হতে গিয়ে অনিবার্য ধ্বংস ঝোড়ো হাওয়ার আঘাত হেনেছে। আজ জীবনেতে নেই অবসাদ! | কেবল ধ্বংস, কেবল বিবাদ— | এই জীবনের একী মহা উৎকর্ষ! | পথে যেতে যেতে পায় পায় সংঘর্ষ।

কিন্তু কবির সংশয় মুক্তি তখনো ঘটে নি। প্রচলিত পুরাতনের প্রতি প্রথাগত আনুগত্যকে অতিক্রম করতে পারছেন না তরঙ্গ ভঙ্গ ২ সংখ্যক কবিতায় সকালে বিকালে দুটো নুন-ভাতের সঙ্গে চেয়েছেন প্রথাগত শান্তি—তাইতো নিষ্ঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি। | এর চেয়ে ভালো মনে হয় আজ পুরনো দিন, | আমাদের ভালো পুরনো, চাই না বৃথা নবীন।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের চিত্রকল্পগুলো সবই ক্ষোভসঞ্জাত। ফলে সেগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম আছে। স্মৃতি ব্যাপারটা কখনো তার কাছে বিপন্ন, কখনো বিবর্ণ। সূর্য কখনো স্তিমিত, কখনো ক্লান্ত। ক্ষোভ থাকলেও তারই মধ্যে অনেক মুহূর্ত সুকান্তের প্রাণের অস্পষ্ট প্রশাখায় | ফোটায় সবুজ ফুল, | উড়ে আসে কাব্য প্রজাপতি।

সমস্ত আয়োজনকে কবি নিজেই একসময়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে চান। কারণ? স্পষ্টতই জেনেছেন আজকের দিন নয় কাব্যের—

আজকের সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের। কেন এমন ভাবনা আর রূপকথা ক্রমে কবিকে অধিকার ক'রে ফেলেছে তার সদুত্তর পেতে হলে বিয়াল্লিশ সালে লেখা 'অসহ্য দিনে' যেতে হবে—

"অসহ্য দিন ! স্নায়ু উদ্বেল ! শ্লথ পায়ে ঘুরি ইতস্তত
অনেক দুঃখে রক্ত আমার অসংযত !
মাঝে মাঝে যেন জ্বালা করে এক বিরাট ক্ষত
হৃদয়গত।
ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে
দিনরাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে।
এখানে ওখানে পথ চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত,
মনে হয় যেন জীবন ধারণ বুঝি খানিকটা অসংগত ॥

এই সচেতনতা কিন্তু অনেক আগেই কবিকে নাড়া দিয়েছে, আমরা পেছনে ফিরলেই দেখতে পাবো চল্লিশ সালে লেখা 'পরিবেশনে' ঈশ্বর, পুরাতন বিশ্বাস, প্রথানুগত্য ইত্যাদির মুখে তরল ঘৃণা আর ব্যঙ্গের রসায়ন ছুঁড়ে দিয়েছেন যার মধ্যে উদ্ধত বিদ্রোহী শেলীকে দেখাও যেতে পারে—

"ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে, আগমনী পশ্চিমা হাওয়ায়
সুপ্রাচীন গুরুভক্তি আজো আনে উন্মত্ত লালসা।
চুপ করে বসে থাকো অন্ধকার ঘরে এক কোণে :—
রাম আর রাবণের উভয়েরই হাতে তীক্ষ্ণ কশা।"

বিভীষণের কালে সুকান্ত পশ্চাদ্ধাবন শুরু করেছেন। শত্রু এখন ভীরু পলাতক কবির ঘোষণা—'আমরা সবাই প্রস্তুত আজ।' অভিসারী বিরক্ত ও অবসন্নতা থেকে সুকান্ত ছুটলেন এবার অভিসারী অভিযাত্রায়। তাঁর রূপকল্পে নায়ক 'এখানে কৃষক বাড়ায় ফসল মিলিত হাতে'।

এরপরই যুদ্ধোন্মত্ত সৈনিক কবির প্রদীপ্ত হুংকার—পণ করো, দৈত্যের অঙ্গে | হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো একসঙ্গে ; | সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির, | দিন নেই তর্ক ও যুক্তির—কারণ জাগবার দিন আজ। যন্ত্রণা থেকে সংঘর্ষ ও সেই সংঘর্ষেই ক্ষুব্ধ কবিচিত্তের মুক্তি। পাঞ্জা লড়তে আর এখন ভয় নেই—যদি মরতে হয় সেও ভালো—মরেও প্রমাণ করা যেতে পারে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল। অতএব সেদিন সকলকে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন 'তাই আজ ফেলে দিয়ে শিল্পীর তুলি আর লেখনী, | একতাবদ্ধ হও এখনি' ॥ ঘুমভাঙার গানে অবনত বিন্ধ্যাচলকে বললেন উঠে দাঁড়াতে—মুক্তি অর্জন করতে। 'হদিশ, কবিতায় সুকান্ত পুরোপুরি সৈনিক। সেই কবি সেনাপতির প্রাণে হাতছানি

দিয়ে গেল শস্তের উন্নত শীষ, | জনযাত্রার নতুন হদিশ— | সহসা প্রাণের সবুজে সোনার দৃঢ় উষ্ণীষ॥'

এখন আর পুরাতন রূপকথাকে বিদায় জানাতে দ্বিধা নেই—হে রাজকন্যে | তোমার জন্যে | এ জনারণ্যে | নেইকো ঠাঁই— | জানাই তাই॥

পূর্বভাসের সুকান্ত আত্মবিচারণায় নেমেছেন চুয়াল্লিশ সালের একটি লেখায়—

"কত সান্ত্বনা খুঁজেছি আকাশে গভীর নীলে
শুধু শূন্যতা এনেছে বিষাদ এই নিখিলে
মূঢ় আতঙ্ক জন-মিছিলে।
ক্ষতবিক্ষত চলেছি হাজার, তবুও একা
সামনে বিরাট শত্রু পাহাড় আকাশ ঠেকা
···সঙ্গীবিহীন প্রাণধারণে।"

সুস্থ জীবনের প্রাঙ্গণ অধিকারে শপথবদ্ধ সুকান্ত উদ্যোগী হয়েছেন বিয়াল্লিশেই। উদ্বেগ ত্যাগ ক'রে উদ্যোগ করেছেন নতুন পৃথিবী গড়ার—

"মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।
ঘরে তোলো ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।
আজ দৃঢ় দাঁতে পুঞ্জিত হাতে প্রতিরোধ করো শক্ত,
প্রতি ঘাসে ঘাসে বিদ্যুৎ আসে জাগে সারা অব্যক্ত।"

এখানেই সুকান্তের কবিত্বের মুক্তি ঘটে গেল। তারপর তাঁর কোরক যন্ত্রণা রক্তগোলাপ হয়ে ছুটল। পূর্বভাসের কবিতা পূর্ণতার বিচারে দুর্বল সন্দেহ নেই তবু রবীন্দ্রনাথের মানসীর পিছনে কড়ি ও কোমলেও যে ছায়া অস্তিত্ব—এক্ষেত্রেও তাই। পূর্বাভাস উদ্ধত মিনারের মূল ভিত্তি।

সুকান্ত-প্রসঙ্গে : কিছু প্রয়াণোত্তর স্মৃতি ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

প্রেরণাটা বাইরের নয়, তাগিদটা অন্তরের।

অনেকদিন ধরেই ভাবছি, সুকান্ত সম্পর্কে লিখবো। আমাকে লিখতেই হবে

কিন্তু কি লিখবো ? কেমন ক'রে লিখবো ? এমনি সব নানা প্রশ্নে বিচলিত থেকেছি দীর্ঘকাল। তিনি যে আমার জন্যে বিশেষ কোনো স্মৃতি রেখে যান নি !

অরুণাচল বসু ছিলেন ওঁর দীর্ঘকালের বন্ধু। ভূপেন ভট্টাচার্যও। সরলা দেবীকে ভালোবাসতেন তিনি মায়ের মতো। সুভাষ মুখুজ্জে দেখেছেন ওঁর চৌদ্দ বছরের কৈশোর, আর প্রথম যৌবনের দিনগুলি।

আর, আমি ?

না, সে দাবি আমার নেই। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচিত ছিল না কোনোদিন। স্মৃতি-বিস্মৃতির এপার-ওপার করেও বলতে পারি না, ঠিক কেমন ছিল তাঁর গায়ের রঙ, তিনি লাজুক ছিলেন কি ছিলেন না, কিংবা কেমন ছিল তাঁর কথা বলার ভঙ্গি।

তাহলে কি তাঁর কবিতা নিয়েই লিখবো একটা প্রবন্ধ ?

না, লিখতে সাহস হয় না। কেমন যেন ভয় ভয় করে। তাঁর কবিতাগুলির পরিমাপও যে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তাঁরই জীবনের সমান। এতটুকু কম কিংবা বেশি নয়। সেজন্যেই নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে তার কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। টীকা-টিপ্পনী ছাড়াই তিনি স্বয়ংপ্রকাশ।

তবে ?

এই 'তবে'র জন্যই লিখতে পারি নি কোনো কিছু। তাই দ্বিধার জন্যই এত দীর্ঘকালের অপেক্ষা।

আজ মনে পড়ছে, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আমারও একটা পরিচয় ছিল। এখনো আছে। সেকথা কাউকে বলা যায়। দেখা মানুষের চেয়েও তাঁর স্মৃতি বড় উজ্জ্বল, আবেগময়।

থাক সে পরিচয় একান্ত গোপন, একান্ত প্রচ্ছন্ন।

রক্তের গভীরতায় আজও তাঁর ডাক শুনতে পাই। তিনি আমাকে ডাকেন।

২ সুকান্তের ছবি

প্রায় দুই দশক আগের কথা।

সুকান্তর একটা ছবি এঁকে দিয়েছিলেন আমার এক আর্টিস্ট বন্ধু। আমি সেটা বাঁধিয়ে রেখেছিলাম ঘরের দেয়ালে।

ছবিটা আজ নেই।

মিত্রকে স্থান দিয়েছিলাম তাঁর পূর্বসূরী হিসেবে। একজন বললেন, সুকান্ত আসন্নকালের বার্তাবহ কবি। তাঁর কবিতায় আমরা শুনেছি, অনাগত কালের মানুষের ভাষা, ভবিষ্যতের পদধ্বনি!

তরুণ অধ্যাপক আমাদের সঙ্গে একমত হতে পারেন না।

তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, সুকান্তের কবিতা সজীব, প্রাণবান, বেগবান—ঠিকই। কিন্তু তাঁর কবিতায় নেই আধুনিক মানুষের জটিল, অন্তর্দ্বন্দ্বমুখর ব্যক্তি-সত্তার প্রতিফলন। শিল্পবোধের ন্যূনতা রয়েছে কবিতার কারুকৃতিতে। উপমাগুলিও সাধারণ।

আমরা ক্ষেপেই উঠেছিলাম তাঁর কথা শুনে, রাখুন মশাই, আপনার পণ্ডিতি আলোচনা।

সুকান্ত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন।

পরে, সেই বৈঠকেই, তিনি সুকান্তর 'বোধন' কবিতাটি আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলেন আমাদের। আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম।

একটি কবিতার ইতিকথা ॥ প্রদ্যোৎ গুহ

সুকান্ত আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট ছিল। কিন্তু লেখা শুরু করি দু'জনে প্রায় একই সময়ে। সুকান্তর প্রথম লেখা কোথায় ছাপা হয়েছিল জানি না। তবে অধুনালুপ্ত 'অরণি' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রায় বের হত। আমিও ছিলাম 'অরণি'র নিয়মিত লেখক। সেই সূত্রে তার লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

যুদ্ধের সময় কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলাম। ১৯৪৫ সালে কলকাতা ফিরে সুকান্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল। তখনই ওর শরীর বেশ খারাপ, কানেও একটু দোষ হয়েছে। একটু পাকা পাকা কথা বলত। কবি হিসাবে তখনই সে যথেষ্ট বিখ্যাত।

আমরা তখন ছাত্র আন্দোলন ছাড়ব ছাড়ব করছি। কিন্তু ছাত্র ফেডারেশন আপিসে আসি যাই। 'ছাত্র-ফেডারেশন' নামে একটি বুলেটিন বের করার পরিকল্পনা হচ্ছিল। আমি হয়েছিলাম তার প্রথম সম্পাদক।

সুকান্ত তখন কিশোর নেতা। স্বাধীনতার কিশোর সভা বিভাগের সম্পাদক

ফেডারেশন আপিসে তার সঙ্গে দেখা হত, কথাবার্তাও হত। সাল-তারিখ মনে নেই। এই সময় ছাত্র-ফেডারেশনের একটি শিবির হয় বেলুড়ে। আমরা সবাই সেই শিবিরে গিয়েছিলাম। শিবিরে একটি দেয়াল পত্রিকা বের হত। তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম আমি আর অলকা মজুমদার, এখন চট্টোপাধ্যায়। শরীর খারাপ ছিল বলে সুকান্ত এই শিবিরে যেতে পারে নি। কিন্তু দেয়াল পত্রিকার জন্যে একটা কবিতা দিয়েছিল। কবিতাটি টুকে এনেছিলেন অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। অন্নদা তখন প্রাদেশিক ছাত্র-ফেডারেশনের সম্পাদক।

এই কবিতাটির যে সুকান্তের কাছেও কোন কপি ছিল না, জানতাম না। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্রে' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয় নি দেখে ভেবেছিলাম পরে হয়তো কোনো সংকলনে এটি অন্তর্ভুক্ত হবে। কবিতাটির নাম ছিল 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে'।

বেলুড় শিবির থেকে ফেরার অল্পকাল পরেই আমি ছাত্র-আন্দোলন থেকে বিদায় নিই। যোগ দিই 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় বিভাগে। অলকা একদিন এসে বললেন, সুকান্তর শরীর খারাপ, ও পারছে না, আপনি স্বাধীনতার কিশোর বিভাগের ভার নেবেন?

আমি তো স্বাধীনতায় ঢোকার জন্যে উঁচিয়েই ছিলাম, অতএব রাজী হয়ে গেলাম এক কথাতেই।

অলকা আমাকে নিয়ে গেলেন নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে। তখন স্বাধীনতার সম্পাদক ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। কিন্তু দৈনন্দিন কাজের দেখাশুনা করতেন নৃপেনদা।

'ছাত্র-ফেডারেশনের' বুলেটিনে আমার লেখা পড়েছিলেন নৃপেনদা। স্বাধীনতায় আসতে চাই শুনে তিনি খুবই খুশি। কিন্তু তিনি বললেন, 'কিশোর সভা' ক'রে কি হবে, তুমি সরাসরি সাংবাদিকতার কাজে লেগে যাও। তাই হল, আমি হলাম শ্রমিক বিভাগের রিপোর্টার। 'কিশোর সভা'র ভার শেষ পর্যন্ত বোধহয় নিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কিছুকাল পরে সুকান্ত মারা গেল।

ইতিমধ্যে অনেক টালমাল ঘটল। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী হল, স্বাধীনতা বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। আমরা অনেকেই গোপন কাজে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হলাম।

এই দুঃস্বপ্নের অধ্যায় একদিন শেষ হল। গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে

কি করব কি করব ভাবছি—এমন সময় কয়েকজন বন্ধু একটি কাগজ বের করতে উদ্যোগী হলেন। কাগজ বের করার শখ আমার চিরকালের। আমি তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম।

এই সময় সুকান্তর কবিতাটির কথা আমার মনে পড়ল। কাগজ-পত্রের মধ্যে সেই দেয়াল পত্রিকার পাণ্ডুলিপি পেয়েও গেলাম। দেখা গেল সুকান্তর এই কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত হয় নি। আমরা মহানন্দে কবিতাটি ছেপে দিলাম। এটা ছিল ১৯৫০ সালের ঘটনা।

সুকান্তর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হল। সম্পাদকীয় মন্তব্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বললেন, কবিতাটির কোথায় নাকি ছন্দ-পতন ছিল, যাঁরা কপি করেছেন তাঁরাই এর জন্য দায়ী, কেননা ছন্দের ব্যাপারে সুকান্ত খুব হুঁশিয়ার ছিলেন। হতে পারে। অন্নদা কবি নয়, আমিও অকবি—হয়তো আমাদেরই ভুল হয়ে থাকবে। অতএব, ভৎর্সনা শিরোধার্য। তবে একটু আত্মপ্রসাদ আমার চিরকাল থাকবে, দেয়াল পত্রের পাণ্ডুলিপিটি যত্ন করে না রাখলে সুকান্তর এই কবিতাটি লুপ্তই হয়ে যেত।

গণসংগীতে সুকান্ত ।। গোবিন্দ হালদার

গণজাগরণ বা গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে সংগীত একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। মানুষের মনে প্রেরণা বা উন্মাদনা জাগাবার পক্ষে সংগীতের প্রভাব যে কতপ্রবল, তার অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়ানো আছে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের জাতীয় আন্দোলনের এবং গণনাট্য সঙ্ঘের প্রগতিশীল সংস্কৃতি-আন্দোলনের ফেলে আসা বহু ঐতিহাসিক দিনগুলোতে। অবশ্য প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বেই বিভিন্ন গণআন্দোলনে ব্যবহৃত সংগীতের মধ্যে দু'টি সুস্পষ্ট পৃথক ধারা বর্তমান ছিল।

একটি হ'ল দেশের বুদ্ধিজীবী বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত পরাধীনতার বন্ধনমুক্তির জাতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে উৎসারিত দেশাত্মবোধক বা স্বদেশী সংগীতের ধারা ; আর একটি, মার্কসবাদ প্রভাবিত দেশের শ্রমিক-কৃষক-মজুর তথা মেহনতী মানুষের নেতৃত্বে সংঘটনীয় শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শে বিশ্বাসী নতুন প্রগতিবাদী সম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ সংগঠন গণনাট্য সঙ্ঘের প্রবর্তিত নব সংগীতের ধারা।

এই দুই ধারায় প্রথম ধারার গণজাগরণমূলক সংগীতের মূল লক্ষ্য ছিল অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিকায় দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ তথা জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলা, আর সেই সঙ্গে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সঞ্চারিত ক'রে দেশমাতার শৃঙ্খল মুক্তির সাধনায় আত্মদান করার জন্য দেশবাসীর মনকে সৈনিকরূপে প্রস্তুত করা।

তাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি কবির যে সকল স্বদেশী সংগীত তখন দেশের জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সভা-সমিতি মিছিলে ব্যাপকভাবে গীত হত, তাদের মধ্যে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল।

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের যুগে এসেই প্রথম দেশাত্মবোধক গানের ধারায় 'গণসংগীতের' চরিত্র-লক্ষণ প্রকাশ পেল এবং তা দেখা গেল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনায়। নজরুল ইসলামই প্রথম সমাজের শোষিত নিপীড়িত মেহনতী মানুষের বেদনাকে তাঁর কবিতা-গানের মধ্য দিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরলেন। 'নবযুগ' ও 'লাঙ্গল' পত্রিকার পাতায় পাতায় শ্রমিক ও কৃষকদের দুঃখ-বেদনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শোষণ-মুক্তির দাবিও কবিতায় তিনি প্রথম ঘোষণা করলেন। সেই হিসাবে বিচার করতে গেলে কাজী নজরুল ইসলামই বাংলার প্রথম সাম্যবাদী কবি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি যে সে-যুগের ব্যাপক প্রচারিত মার্কসীয় দর্শনের বৈজ্ঞানিক দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে সচেতনভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজে নেমেছিলেন তাঁর কবিতা-গানের মাধ্যমে—একথা মনে করলে ভুল হবে। একদিকে অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল বন্যা, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনে নরনারী নির্বিশেষে বাংলাদেশের মানুষের উপর স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসকের নির্মম অত্যাচার কাজী নজরুলের কবিচিত্তকে বিদ্রোহী ক'রে তুলেছিল। তদুপরি শ্রমজীবী মানুষের উপর সমাজের অবিচার ও শোষণ দেখে দেখেও তিনি তাঁর রচনায় সাম্যের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সমস্ত অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের গান গেয়েছিলেন, আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন, শৃঙ্খল ভাঙার। নজরুলের এ বিদ্রোহ যতটা না খাঁটি মার্কসইজমের প্রেরণাসঞ্জাত, তার চেয়েও বেশি ছিল তাঁর মানবদরদী কবিপ্রাণের প্রচণ্ড আবেগজাত। তবুও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, যে, পরবর্তীকালে মার্কসীয় দর্শনকে ভিত্তি ক'রে মেহনতী জনগণের সুখ-দুঃখ

দাবিদাওয়া প্রকাশের এবং শোষণমুক্তির সংগ্রামে জনতার কণ্ঠকে আরও বলিষ্ঠ ক'রে তোল্যার জন্য যে গণসংগীতের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল, তার সূচনা হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যেই।

বর্তমান শতাব্দীর তিরিশ ও চল্লিশের দশক শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই নয়, সারা ভারতবর্ষের পক্ষেই একটা প্রচণ্ড আলোড়নের যুগ বলে চিহ্নিত। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণজনিত ভারতবাসীর মনে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার অবিসংবাদিত আদর্শের প্রভাব বিস্তৃতি, ১৯৩১-এ দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যবাদের সীমাহীন অত্যাচার ও অবিচার, ১৯৩৯-এর দ্বিতীয় মহাসমর—১৯৪২-এ তার ভয়াবহ রূপ, ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন ও বন্যা, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, ১৯৪৫-এর আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী-মুক্তি আন্দোলন, ১৯৪৬-এর তেভাগা আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ, সর্ব-ভারতীয় ডাক ও তার ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এ দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ—একের পর এক ঘটনার ঘন ঘটনায় তিরিশ ও চল্লিশের দশক প্রায় সদা সচকিত।

প্রতিটি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সে সময় বাংলার রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন যেমন বিপুলভাবে আলোড়িত হয়েছে, তেমনি তার সাংস্কৃতিক জীবনেও এসেছে বিরাট পরিবর্তনের ঢেউ।

ইতিপূর্বে বিশের দশক শেষ হবার আগেই এদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ঘটেছে এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে তাঁদের কার্যকলাপের দিকে জনসাধারণের সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনের ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র স্বীকার ক'রে নিয়েও তাঁরা এর বুর্জোয়া দিককে উদ্ঘাটিত ক'রে দিলেন। কারণ তাঁদের মতে ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের দিক থেকে এই আন্দোলনের লক্ষ্য বহু পশ্চাৎপদ ছিল। তাছাড়া এই আন্দোলনের শ্রেণী হিসাবে কৃষক ও শ্রমিকের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং শ্রেণীসংগ্রামের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। তাই অহিংসার পথকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করলেন। সোভিয়েত বিপ্লবের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মার্ক্‌স ও লেনিন নির্দেশিত পথে মেহনতী জনতার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা তাঁরা শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করাকেই তাঁদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন। এই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপদানের পথে সর্বশ্রেণীর শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি মেহনতী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও শ্রেণী সচেতন ক'রে

তুলে শ্রেণীসংগ্রাম তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই হল তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচীর অন্তর্গত।

এই কর্মসূচী সাহিত্য-সংগীত-নাটক অর্থাৎ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হল। আর তার ফলেই তিরিশের দশকের শেষভাগ থেকে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে মার্কসীয় দর্শন বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করল। সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত নবযুগের নতুন স্রষ্টাদের হাতে বাংলার সাহিত্য-সংগীত-নাটক-কবিতা নবসৃষ্টির বেদনায় নতুন মোড় নিল, চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের' নেতৃত্বে এই সংস্কৃতি আন্দোলন একটি সংহত রূপ পেল। কিছুকাল পরে এই ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘই 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' এবং 'গণনাট্য সঙ্ঘ'—এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নাট্য-বিভাগ হিসাবেই গণনাট্য সঙ্ঘ আত্মপ্রকাশ করে।

'অনাহার, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ তখন বাংলাদেশকে বিধ্বস্ত করতে বসেছে। শিল্প-সংস্কৃতির কথা ছেড়ে দিলাম, মানুষের নিছক অস্তিত্বটুকুই তখন বিপন্ন। তাই সারা দেশ জুড়ে বাংলাকে বাঁচানো প্রাথমিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ালো। সারা দেশের সেই দুর্ভিক্ষ বিরোধী গণআন্দোলনের সঙ্গে গণনাট্য সঙ্ঘও ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাচ, গান, অভিনয়-এর ছোট ছোট গ্রুপ বেরিয়ে পড়ল সারা দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যার্থে। ভাষাগত ও প্রাদেশিকতার বাধা, সঙ্কীর্ণতা এই গণনাট্য আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গেল। সারা ভারত জুড়ে গণনাট্য আন্দোলনের জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে গেল দেশের যুবশক্তিকে। সমগ্র দেশ একসঙ্গে সেই সংগ্রামে শরিক হল।' তারপর প্রায় দুই দশক ধরে 'গণনাট্য সঙ্ঘ' বাংলাদেশের প্রগতিশীল সংস্কৃতি-আন্দোলনে অবিসংবাদী নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য মেহনতী মানুষের সংগ্রামে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। আজকের রাজনৈতিক দলাদলি এবং হানাহানি কণ্টকিত যুগে বসে সে-যুগের 'গণনাট্য সঙ্ঘে'র গণমনে বিপুল প্রভাবকে কল্পনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবু একথা সত্য, গণনাট্য সঙ্ঘ বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন পালাবদল ঘটিয়েছে।

গণআন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে গণসংগীতের প্রচলন ও প্রবর্তনও গণনাট্য সঙ্ঘের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট জাপানের নির্লজ্জ আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের জনমতকে সংগঠিত করার কাজেই প্রথম গণসংগীতের রচনা ও ব্যবহার

শুরু হয়। বিশেষ ক'রে চল্লিশের দশকে যুদ্ধ ও মহামারীজনিত আপামর জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশাকে উপলক্ষ্য ক'রে শোষকশ্রেণীর শোষণের নগ্নরূপকে প্রকট ক'রে তুলে নতুন আশা ও আশ্বাসের বাণী শোনাবার কাজে গণনাট্য সঙ্ঘের সাংগীতিক শাখার সংগীতগুলি সে-যুগে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অগণিত কবি, গায়ক ও সুরকারের সৃষ্টির দানে সে গণসংগীতের ভাণ্ডার ছিল সমৃদ্ধ। তার পুরোপুরি এবং যথাযথ ইতিহাস আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো প্রবন্ধে কেউ কেউ কিছু অতীত স্মৃতিচারণা করলেও গণনাট্য সঙ্ঘের সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত কেউ লিখে রাখার :চেষ্টা করেন নি। বাংলার প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের একটা অতীত অধ্যায়ের উজ্জ্বল ইতিহাস তা'হলে নতুন যুগের সংগ্রামী শিল্পীদের কাছে উন্মোচিত হ'ত এবং নব প্রেরণার উৎস হিসাবে নতুনদের পথ দেখাত। তবুও সে-যুগে গণনাট্য সঙ্ঘের সংগীত রচনা ও সুরসৃষ্টি পরিবেশনার কাজে যাঁরা অসাধারণ কৃতিত্ব ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শ্রীবিনয় রায়, শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস, শ্রীসলিল চৌধুরী প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম যুগে শক্তিশালী কবি ও প্রতিভাবান্ সুরস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নব জীবনের গান'ই সে যুগের প্রচলিত স্বদেশী সংগীতের ধারায় নবযুগের নতুন গণসংগীতের সৃষ্টিপ্রবাহকে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সলিল চৌধুরীর বিস্ময়কর সৃষ্টিপ্রতিভা গণসংগীতের কথা ও সুরে নতুন বলিষ্ঠতা এনে দিল। তারপর অগণিত কবি, সুরকার ও গায়কের, সৃজনীপ্রতিভার দানে সমৃদ্ধ হয়ে গণনাট্য সঙ্ঘের সংগীত ভাণ্ডার জনগণের সংগ্রামী চেতনায় নবযুগের অভ্যুদয়ের সূচনা করেছিল।

সুকান্ত সেই নবযুগ-প্রভাতেরই জাগ্রত বাণীকার। সুকান্ত অন্যান্যদের মতো সচেতন এবং সক্রিয়ভাবেই গণসংগীত রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন নি সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও, সুকান্তর অনেক কবিতার মধ্যে বিক্ষুব্ধ চল্লিশের দশক তার রূঢ় নগ্নতা এবং চারপাশের প্রচণ্ড ভাঙা গড়ার মধ্যে নতুন আশ্বাসের বার্তা নিয়ে যেভাবে নিজেকে উপস্থিত করেছিল, তাতে ছন্দগুণে দূরদর্শী এবং বলিষ্ঠ সুরকারের হাতে পড়ে সে-সব কবিতা গণনাট্য সঙ্ঘ পরিবেশিত গণসংগীতের ধারায় এক নতুন গতিবেগ এবং জীবন্ত প্রাণস্পন্দন জাগিয়েছিল। সংগ্রামী, মানুষের চেতনায় সেদিন তা বিদ্যুৎ-সঞ্চারের কাজ করেছিল। অবশ্য সুকান্তর কবিসত্তার বৈশিষ্ট্য ও তার প্রকাশভঙ্গীর ঋজুতাই ছিল অনেকখানি তার মূলে।

সুকান্তর সৃষ্টিশীল কবি জীবনের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। গণনায় এক দশকও হবে না। তা সত্ত্বেও কিশোর কবির অনেক রচনায় পরিণত চেতনার ছাপ সুস্পষ্ট। সুকান্তর কবি-জীবনের পটভূমিকা রচনা করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার মৃত্যু-বিভীষিকাময় পরিবেশ, বন্যা-মহামারী মন্বন্তরের সর্বগ্রাসী করাল কালো ছায়া। কিশোর সুকান্ত নিজের জীবনে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন কলকাতার বুকে সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট আক্রমণের নির্লজ্জ বীভৎসতা, দেখেছেন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে তের শ' পঞ্চাশের মন্বন্তরের মর্মন্তুদ দৃশ্য; দেখেছেন মনুষ্যত্বের সীমাহীন লাঞ্ছনা আর অপমান। তারই পাশাপাশি সুকান্ত দেখেছেন কলকাতার রাজপথে ১৯৪৫-এর ইংরেজ বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান, দেখেছেন একের পর এক জাগ্রত জনতার সংগ্রামী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ। 'সেদিনের অগ্নিগর্ভ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সুকান্ত অনুভব করেছিলেন নতুন যুগের সূচনা।' তাঁর কবিতায় অনিবার্যভাবেই তাই দেখা দিয়েছে তারই আশ্চর্য প্রতিফলন।

সুকান্তর কবিসত্তা নিজেকে একটা স্থির বিশ্বাসের আগুনে সর্বদা প্রজ্বলন্ত ক'রে রেখেছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁর কবিতাও বিশেষ একটা লক্ষ্যাভিমুখী। তার অবশ্য সংগত কারণও আছে। কিশোর বয়সেই সুকান্ত মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন পার্টির সাংগঠনিক কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন তেমনি তাঁর কবিসত্তাকেও ব্যবহার করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের বাহন হিসাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সুকান্তর কবিসত্তা ও তাঁর রাজনৈতিক সত্তার মধ্যে কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় নি। সুকান্ত অতি সহজেই এবং অনায়াসলব্ধভাবেই দুটোকে একসঙ্গে মেলাতে পেরেছিলেন। সেই হিসাবে বিচার করতে গেলে, সুকান্তই রাজনৈতিক জীবন ও তাঁর কবি জীবন ছিল পরস্পরের পরিপূরক। সুকান্তর কবিমানসের পরিমণ্ডল গঠনে এই মৌলিক সত্যটিকে মনে রাখলেই সুকান্তর কবিতায় তাঁর সংগ্রামী চেতনার স্বরূপটিকে উপলব্ধি করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

সুকান্তের রচিত গণসংগীতের মধ্যেও এই একই চেতনা প্রবলভাবেই ক্রিয়াশীল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ পরিচালনায় চল্লিশের দশকে যে নতুন গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল, কবি ও কর্মী সুকান্ত তাই স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে

গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কবিতায় তাই সে-যুগের আগুনের আঁচ, তাঁর গণসংগীতে তাই নতুন কালের আগমনী-ঘোষণা।

অবশ্য দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সুকান্তর যে সকল কবিতা সুরারোপিত হয়ে গণসংগীত হিসাবে সাধারণ্যে বহুল প্রচারিত হয়ে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার অধিকাংশ ঘটনাই ঘটেছে সুকান্তর মৃত্যুর পর। সুকান্ত মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কবি-প্রতিভার বিপুল স্বীকৃতি দেখে গেছেন তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে, কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে সাংগীতিক রূপান্তরের সম্ভাবনাও যে রয়েছে প্রচুর, তা তিনি জীবিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ ক'রে যেতে পারেন নি। সুকান্তর জীবিতকালে এবং তাঁর জীবনাবসান-পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর যে সকল কবিতা বা গান গণসংগীত হিসাবে গীত বা প্রচারিত হয়েছে, তার সম্পূর্ণ তালিকা ও প্রচারের ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। সেদিন তাঁর গানের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ ভিন্নতর কর্মক্ষেত্রে দূর-প্রবাসী; তাছাড়া স্মৃতি বড় বিশ্বাসঘাতক—সব সময় সে অনুকূল সহযোগিতাও করে না। তাই যাঁরা কাছে আছেন, তাঁরাও সব খবর বিস্তৃতভাবে দিতে পারেন নি। তবুও, বিভিন্ন সূত্র থেকে সেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তারই আলোয় সুকান্তর গণসংগীতের একটা সাধারণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। অবশ্যই সে তালিকা অসম্পূর্ণ। কালানুক্রমিক প্রচারের তারিখ, প্রতিটি গানের সুরকার ও তার গায়ক গোষ্ঠীর নামও দেওয়া যাবে না সব সময়, তবুও আগ্রহশীল পাঠকের কণামাত্র কৌতূহল যদি পরিতৃপ্ত হয় তাহলে, ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানীদের জন্য ইতিহাসের সূত্র ধরে রাখতে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সে আলোচনার পূর্বে, সংগীত-রচয়িতা সুকান্তর কিছু পরিচয় লাভ করা যাক। সুকান্ত যে একসময় সচেতন এবং সক্রিয়ভাবেই গান রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তার পরিচয় বিধৃত আছে 'সারস্বত লাইব্রেরী' প্রকাশিত 'সুকান্ত সমগ্র'র 'গীতি-গুচ্ছ' নামক অংশটিতে। এই অংশে সংকলিত উনিশটি গান সুকান্ত তাঁর সমবয়সী মামা শ্রীবিমল ভট্টাচার্যকে একটি খাতায় লিখে দিয়েছিলেন। মামা গান গাইতে পারতেন। কাজেই মামার অনুরোধেই যে গানগুলি লিখিত হয়েছিল তা অনুমান ক'রে নিতে কষ্ট হয় না। শোনা যায়, সুকান্তর বিমলমামাও নাকি গানগুলি সুর দিয়ে বিভিন্ন সময়ে গেয়েছিলেন। কিন্তু গানগুলির সাংগীতিক সাফল্য সম্পর্কে আজ আর প্রামাণিক তথ্য কিছু জানা যায় না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সুকান্তর এই গানগুলি তাঁর কবিচিত্তের এক অনাবিষ্কৃত নতুন দিককে উদ্‌ঘাটিত ক'রে তুলেছে। সে সুকান্ত আমাদের চেনা, প্রতিটি সংগ্রামী মিছিলের পুরোভাগে যার সোচ্চার বলিষ্ঠ কণ্ঠ, সাম্যবাদী আন্দোলনে যিনি একনিষ্ঠ কর্মী এই পৃথিবীকে নবজাতকের বাসযোগ্য ক'রে তোলার আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন জঞ্জাল সরাবার কাজে যাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—সেই জনতার কবি সুকান্তকে এখানে নতুনভাবে চিনতে হয়'। সুকান্তর বিপ্লবী কবিসত্তার অন্তরালে যে এই রূপ-রস-গন্ধভরা পৃথিবীর সৌন্দর্যপিপাসু আর এক গীতি-কবির প্রাণ লুক্কায়িত ছিল, এখানে তার একান্ত পরিচয় ধরা পড়েছে। সে সুকান্তর চোখে স্বপ্নের নীলাঞ্জন, মনে কল্পনার ইন্দ্রধনু-রঙ।

সুকান্তর এই গানগুলির ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিক বিচার করলে একথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, সেই কিশোর বয়সেই সুকান্ত গান রচনার কায়দাও অতি দক্ষতার সঙ্গেই আয়ত্ত করেছিলেন। কাজেই তিনি যদি সক্রিয়ভাবে গান রচনায় মনোনিবেশ করতেন, তাহলে বাংলার আধুনিক সংগীতের গায়কসমাজ যে ভবিষ্যতে কিছু উৎকৃষ্ট গানের 'বাণী' লাভ করতেন, একথা বলাই বাহুল্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, সুকান্তর উপরোক্ত গানগুলির ভাষা, ছন্দ ও ভাব প্রবলভাবে রবীন্দ্র প্রভাবিত। গান রচনায় সুকান্ত যে রবীন্দ্রনাথকেই পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন তার পরিচয় সুস্পষ্ট। তাই গানগুলির মধ্যে সুকান্তর যতটা না স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে, তার চেয়ে বেশী পড়েছে রবীন্দ্র-অনুসরণ প্রিয়তার প্রভাব। তবুও, এই রবীন্দ্র-অনুসরণও যে কিশোর কবি সুকান্তর পক্ষে কত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়েছে, তা নিম্নের একটি দৃষ্টান্ত থেকেই পরিষ্কার হবে :

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী মঞ্জুল মঞ্জরী ধ্বনি,
মম অন্তর-প্রাঙ্গণে আসন্ন হল আগমনী।
ঘুম ভাঙা উদ্বেল রাতে,
আধ-ফোটা ভীরু জ্যোৎস্নাতে
কার চরণের ছোঁয়া হৃদয়ে উঠিল রণরণি॥

মেঘ-অঞ্জন-ঘন কার এই আঁখিপাতে লিখা,
বন্দন-নন্দিত উৎসবে জ্বালা দীপশিখা।
মুকুলিত আপনার ভারে
টলিয়া পড়িছে বারে বারে
সংগীত হিল্লোলে কে সে স্বপনের অগ্রণী॥

*

আবার আমাদের পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসি। যতদূর জানা যায়, ১৯৪২ সালে জাপানী আক্রমণের সময় 'জনযুদ্ধের গান' নামক সংকলনে প্রকাশিত সুকান্তর 'জনযুদ্ধের গান' কবিতাটিই প্রথম 'গণসংগীত' হিসাবে গীত হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' কর্তৃক। এছাড়া 'বন্ধু, তোমরা ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত' (উদ্যোগ), ও 'ঐ কোহিমা মণিপুর বাংলাদেশের সীমানা' গান দুটিও সে সময় বহুবার গীত হয়েছে। গানগুলির সুরকার কে ছিলেন তা জানা যায় নি। 'ঐ কোহিমা মণিপুর বাংলাদেশের সীমানা' গানটি মণিপুরে জাপানী আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল এবং মণিপুর সীমান্তে প্রেরিত তৎকালীন গণনাট্য সঙ্ঘে একটি দল কর্তৃক গীত হয়েছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সেবার আদর্শ নিয়ে রচিত সুকান্তর 'অভিযান' গীতনাট্যটি 'কিশোর বাহিনী' কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল। রচনাটি কিশোরদের উপযোগী ক'রে রচিত। ফলে এই রচনার মধ্যে সুকান্তর প্রকৃত প্রতিভাকে অনুসন্ধান করতে যাওয়া বৃথা হবে। রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথের একাধিক নৃত্যনাট্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে 'অভিযান' গীতিনাট্যের মাধ্যমে সুকান্ত যে সে-সময় বহু কিশোর কিশোরীর চিত্তে বুভুক্ষা পীড়িত দেশের মানুষকে সেবা করার জন্য প্রেরণা জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা বলা বাহুল্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে রচিত 'সূর্যপ্রণাম' গীতিকাব্য সুকান্তর কিশোর বয়সের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এটি সম্ভবত ১৯৪০ সালে রচিত। গীতিকাব্যটি শক্তি নাগের দল কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের রচনা হলেও গীতিকাব্যটির অন্তর্গত গান ও কবিতা-গুলির রচনায় সুকান্তর পরিণত মনের এবং পাকা হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। কবিগুরুর প্রতি কবি কিশোরের যে কী অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, তা এই রচনাটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। দুর্ভিক্ষের সময় সুকান্ত রচিত আর একটি গান বিশেষ জন-প্রিয়তা অর্জন করেছিল বলে শোনা যায়। গানটির আরম্ভ হল—'ক্ষুধিতের সেবার ভার লও লও।' প্রখ্যাত গণসংগীতকার এবং গায়ক শ্রীবিনয় রায় গণনাট্য সঙ্ঘের দলে গানটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে গাইতেন বলে কথিত আছে।

সুকান্তর কবিতাকে গণসংগীত হিসাবে জনপ্রিয় ক'রে তোলার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বলতে গেলে, সুরকার সলিল চৌধুরীরই। সলিল চৌধুরীই প্রকৃতপক্ষে গণসংগীতকার সুকান্তের নবজন্মদাতা। সুকান্ত তখন লোকান্তরিত। সুকান্তর অকাল বিয়োগ ব্যথা তাঁর বহু সহকর্মী শিল্পী-কবি-সুরকারের মনে তখনো

জীবন্ত। সুকান্তকে নিয়ে নতুন পরীক্ষা শুরু হল। প্রতিভাবান্ সুরশিল্পী ও গণনাট্য সঙ্ঘের তখনকার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব সলিল চৌধুরী সুকান্তর 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি' এবং প্রায় সমসাময়িক সময়েই 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে' কবিতা দুটিতে সুর দিলেন। সময়টা সম্ভবত ১৯৪৯-৫০ সাল। গণনাট্য সঙ্ঘের 'শহীদের ডাক' নাটক তখন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে চতুর্দিকে অভিনীত হচ্ছে। তার সঙ্গে সলিল চৌধুরীর সুরে সুকান্তর গণসংগীত যুক্ত হয়ে গণনাট্য সঙ্ঘের মর্যাদাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। অল্পদিনের মধ্যে গান দুটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করল। ফলে গ্রামোফোন কোম্পানী বিচলিত হয়ে সুকান্তর গান দুটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রেকর্ড করল। সুকান্তর প্রথম গানের সাংগীতিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সলিল চৌধুরী অতঃপর সুকান্তর বিখ্যাত 'রানার' কবিতাটিতে সুরারোপ করলেন। সুরের গুণে 'রানার'ও সমভাবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করল এবং অবশেষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক রেকর্ড হল। শুধু গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীদের কণ্ঠেই নয়, গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডের দৌলতে সুকান্তর গণসংগীত বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হতে লাগল।

পঞ্চাশের দশকে সুকান্তর আর যে সকল কবিতা সুরারোপিত হয়ে গণনাট্য সঙ্ঘ কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে 'বেজে উঠ্‌ল কি সময়ের ঘড়ি (বিদ্রোহের গান)?', 'ঠিকানা আমার চেয়েছে বন্ধু (ঠিকানা)', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'হে সূর্য। শীতের সূর্য (প্রার্থী)', 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী', 'কারা যেন আজ দুহাতে খুলেছে, ভেঙেছে খিল (আমরা এসেছি)', 'বল্‌তে পারো বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে (পুরনো ধাঁধা)' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহের গান, ঠিকানা ও একটি মোরগের কাহিনী—কবিতা তিনটিতে সুরসংযোজনা করেন অধুনা প্রখ্যাত বংশীবাদক সুরস্রষ্টা শ্রীপরেশ ধর। পুরনো ধাঁধা কবিতাটিতে সুর দিয়েছিলেন সুরকার শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায়। গানটি একসময় রেকর্ডও হয়েছিল। এছাড়া সুকান্তর বিখ্যাত 'বোধন' কবিতার কিছু নির্বাচিত অংশও সুরারোপিত হয়ে গণসংগীত হিসাবে গীত হ'ত। সলিল চৌধুরী সুকান্তর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটিতেও সুর দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

সম্প্রতি লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত যুব উৎসবে এবং অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানে সুকান্তর 'লেনিন' কবিতাটি গণসংগীত হিসাবে অত্যন্ত সাফল্যের

সঙ্গে গীত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, কবি সুকান্তর আবাল্য সাথী ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি শ্রীঅরুণাচল বসু পরিচালিত 'নতুন সংস্কৃতি' সংস্থা। এই সংস্থারই একজন তরুণ সুরকার কবিতাটিতে সুরারোপ করেছেন। 'লেনিন' সুকান্তর বহুপঠিত অন্যতম বিখ্যাত কবিতা। কিন্তু গণসংগীত হিসাবেও 'লেনিন' কবিতাটি যে বর্তমানে সংগীত রসিক শ্রোতাদের মনে প্রভূত আগ্রহ সৃষ্টি করেছে তা বলাই বাহুল্য।

এছাড়া বাংলাদেশের কোনো কোনো প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা নিজেদের স্বাধীন এবং একক প্রচেষ্টায় সুকান্তের কোনো কোনো কবিতার সাংগীতিক পরিবেশনা নিয়ে এখনও যে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, তারও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা দরকার মনে করি। সুকান্তর এখনও এমন অনেক কবিতা অবশিষ্ট আছে, উপযুক্ত এবং প্রতিভাশালী সুরকারের হাতে পড়লে নতুন গণসংগীতের রূপ পেতে পারে এবং গণআন্দোলনে কাজে লাগতে পারে। তাছাড়া যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার—যে শোষণমুক্ত পৃথিবী সৃষ্টির জন্য সুকান্ত জীবনে ও কাব্যে নিরলস সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন, নিপীড়িত জনতার সংগ্রাম আজো শেষ হয় নি। তাই সুকান্তর কবিতা বা গণসংগীতের আবেদনও এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

সমস্ত দেশ জুড়ে আজ আবার নতুন ক্রান্তিকালের ঘোষণা। গ্রাম-বাংলার ক্ষেতে-খামারে মাঠে মাঠে আজ নতুন সংগ্রামের ডাক। কলে-কারখানায় মেশিনে-বয়লারে আপোসহীন লড়াইয়ের দুর্বার প্রস্তুতি। গ্রামে গঞ্জে-শহরে নগরে হাজার হাজার সংগ্রামী জনতার দুরন্ত মিছিল। শোষক-শোষিত আজ শেষ লড়াইয়ের মুখোমুখি। এই পরিস্থিতিতে আজ আবার ব্যাপকভাবে গণসংগীত প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কেননা আজকের দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনকে আরও সংহত ও দূরপ্রসারী ক'রে দিতে সময়োপযোগী গণসংগীতের প্রয়োজনীয়তা তর্কাতীত। তাই নতুন যুগের নতুন গণসংগীতের পাশাপাশি সংগ্রামী জনতার দোসর কবি সুকান্তর গণসংগীতগুলিও পুনরায় প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

কারণ, জনতার মুক্তি-সংগ্রামে জনতার পাশে পাশেই তো জনতার কবি সুকান্তর চিরদিনের যাত্রা।

কবির নিজের ভাষাতেই বলি :

সুকান্তর ছোটদের ছড়া-কবিতা

'আমি যাযাবর, কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি।'

সুকান্তর ছোটদের ছড়া-কবিতা ॥ দীপালী মিত্র

বড়দের জন্য সুকান্ত লিখেছেন কবিতা, আর সে কবিতাগুলি কী রকম সমাদৃত তা পাঠক মাত্রই জানেন। 'বড়োরা অবাক হয় সুকান্তর কবিতা পড়ে'। কিন্তু ছোটরা ?

এ প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: 'বড়োরা অবাক হয় সুকান্তর কবিতা পড়ে। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির ছড়া নয় একেবারে টাটকা হাতে গরম ছড়া। হাসতে হাসতে হঠাৎ হাত মুঠো হয়ে যাবে, চোখ দুটো জ্বলে উঠবে লাল টকটকে সূর্য ওঠা দিনের কথা ভেবে। এমন ছড়া বাংলাদেশে আর কেউ লেখে নি।'

আমাদের বাংলাদেশে ছোটদের সাহিত্যে ছড়া ও কবিতা লিখে সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু শিশু ও কিশোর মনকে জয় করেছিলেন। তাঁদের ছড়া তো সকলের মুখে মুখে। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' সুনির্মল বসুর মিষ্টি মধুর অগণিত ছড়া ছোটদের মনকে জয় করেছে।

সে তো প্রায় এক যুগ আগের কথা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব বদলে যাচ্ছে, তাই আজকের কিশোর মনও খুঁজে বেড়ায় রকেটের চাঁদের মধ্যে অভিযান। রেশনের লাইন দিতে গিয়ে চাল এনেছে কাঁকরের, অসহায় কিশোর ভাবে সে এত গরীব কেন? এই সব হাজার প্রশ্ন আজ সবাকার মনে জেগে উঠেছে। এ যুগের কবিরা তাই সচেতন ভাব প্রকাশ করেছেন তাদের ছড়ার মধ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া যেতে পারে অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া।

তাই অন্নদাশঙ্কর রায় 'খুকুর নালিশ' ছড়াতে বিদ্রূপের সুর দিয়ে জানালেন —

"তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো

তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো !
তার বেলা ?"

অন্নদাশঙ্কর রায় এ যুগের কিশোরদের কাছে নতুন সুর এনেছেন। চাঁদ দেখে যারা কাঁদত, যাদের বায়না ছিল চাঁদ মামাকে দেখবার জন্য, তাদের উদ্দেশ্য ক'রে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন :—

"আর কেঁদোনা খুকুমণি
চলে যাবো রকেটে,
চাঁদকে এনে রাখবে কোথা ?
ধরবে না যে পকেটে ?"

এ যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে সুকান্ত লিখলেন 'মিঠেকড়া' ছড়া। এই 'মিঠেকড়া' ছড়া প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

"...কলকাতার রাস্তায় বিষম এক মেলা। বন্দুকের সঙ্গে শুধু হাতের লড়াই। আশ্চর্য! এমন এক সাংঘাতিক কাণ্ড—তার মধ্যে মজা পেয়েছে সুকান্ত। গোটা বইতে এমনি সব মিঠে রসে ভেজানো কড়াপাকের ছড়া। সুকান্তই নিজে তাই তার নাম দিয়েছিল—'মিঠেকড়া'।

সুকান্ত কিশোরদের উদ্দেশ্য ক'রে নিজেই লিখলেন :—

"তোমরা আমায় নিন্দে ক'রে দাও না যতই গালি,
আমি কিন্তু মাখছি আমার গালেতে চুনকালি,
কোন কাজটাই পারি নাকো বলতে পারি ছড়া,
পাশের পড়া পড়ি না ছাই পড়ি ফেলের পড়া।"

[অতি কিশোরের ছড়া

'এক যে ছিল' নামক লেখাতে সুকান্ত বিশ্বকবির জীবন কাহিনী শোনালেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্তর অনুরাগ ছিল বরাবরই, 'এক যে ছিল' কবিতা পড়লে মনে হয় এ যেন রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যেমন :—

"এক যে ছিল আপন ভোলা কিশোর,
ইস্কুল তার ভাল লাগত না,
সহ্য হত না পড়াশুনার ঝামেলা
আমাদের চলতি লেখাপড়া সে শিখল না কোনোকালেই,

অথচ সে ছাড়িয়ে গেল সারা দেশের সবটুকু পাণ্ডিত্যকে।

কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না ॥" [এক যে ছিল

এমনিভাবে সুকান্ত বিশ্বকবির জীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন যা না পড়ে থাকা যায় না।

'ভেজাল' 'গোপন খবর' 'বিয়ে বাড়ির মজা' 'রেশন কার্ড' 'খাদ্য সমস্যার সমাধান' ছড়ার মধ্যে কিশোর জগৎকে সমস্যা আর সংকটের মধ্যে এনে দিয়ে তাদের কিশোর মনকে আন্দোলিত করেছে।

সুকান্ত তাই 'ভেজাল'-এ নিজেই বললেন, ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়, | ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়।

সুকান্ত 'বিয়ে বাড়ির মজা'তে খাদ্যাভাবের দিনেও অপচয় আর বিলাসের কথা চমৎকার ভাষায় কিশোরদের কাছেও তুলে ধরলেন।

এই ছড়ার একটু দৃষ্টান্ত দিতে গেলে আমাদের মনে হয় সুকান্ত তাঁর কিশোর বয়সে এই সমাজের মুখোসধারীদের চিনতে পেরেছিলেন, যেমন :—

"আসুন, আসুন—বসুন সবাই, আজকে হলাম ধন্য,
যৎসামান্য এই আয়োজন আপনাদেরই জন্য ;
মাংস, পোলাও, চপ-কাটলেট, লুচি এবং মিষ্টি
খাবার সময় এদের প্রতি দেবেন একটু দৃষ্টি।"

*　　*　　*

"বললে পুলিশ : এই কি কর্তা, ক্ষুদ্র আয়োজন ?
পঞ্চাশ জন কোথায় ? এই যে দেখছি হাজার জন।
এমনি ক'রে চাল নষ্ট দুর্ভিক্ষের কালে ?
থানায় চলো, কাজ কি এখন এইখানে গোলমালে :
কর্তা হলেন কাঁদো-কাঁদো, চোখেতে জল আসে,
গেটের পাশে জড়ো হওয়া কাঙালীরা হাসে ॥"

[বিয়ে বাড়ির মজা

সুকান্ত 'বিয়ে বাড়ির মজা'তে এমনি এক অসামাজিক চিত্র এঁকেছেন যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে খাদ্যাভাব সেখানে বিলাসীদের বাড়ির বিয়েতে অপচয়, আর তারই দুয়ারে দাঁড়িয়ে দুর্গতের দল আশায় চেয়ে আছে যদি কিছু পায়।

'পুরানো ধাঁধা'তে সুকান্ত এ যুগের ছেলেমেয়েদের শোনালেন সেই চিরন্তনী সংগ্রামের কাহিনী। সুকান্তর এই ছড়াতে এ যুগের কিশোর মনও নাড়া দেয়

বুঝি। তাই কিশোর কবি নিজেই সে প্রশ্ন করেছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। সুকান্ত লিখলেন :—

"বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?
বড়মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি মিষ্টি,
গরীবরা পায় খোলামকুচি, একী অনাসৃষ্টি ?
বলতে পারো ধনীর বাড়ি তৈরী যারা করছে,
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে ?"

'পৃথিবীর দিকে তাকাও' ছড়াটি সুকান্ত একটি ইংরেজী কবিতার ভাবানুসরণে লিখেছিলেন। কিন্তু সেই ছড়া তাঁর কলমে এক আশ্চর্য রূপ পায়, যেন মনে হয় 'পৃথিবীর দিকে তাকাও' মানে সমস্ত দুনিয়ার সাথে এক হও।

"মজুরের দেশ, কল-কারখানা,
প্রাসাদ, নগর, গ্রাম,
মজুরের খাওয়া, মজুরের হাওয়া,
শুধু মজুরের নাম।

*

এক মনেপ্রাণে কাজ করে তারা
বাঁচাতে মাতৃভূমি,
তোমার জন্যে আমি সেই দেশে,
আমার জন্যে তুমি॥"

'সিপাহী বিদ্রোহ' 'একুশে ফেব্রুয়ারী'তে সুকান্ত এ যুগের ছেলেমেয়েদের শোনালেন দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার কথাই। তিনি শোনালেন :—

"আজকে যখন স্বাধীন হবার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা
উঠছে বেজে, কোনোদিকেই নেইকো কোনো শঙ্কা ;

*

নানা সাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী,
এদের নামে দৃপ্ত কিশোর, খুলবে তোমার চোখ কি ?"

[সিপাহী বিদ্রোহ

পরাধীন ভারতবর্ষ। বাংলাদেশের আলীজানের 'আজব লড়াই' এ যুগেও প্রশ্ন হয়ে উঠেছে সকলের কাছে।

সুকান্ত তাই কিশোরদের সামনে তুলে ধরলেন :—

"ডাং-গুলি খেলা নয়, গুলির সঙ্গে খেলা,
রক্ত-রাঙানো পথে দুপাশে ছেলের মেলা;
দুর্দম খেলা চলে, নিষেধে কে কান দেয় ?
ও-বাড়ি ও ও-পাড়ার কালো, ছোটু প্রাণ দেয়।

*

পরের বারেতে ভাই শুনব না কারো মানা,
দেবই, দেবই আমি নিজের জীবনখানা।"

সুকান্তর ছোটদের ছড়া ও কবিতা সংখ্যায় বেশী নয়, তবুও তিনি যা দিয়ে গেছেন তাই বা কম কি ?

আমরা আশা করব সুকান্তর ছোটদের ছড়া আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। ছোটদের মুখে মুখে বড়োরা শুনে অবাক হয়ে বলবে :

"আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির ছড়া নয়, একেবারে একালের টাট্‌কা হাতে গরম ছড়া।"

কাছের মানুষ সুকান্ত ॥ সুনীল ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষত কাব্য-জগতের মাধ্যমে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে এক আশ্চর্যভাবেই।

এই পৃথিবী থেকে রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পরিণত বয়সে বিদায় নিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের অকাল মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের মনে আসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথাও।

কিন্তু সুকান্ত, পরিণত হবার আগেই অমরলোকে চলে গেলেন। তরুণ প্রতিভার এই মর্মান্তিক বিয়োগ-বেদনার কথা ভাবলে, মনে পড়ে একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

"যে ফুল না ফুটিতে
ঝরিল ধরণীতে—

জানি হে জানি তা
হয় নি হারা।"

তবুও এ কথা আজ স্বীকার করতে আমরা গর্ব অনুভব করি, বাংলার তরুণ কবি যে সব কবিতা লিখে গেছেন, তা আমাদের জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে।

সুকান্ত বেঁচেছিলেন মাত্র একুশ বছর। আর এই একুশ বছরের জীবন নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জীবনকাহিনী লেখা যায় না। তবুও তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে, যেমন 'কবি কিশোর সুকান্ত' ও 'কবি সুকান্ত' এ দুটো গ্রন্থকে ঠিক জীবনী গ্রন্থ বলা চলে না। কিছুটা স্মৃতিমূলক, আর কিছুটা তার কবিতাকে নিয়ে আলোচনা। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলিতে ভূমিকা লিখেছিলেন যাঁরা, তাঁরাও তাঁর জীবনকাহিনী কেউ লেখেন নি। কিন্তু সত্য ভাষণের খাতিরে কথাটা নির্মম হলেও বলতে বাধা নেই, একুশ বছরের কবি যা দিয়ে গেছেন, যা অনেক জীবিত বা লোকান্তরিত কবিরাও তাঁর কাছে পৌঁছতে পারেন নি। এর কারণ কী? প্রতিভা? না ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা? না জীবনযাত্রার এমন প্রতিধ্বনি যা কবি নিজেও হয়তো জানতেন না, তিনি কি চেয়েছিলেন? আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলি, সুকান্ত যখন যে বয়সে কবিতা গান রচনা করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ও আগামী কালের ভবিষ্যতের ধারা নিয়েই সাহিত্যকে সৃষ্টি করেছিলেন। যা তাঁর তিরোভাবের পরেও যেন মনে হয় কবি সশরীরে জীবিত থেকেই আমাদের আজ নতুন ক'রে শোনাচ্ছেন। সুকান্ত যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তিনি কতটুকু আমাদের দিতেন, এসব তর্ক-তত্ত্ব আলোচনা ক'রে লাভ নেই। প্রসঙ্গত মনে পড়ে নজরুল তো আমাদের মধ্যে আছেন নীরব হয়েই। কিন্তু তিনি যা দিয়েছেন সে নিয়েই তো আমরা আজ ধন্য। বর্তমান বাংলাদেশে কবিতার জগতে আমরা দিশেহারা পথিকের মতো শুধু ঘুরছি, আর তৃপ্তি পাইনে (ক্ষমা করবেন আধুনিক কবিরা।) বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দ দাশকে বার বার দেখেছি। এক বিচিত্র জগতের বিপ্লবের নিশানা দিয়েছিলেন নজরুল। জীবনানন্দ দাশের স্মৃতি বিজড়িত আশ্চর্য ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ও দার্শনিক প্রেমের কবিতাগুলি পড়েও যেন আবার নতুন ক'রে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু সুকান্তের কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন নতুন কবিতা পড়ছি। মনে হয় সুকান্ত যেন এই যুগের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের মনকে চেতনার প্রান্তদেশে এনে, আমাদের জানাচ্ছেন :—

"আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ,
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।"

[আগামী

২

সুকান্তকে বা তাঁর কবিতাকে চেনবার প্রথম দিনগুলিকে আজ বার বার মনে করছি। কিন্তু আজ? আজ সুকান্তর মৃত্যুর পর (অ-নে-ক বছর পার হয়ে গেছে!) সেই সব কথা লিখতে গিয়ে মনে হয় স্মৃতিরা বড় বিশ্বাসঘাতক। তারাই পুরনো দিনগুলিকে মনে করিয়ে দেয়। আমার ছাত্রজীবন ও কৈশোর কাল কেটেছে মেদিনীপুরে। দেশ থেকে চলে আশার কয়েক মাস আগে কলকাতা থেকে আমার বন্ধু প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখলেন, 'সুনীল, সুকান্তর কবিতা আজ আমাদের তরুণ মনে বিপ্লব এনেছে। তোর কাছে 'ছাড়পত্র' বইটি পাঠালাম।'—কে সুকান্ত, কী রকম কবিতা সবটাই তখন আমার কাছে অজ্ঞাত। বন্ধুর পাঠানো 'ছাড়পত্র' বইটি পড়তে পড়তে আমি যেন এক নতুন বিচিত্র জগতের মুখোমুখী হলাম। মনে হল এ তো আমাদের মনের কথা। বিশেষ ক'রে সুকান্তর 'ছাড়পত্রে'র প্রথম কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :—

"চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস॥"

[ছাড়পত্র

'ছাড়পত্র' কবিতা বইয়ের ভূমিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন, 'সুকান্ত এ বই দেখে যেতে পারে নি' আশ্চর্য, যে কবি তাঁর কবিতার ছাপানো ফাইল দেখে অধীর হয়ে বলেছিলেন, 'কবে বেরুবে? কবে?' নিষ্ঠুর বিধাতার লীলা-খেলায় সুকান্ত চলে গেলেন।

কেন জানিনে যেদিন 'ছাড়পত্র' বইটি পাই, জীবনের সেই প্রথম আশ্চর্য এক অনুভূতি পেলাম। এ যেন জীবনের বাঁচবার এক আশ্চর্য তাগিদ। তাই ছাড়পত্রের কবি আমাদের ডাকলেন, চেনালেন, এই ভারতবর্ষ, জল-মাটি, তার ভৌগোলিক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। আমাদের অশান্ত তরুণ মনে সবেমাত্র স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি। স্বাধীনতা বলতে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন ভারত গড়ে উঠল। ভাগ হল বাংলাদেশ। এর কিছুদিন পর চলে এলাম শহরে। এখানে আসার পর, সুকান্তর কবিতাকে আর তার গানকে আমরা (আমি বলব না এইজন্যে, আমার মতো অনেকেই তখন সুকান্তকে নতুন ক'রে চেনার পথ খুঁজে পেলেন) যেন নতুন ক'রে চিনতে পারলাম।

আমরা অনুভব করলাম সুকান্তকে তাঁর কবিতার মধ্য দিয়েই। তাঁর গানের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলাম, জনতা এখন জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে।

কলকাতায় এসে কলেজে বিদ্যালাভ করবার সুযোগ হয়ে উঠল না। একদিকে দরিদ্রতা, অন্যদিকে রাজনৈতিক সংগঠনে আমি ব্যক্তিগতভাবে মেতে উঠলাম। ঠিক সেই সংকটকালে একদিন আমি আর আমার বন্ধু প্রভাত দু'জনেই ছন্নছাড়া বাউলের মতো চাকরি নেবার জন্য দরখাস্ত করলাম। আমার ভাগ্য ভালো আমি কাজ পেলাম। কিন্তু প্রভাত পেল না। কিছুদিন এখানে কাজ করার পর আমাদের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুকান্তর 'অবাক পৃথিবী' গানটি শুরু করবার প্রারম্ভেই আমার এক বন্ধু বললেন, সুকান্ত কি কমিউনিস্ট কবি?

এর উত্তরে সেদিন আমি বলেছিলাম, সুকান্ত কবি। মানুষের কবি। তাঁর কি দল, তিনি কোন্ দলীয় তা আমার জানা নেই। কোনো যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে আমরা সুকান্তকে দেখি নি। সুকান্ত কবি। যেমন নজরুল, জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও কবি।

আমার কথায় বন্ধু বাধা দিয়ে বললেন, এ তোমার মনগড়া কথা। সুকান্তর অনুরাগীরা তো প্রচার করে—

আমি বাকীটুকু বলবার সুযোগ দিলাম না। তাই বিনীতভাবেই বললাম, তুমি হয়তো জান না, সুকান্ত রাজনীতি করার জন্য কবিতা লেখেন নি। কবিতা

লিখেছেন কবি মন নিয়ে। জীবনের প্রতি ছিল তাঁর নিষ্ঠা। 'সুকান্ত কবি হতে পারতো, রাজনীতি করতে গিয়ে পারল না' একথা যাঁরা বলে থাকেন, আসলে তাঁরা সুকান্তর কবিতাকে তাঁর কবি মন নিয়ে বিচার করেন নি। করেছেন দলীয় স্বার্থ আর নিজেদের সুবিধার জন্য।

সেদিন ঐ পর্যন্তই আলোচনা হয়েছিল। তারপর আর কোনো কথা হয় নি। সুকান্তর কবিতা আর গান নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল সেদিনকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এরপরের কয়েকটা বছর আমার কাটল সুকান্তর কবিতাগুলো পাঠ ক'রে, তার গানগুলোকে আরও নতুন ক'রে শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। 'রানার' নৃত্যনাট্য দেখার পর বিস্ময়ে ভেবেছি, রাজনীতির স্লোগান নিয়ে যাঁরা খেলা করেন, অথবা যাঁরা নিজেদের সমাজজীবনের ও রাজনৈতিক জীবনের আন্দোলনে নিজেদের প্রচার ক'রে বলেন, আমিই সব।

কিন্তু সুকান্ত ? সুকান্তর বন্ধু অরুণাচলের কথায় বলি :

"......বিবৃতি, চট্টগ্রাম, কি মণিপুর, না লিখলে লেখা হত কি 'রানার' ? আর 'রানার' না লিখতে জানলে কী ক'রে লিখতো 'আগ্নেয়গিরি' 'ছাড়পত্র' 'চিল' কি 'প্রার্থী'র মতো কবিতা—যা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে স্থান পাবে ? এ জাতের কবিতা লিখতে গেলে চাই ঘনিষ্ঠ জনসংস্রব আর পরিষ্কার রাজনৈতিক দৃষ্টি। তাই বলতে হয় রাজনীতি করতে গিয়ে 'সে কবি হতে পারল না', নয় রাজনীতি করেই সে সার্থক কবি হল।"

তাই তিনি বলে উঠলেন :—

"জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।
বন্ধু, আজকে বিদায়।
দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা ক'রো॥"

সুকান্ত প্রসঙ্গে এ-সব কথা বলা কেন ? নজরুল ইসলামের দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো আমার কথাটা একটু স্পষ্ট হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তখন বিগত। জাতির বিবেক হিসাবে নজরুলই তখন একমাত্র প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষ। কিন্তু বহুকাল তিনি ছিলেন নির্জনবাসে গানের জগতে। বিভেদের চরম সর্বনাশা দিনে তিনি বহির্জগতে বেরিয়ে এসেছিলেন। লীগের রাজনীতির বিরুদ্ধে দৈনিক 'নবযুগের' সম্পাদক হিসাবে কলম হাতে নিয়েছিলেন। প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি তাঁর মতো ক'রে বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ ছিল হিংস্র, নিষ্করুণ। তাদের ক্ষিপ্ত আক্রমণ দৈনিক, 'আজাদের' পুরনো পৃষ্ঠাগুলো উল্টালেই চোখে পড়বে। এই আক্রমণ নজরুলের মনে বিষম আঘাত দিয়েছিল অনুমান করা শক্ত নয়। আমার ধারণা মস্তিষ্কযন্ত্রের বৈকল্য এবং চির স্তব্ধতার রাজ্যে কবির প্রস্থানের জন্য এই আক্রমণ কম দায়ী নয়।

বাংলার বহু প্রগতিশীল লেখক এবং সুকান্তর সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমার এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল। দেখলাম কী দারুণ উদ্দীপনা নিয়ে মনের আনন্দে সুকান্ত সমাজতন্ত্রের কবিতা লিখে চলেছে। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, এই প্রতিভাবান্ ছেলেটি কি সমাজের সর্বনাশা বিভেদের দিকে তাকিয়ে দেখছে না ? এ কি বুঝতে পারছে না, সমাজতন্ত্র আসছে না, আসছে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ? আর তার জের আজো থামল না। তাই সেদিন আমি ইতিহাসের তরুণ পড়ুয়া সুকান্তর "তারপর হব ইতিহাস" পাঠ করে বিস্মিত হয়েছিলাম। ইতিহাস না পড়েও কী তীব্র ইতিহাসবোধ। কী সুন্দরভাবেই না সুকান্ত এক নিগূঢ় সত্য, অন্তরের গভীর প্রত্যয়, সংগ্রামী দ্যোতনা এবং স্বীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছে।

কে অস্বীকার করতে পারে ইতিহাস যতই নিষ্ঠুর বক্রগতি ধারণ করুক, সে চলেছে সমাজতন্ত্রের দিকেই। সেই মূল গতিবেগ, সেই রাগিণী সুকান্তর মতো আর কে প্রকাশ করতে পেরেছিল। যে-কবি-কিশোরের সৃষ্টি-প্রতিভায় সেই সুরের ঝঙ্কার একটির পর একটি কাব্য-নক্ষত্র ফুটিয়ে তুলছিল, তার নামই তো সুকান্ত।

কেউ যেন মনে না করেন সুকান্তর এই সব কবিতা অনায়াসলভ্য ছিল। এর জন্য সুকান্তকে মূল্য দিতে হয়েছে। হয়তো জীবন দিয়েই। সুকান্তর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমার চেয়েও ভালো বলতে পারবেন, তারার মালা গাঁথতে গিয়ে সুকান্তকে কত কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্যর্থ প্রয়াসের

উল্কাপাতও ঘটেছে নিশ্চয়। আমার ভাগ্যে শুধু একবার সুকান্তর নিষ্ঠাপূর্ণ কাব্য-শ্রম দেখার সৌভাগ্য ঘটেছিল। একটা হাসপাতালে সুকান্ত এবং আমি প্রায় পাশাপাশি দুটো বেডে আশ্রয় পেয়েছিলাম। শোনা গেল, হাসপাতালের বারান্দায় রুগীরা নভেম্বর দিবস পালন করবেন। আমাদের দু'জনের উপর দু'টো নতুন কবিতা পড়ার ভার পড়ল। সুকান্ত কবিতা লিখতে বসে গেল। আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে তাকিয়ে দেখি, সুকান্ত কতকগুলো কাগজ ছিঁড়ে দুমড়ে মুচড়ে দলাপাকিয়ে মেঝেয় ফেলে দিল। সুকান্তর দিকে চোখ পড়তেই ও চোখ ফিরিয়ে নিল। মেঝেয় তখন ছেঁড়া কাগজের স্তূপ। আমার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে একটু লজ্জিত হয়ে কোত্থেকে একটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট নিয়ে এল। কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাতে তুলল উল্কাপাতের পিণ্ডগুলি। আমিও একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করলাম। একটু পরে আমার জ্বর এল। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টাখানেক পরে কম্বল সরিয়ে তাকিয়ে দেখি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট প্রায় ভর্তি। আসলে সুকান্তর 'মুড' নেই। রোজ রোজ এমনি হত কিনা জানি না।

আর একটু বাকি আছে। বিকালে প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে মিটিংয়ের উচ্চকণ্ঠ কানে এল। এমন সময় সুকান্তর ফিসফিস স্বর: আপনার কবিতাটা কোথায় রেখেছেন?

বালিশের তলায়, কেন?

জবাব এল না। শুধু আমার মাথাসুদ্ধ বালিশটা উঁচু ক'রে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সুকান্ত কবিতাটা নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তার গলায় সেই কবিতার-আবৃত্তি। সুকান্ত নিজের উপর রাগ ক'রেই আমার কবিতাটা প'ড়ে দিয়ে এল? অথবা সে নিজের উদার হৃদয়টাও প্রকাশ করে ফেলেছে?

এর কয়েকদিন পর সুকান্ত আমাকে তার একটা নতুন কবিতা দেখাল।

কেমন হয়েছে বলবেন। সলজ্জ কণ্ঠস্বর।

ছোট কবিতা। আমি দু'বার চোখ বুলালাম।

সত্যিই যা মনে হয়েছে বলবেন কিন্তু।

আমি ইতস্তত করছিলাম, শেষ লাইনটা আমার ভালো লাগছিল না। আমার ভয় ছিল পাছে সুকান্ত এক্ষুনি ওটা ছিঁড়ে ফেলে টুকরো টুকরো ক'রে। কিন্তু সুকান্ত গম্ভীর মুখে জামার বুক পকেটে কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে দিল। পরে অপরিবর্তিত অবস্থায় কবিতাটি ছাপার হরফে দেখেছি। শেষ লাইনটার

কিছুমাত্র অদল-বদল হয় নি। কবিতাটি পরে সুকান্তর একটা বইয়ে স্থান পেয়েছে। কবিতাটির নাম? গৌণ প্রশ্ন। আপাতত গবেষকদের জন্য একটু ফাঁক রেখে দিচ্ছি। আসল কথা সুকান্তর আত্মবিশ্বাস এবং অকৃত্রিমতার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি। পরিশ্রমে সে পিছপা হয় নি, কবিতা লিখে সন্তুষ্ট না হলে ছিঁড়ে ফেলতেও তার বাধে নি, আবার অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তার মত গ্রহণ না ক'রে কবিতা অক্ষত রেখে ছাপাতেও পেরেছে।

এর কয়েক মাস পরে সুকান্ত মারা গেল।

দাঙ্গার আবহাওয়ার মধ্যে কমরেডদের সঙ্গে শ্মশানে গিয়েছিলাম তাকে চিতায় তুলে দিতে।

অনেক বছর পরে এই শ্মশানের পাশ দিয়েই একদিন আসতে আসতে দেখি, বালখিল্যের দল একটা মরা চিলের পায়ে দড়ি বেঁধে ক্যানেস্তা পিটাতে পিটাতে পাখিটাকে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে চিতায় তুলবে ব'লে। মুখে তাদের ঘন ঘন হরিবোল। সুকান্তর 'চিল' কবিতাটির কথা মনে পড়ল। শোষনের প্রতীক একটা উদ্ধত চিলের পতনের কথা সুকান্ত লিখেছিল। বেঁচে থাকলে এই কাণ্ড দেখলে সে কী ভাবত? এ কি চিলের পতন, না, বালখিল্যদের অধঃপতন? বিপ্লব নিয়ে যারা খেলা করে, তারাও যেন কতকটা এই রকম।

সুকান্তর কবিতা ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করছে। সে কি সমাজতন্ত্রের উষার অভ্যুদয় নিকটতর হওয়ার ইশারা নয়। বাঁকাচোরা পথে ইতিহাস সেই দিকেই বাঁক নিচ্ছে। সেদিন হয়তো দূরে নয় যেদিন অশ্রুবিন্দু রাত্রি শেষের শুকতারা হয়ে দেখা দেবে।

সুকান্তর তাৎপর্য ॥ মিহির আচার্য

২৯ বৈশাখ ১৩৫৪, আমাদের তরুণ প্রত্যয়ে স্তম্ভিত আঘাত ঘটিয়ে অকস্মাৎ সুকান্ত মারা গেলেন। 'নতুন সাহিত্য ভবন' থেকে সদ্য 'ছাড়পত্র' বেরিয়েছে তখন। ছাড়পত্র কাঁধে ক'রে আমরা সুকান্তর কাব্যকে উৎসাহভরে ছড়িয়ে দিলাম আগ্রহী পাঠকসমাজে। সুকান্ত আমাদের চেতনায় তারুণ্যের অম্লান বিজয় পতাকা। পথ চলতে আবৃত্তি করতাম: 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই

লেনিন।' বস্তুত একথা বললে অতিভাষণ হবে না সেদিন আমরা সাম্যবাদে দীক্ষা নিই সুকান্তর কাব্য থেকে। আমাদের চারিত্র্যের বিপ্লবীভঙ্গি সুকান্তই নির্মাণ করেছিলেন।

অথচ কীইবা বয়সের তফাত। সুকান্তর জন্ম ১৩৩৩-এ, আমার ১৩৩২। ধ্রুবতারা যেমন নাবিককে দিগ্‌ভ্রান্ত হতে দেয় না, সুকান্ত আমাদের সাহিত্য-জীবনে তেমনি ধ্রুবতারা। চেতনায়-অচেতনায় সুকান্ত আমাদের চালক, আমাদের তারুণ্যের রাজা। বোধকরি, আর কোন কাব্যই এমন ক'রে আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে ওঠে নি। এমনকি রবীন্দ্রনাথও না। অথচ সুকান্ত আমাদের কাছে কোনো জোরজবরদস্তিও নয়, আমরা অজান্তেই শ্রেষ্ঠ বন্ধুর আকাশের মতো বিশালতায় সহজেই নিবিড় প্রেমে বাঁধা পড়লাম।

কবির মৃত্যুর পর তিনটি বছর গড়িয়ে চলল। ১৩৫৭। কলকাতায় তখন চলেছে আমার অনির্দিষ্ট জীবিকার পায়ে পায়ে মরিয়া সাহিত্যের জেহাদ। সাহিত্যের নেশায় আমরা কয়েকজন বন্ধু আমার সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীটের আবাসস্থলকে একটি নিয়মিত আড্ডায় পরিণত করেছি। অমলেন্দু বসু, অনিল বেদী, অজিত মুখোপাধ্যায় এবং আমি।

প্রস্তাব আমার; সুকান্তর স্মৃতিরক্ষার্থে একটা কিছু করতে হবে। প্রকাশ করলাম বন্ধুদের অর্থসাহায্যে 'সুকান্তনামা,, 'রবীন্দ্রনামা'র অনুপ্রেরণায়। প্রকাশক হলেন কর্নওআলিশ স্ট্রীটের চক্রবর্তী পাবলিশার্স। বাঙলাদেশের প্রবীণ-নবীন-তরুণ কবিদের কাব্যোপহারে সুকান্তর স্মৃতিতর্পণ। প্রচ্ছদ অঙ্কনে এগিয়ে এলেন পূর্ণেন্দু পত্রী।

'সুকান্তনামা' বেরুল। বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে তরুণ কবিগোষ্ঠীও যথারীতি আসন অলংকৃত করলেন। কবিতা সংগ্রহ সহজ ছিল না। অসামান্য সাহায্য করলেন বন্ধু সুকবি জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যক্তিগত সংকোচ ছিল। যেহেতু আমি কোনো কালেই কবি নই। আমি প্রথমাবধি গদ্যচর জীব। কিন্তু বন্ধুদের অমন সহানুভূতিই আমাকে সম্পাদকের গুরুদায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করল। এবং আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে সে দায়িত্ব সম্যকভাবেই প্রতিপালিত হয়েছে। প্রকাশমাত্র হাজার কপি নিঃশেষ হওয়ার ঘটনা সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অধিকন্তু 'সুকান্তনামা'র চিরায়ত দাবি পুনর্বার আমাকে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেছে। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫-এ গ্রন্থটি সাগ্রহে প্রকাশ করলেন সারস্বত লাইব্রেরী।

-নতুন সংস্করণে সম্পাদকীয়তে যা উল্লেখ করেছি তারই উদ্ধৃতি নিয়ে কবির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি :

"সুকান্তনামা আনুষ্ঠানিক অর্থে প্রিয় কবির শ্রদ্ধা নিবেদন নয়। বরং বলা যায় এ যেন আমাদের নিজেদের প্রতিই শ্রদ্ধাবোধ জাগানো। আমাদের যা কিছু সামাজিক অঙ্গীকার দৃপ্ত হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির আরম্ভ পর্যন্ত যে-যুগ কবিমানসে বিধৃত আমরা সে-কালেরই সহযোদ্ধা। সুকান্ত এই কারণেই আমাদের কাছে প্রিয়, যা আমরা পারি নি সে একক চেষ্টায় তা প্রতিবিম্বিত করেছে। সুকান্ত সর্বকালের তারুণ্যের প্রতিনিধি। যেখানে আশা-উদ্দীপনা-সাহস-সংগ্রাম সেখানেই সুকান্ত তার কবি-হৃদয়ে বিস্তৃত। এমনভাবে মানুষকে ভালবাসার ইতিহাসও পৃথিবীতে তুলনারহিত। এবং বুঝতে হবে কবির মাত্র একুশ বছর বয়সেই এই আশ্চর্য বিশ্বচৈতন্য বিকশিত হয়ে উঠেছে।

"সুকান্তর অকালবিয়োগ বাঙলা-সাহিত্যের এক অপূরণীয় ক্ষতি। এটি একটি নির্মম সত্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমরা আক্ষেপের কোনো প্রয়োজন দেখি না যখন প্রশ্ন রাখি মাত্র একুশ বছর বয়ঃসীমায় সুকান্ত বাংলাকাব্যে যে অবিনাশী যৌবন এনে দিয়েছিল যার ফলশ্রুতি আমরা এখনো বহন করছি, তার তুলনায় দীর্ঘায়ু কবিগণ কী-ঐতিহ্য তৈরি করতে পেরেছেন! সুকান্তকাব্যের, যদি কোনো তাৎপর্য খুঁজতে হয় তা হচ্ছে এই, যে-কোনো দুর্বিপাকে, তা সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক হোক, একজন বিবেকবান তন্নিষ্ঠ সৎকবি তাঁর বিশ্বস্ত আদর্শের মহান পতাকাকে স্পর্ধায় উত্তোলিত রাখেন।"

সুকান্ত সম্পর্কে, ব্যক্তিগতভাবে, কিছু ॥ সিদ্ধেশ্বর সেন

সুকান্ত সম্পর্কে, ব্যক্তিগতভাবে, কিছু লিখতে যাওয়া, আমার পক্ষে বোঝা গেল যে বেশ কঠিন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য,—প্রতিভাধন্য সে কবির কথা, ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে আজ দু'যুগ ধ'রে তো বহু আলোচনার সাক্ষী। কিন্তু আমার সমানবয়সী সেই তরুণ বন্ধু-কবির কথা ভাবতে গেলে মনে যে অভাববোধ জাগে, তা একান্তভাবে আমারই।

সে কথা শাখা-পল্লবে বিস্তার করতে চাওয়ায়, আমার দিক থেকে, ব্যক্তিগত সংকোচই থেকে যায়।

যেমন, ধরা যাক, সুকান্ত ছিল গানের ভক্ত। রবীন্দ্র-সংগীতের। আমার গলায় যদি কিছু সুর সেকেলে লেগেও থাকত, তবে নিঃসংশয়ে তার কৃতিত্ব অনেকখানিই ছিল সুকান্তর কানের। সে-বয়সেই কানে খাটো ছিল, তাই মন দিয়ে শুনত, ভুল শুধরে দিত।

এরকম গানের ঘরোয়ার কথা আমার বেশ মনে আছে। সুকান্ত তখন অসুস্থ। গায়ে প্রায়ই জ্বর লেগে থাকে। তাই কলকাতার রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে করতে আলাপ করার অভ্যস্ত পথ বন্ধ। কাজেই, জোড়াসাঁকো থেকে আমাকে যেতে হয় নারকেলডাঙ্গায় সুকান্তদের বাড়ি। নানা কথাবার্তার পর অসুস্থ শয্যা থেকে সুকান্তের ফরমাস হতই গানের। আমার কাছে, নিজের হাতে কপি ক'রে দেওয়া তার প্রিয় রবীন্দ্রনাথের গানের অনুলিপিও, বোধ হয়, এখনও আছে। (তার হাতের লেখাও ছিল গোটা গোটা, সুন্দর, প্রায় রবীন্দ্রনাথেরই লিপি মক্‌সো করা যেন।) যেমন তার একটি প্রিয় গান ছিল: "সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা।" এ গানটি আমারও এমন প্রিয়!

আসলে সুকান্ত ছিল গুণগ্রাহী, যতটুকু যার কাছে যা পাওয়া যেত,—অন্তরঙ্গ, অত্যন্ত এক সুকুমার মনের অধিকারী।

২

সুকান্ত তখনই যশস্বী, সাহিত্য-দরবারে স্বীকৃত, সর্বজন-প্রশংসিত কবি। কিন্তু আমি যে সুকান্তকে চিনেছিলাম, সে ছিল কিছু লাজুক, প্রথমে মনে হত বুঝি মুখচোরা,—কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী, অনেকের মনে হতে পারতো হয়তো বা খুব বেশীই। ঠিক কী ক'রে আমাদের আলাপ হল? হয়েও ছিল ঘটনাসূত্রে।

ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সে-যুগের নামকরা ভবানী দত্ত লেনের বি-পি-এস-এফ্-এর দপ্তরে অনেকের মতো আমারও যাতায়াত। কিশোর বাহিনীরও অফিস বসত সেখানে। । উঠতে-নামতে দেখতে পেতাম বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কবি সুকান্তকে। আমার মনে হয় সে সময় বোধহয়, তার "অভিযান" নাট্যের মহলা চলছিল। কিন্তু আমিও ছিলাম স্বভাববশে আত্ম-মুখ। তাই যেচে কারুর সঙ্গেই আলাপ বড় একটা হত না। তবু, বরাবরই ইচ্ছে ছিল সুকান্তর সঙ্গে

আলাপের। তখন নতুন লিখছি। সে-যুগের 'অরণি'তে আমার কবিতা বের হতে থাকে। বোধহয়, অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য বা দিলীপ রায়চৌধুরীই সুকান্তর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম আলাপেই দেখলাম সুকান্তর নজর কিন্তু সর্বদিকে। আমার লেখা যে সে পড়েছে, তা কবুল করাতে আমার সেদিন যে খুশী লেগেছিল, আজও তা মনে আছে। সেটা বোধহয় ১৯৪৫। সে-ই হল সূত্রপাত। গোড়া থেকেই লেখা পড়ে কবি সুকান্তর ওপর আমার যে আস্থা গড়ে উঠেছিল, পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি সুকান্ত তা দিনে দিনে আমার কাছে স্পষ্ট ক'রে মেলে ধরলে। সে আমি ভুলতে পারি না।

সুকান্ত যে কবি হতেই জন্মেছিল, তার এক বর্ণ-ও অত্যুক্তি নয়। কিন্তু গতানুগতিক পথের কবি তো সে নয়। তাই কর্মী তাকে এক দণ্ডও বসিয়ে রাখে নি। যতক্ষণ না সে রোগশয্যায় শুয়ে পড়েছিল। রোগশয্যা সুকান্তর একবার নয়, কয়েকবার। আমার মনে আছে, ডেকার্স লেনে 'স্বাধীনতা' বের হতে সুকান্তর ওপর ভার পড়ল 'কিশোর-সভা' পাতার। ডেকার্স লেনে মাঝে মাঝেই যেতাম সমান দুটো আকর্ষণে। এক 'স্বাধীনতা,' আর সুকান্ত। এখানেও কাজের মধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন অল্পদিনের মতো সে চলে গেল পার্টির রেড-এড্ কিওর হোমে। রডন স্ট্রীটে। সেখানেও গিয়েছি। সুকান্তর মনে খেদ নেই যে কাজের চাপে রোগে পড়েছে। বরং যেন সে চিরকালের গর্বিতই। আসলে শরীরই তার কাহিল হতে বসেছিল। বুকে বাসা বাঁধছিল কাল-রোগ। কিন্তু, মন ?

রাজনীতিতে কবিতার ক্ষতি হচ্ছে কিনা, সে তর্ক তখনই উঠেছিল, তুলেছিলেন বোধহয় বুদ্ধদেব বসু। তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় আমিও লিখেছিলাম।
সুকান্ত তার এক অন্তরঙ্গের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়—কবি অরুণাচল বসু। অরুণাচলের পক্ষপাত ছিল আমার লিরিকের প্রতি। কিন্তু, সুকান্ত আমার 'অরণি'র লেখার উপরে জোর দিল। আমার নিজের মনেরও সায় গিয়েছিল তাতেই। সে সময় আরও দু'একজন কবির কথা আমার মনে পড়ে, যাদের আমরা আলোচনায় পেতাম। এঁদের একজন হলেন কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী

আর একজন কবি নরেশ গুহ। 'কবিতা'-গোষ্ঠীর সঙ্গে এঁর যোগ ছিল। আর একজনের কথা এ প্রসঙ্গে না বললেই নয়। ইনি শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। সুকান্ত বা আমাদের সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক ছিল বেশ। তবু, তাঁর সঙ্গে সুকান্তর সম্পর্কটা ছিল যেন বয়স্যের। তার ছড়ার সঙ্গে ওঁর ছবির খেলা তখন দেখতাম। নতুন যুগের সংজ্ঞায় একজনের নাম উঠত, আমাদের মধ্যে, খুবই। তিনি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সে সময় সুকান্ত একবার আমায় বলেছিল, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে, 'স্বাধীনতা'য়। কিন্তু, আমারই সংকোচ হয়। আসলে কবিতা দিয়ে যা কিছু হবার হবে, এই আমার মন বলত। যদি ভাল কখনও কিছু লিখতে পারি।

একবার রাজনীতি ও কবিতার তর্কের মধ্যে সুকান্ত একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল, 'আমরা যে নতুন জাতের লিখিয়ে, এটাই অনেকে বুঝছে না।'

এখন নিশ্চয়ই অনেকে বুঝছে, কিন্তু তখন ?

রোগও সুকান্তকে কাবু করতে পারল না। পরের বার রোগশয্যা তাদের নারকেলডাঙ্গার বাড়ি থেকে সরে এল শ্যামবাজারে রামধন মিত্তির লেনে। সুকান্তর জ্যেঠতুতো দাদাদের বাড়ি। সেখানেও অনেক সন্ধ্যেয় গিয়েছি।

সুকান্তের নারকেলডাঙ্গা থাকার সময়ের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। মাঝে কিছুদিন বাদ দিয়ে গিয়েছি। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হত। পুরনো বাড়ি। নিচ থেকে ডাকতাম। তখন সুকান্তর ছোট ভাইয়েরা প্রশান্ত, মুকুল বা অশোক, এখনকার কবি অশোক ভট্টাচার্য, আমাদের ওপরে যাবার পথ দেখিয়ে দিত। অমিয় তখন খুবই ছোট ছিল। কত অল্প বয়সই না তখন ছিল ওদের। একথা-সেকথার পর অনিবার্যভাবে সুকান্ত আমাকে কবিতার কথা জিজ্ঞেস ক'রে বসল। আমি একটু অপ্রতিভ জবাবে বললাম, 'মনে হয়, আমার কবিতা ঠিক হচ্ছে না।' আসলে আমার বার বার এরকম মনে হয়। এখনও, আজও।

সুকান্ত একটু পরে মাথার নিচ থেকে তার কয়েকটি নতুন কবিতা বার ক'রে পড়ে শোনাল। "সিঁড়ি" "চারাগাছ" "প্রার্থী"। সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পরে "প্রার্থী" বেরিয়েছিল "পরিচয়"-এ। বোধহয়, যখন সে যাদবপুরে টি. বি. হাসপাতালে, একেবারে শেষশয্যায়।

৪

যাদবপুরে সুকান্তকে দেখতে আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। কিন্তু, তার

আগেই সুকান্ত সম্পর্কে আমার মনে এক দারুণ উৎকণ্ঠা সহসা ভেসে উঠেছিল। সে কথা বলছি।

একদিন রামধন মিত্তির লেনে খোঁজ করতে গিয়ে, নিচে যে ঘরটিতে সে শুয়ে থাকত, দেখলাম ফাঁকা পড়ে আছে। কোথায় গেল সে, চলৎশক্তি তো ছিল না। মনটা ভারী হয়ে গেল। তার জ্যেঠতুতো দাদা রাখাল ভট্টাচার্য, তাঁর সঙ্গেও দেখা হল না। জানতাম তো পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ডাঃ রাম অধিকারী তার চিকিৎসা করছিলেন। রোগ কি এতো বাড়ল, এতোই……

যাদবপুর হাসপাতালে সুকান্তর সঙ্গে শেষ যোগ আমার এক চিঠিতে। লিখেছিলাম 'পরিচয়' প্রকাশিত "প্রার্থী" কবিতা আবার পড়ে। সে চিঠির ভাষা ছিল আমার কৃতজ্ঞতার ভাষা—সহকর্মী পাঠক হিসাবে সেই অনাড়ম্বর, সরল অথচ আশ্চর্যগম্ভীর, প্রায় মন্ত্রময় কবিতাটির জন্যে।

কিন্তু সুকান্ত কী তখন আর সে চিঠি পড়বার অবস্থায় ছিল? আমি লিখেছিলাম, এরকম কবিতা ওর কলম থেকে আরও কত না পাবার প্রতীক্ষায় দিন গুণব। তার আরোগ্যের দিন আমরা গুণব।

গভীর বিশ্বাসের সঙ্গেই তো আমি সুকান্তকে এ সব কথা লিখতে পেরেছিলাম। কিন্তু, আমি কি জানতাম যে এর থেকেও গভীর, গূঢ়, অবিসম্বাদিত অনেক সত্য জীবনে থেকে যায়।

তা আমি জানতে পেরেছিলাম মাত্র কয়েকদিন পরেই। একদিন সকালে উঠেই জানতে পারা গেল, সুকান্ত আর নেই। সারা শহরই সে খবর পেল, খবরের কাগজের পাতায়।

হঠাৎ এক মুহূর্তে যেন আমার অনেকখানি ছিন্ন হয়ে গেল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। আর না জেনেই, আমি দেখলাম হাঁটছি কলকাতার সেই সব রাস্তাঘাটের দিকে,—একদিন বহু সন্ধ্যায় বা বিকেলে যে সব পথঘাট দিয়ে আমি বন্ধু সুকান্তর সঙ্গে হেঁটে যেতে পেরেছিলাম।

সুকান্ত ॥ সুনীল মুন্সী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-ফেডারেশন অফিসে একটি লাজুক কিশোরকে অনেকদিনই বসে থাকতে দেখেছি। ছাত্রছাত্রীদের উত্তেজিত কলকলধ্বনির মধ্যে ছেলেটি

যেন হারিয়ে যেত। আজ শুধু মনে আছে তার চোখ দুটিকে। ও যেন চোখ দিয়েই সব শুনত, চোখ দিয়েই কথা বলত।

সুকান্তকে এইভাবেই তখন চিনতাম। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, ও যেন অন্যদের চেয়ে কেমন খানিকটা ভিন্ন। অন্যদের বোঝা যায়, কিন্তু সুকান্তকে যেন ঠিক বোঝা যায় না। সুকান্ত 'কিশোর বাহিনী'র সংগঠক ছিল। কিন্তু মনে হত, ওর মন যেন অনেক বেশী সাবালক। আর কোথায় যেন খানিকটা বিষাদ ওর মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

একদিনের কথা বেশ মনে আছে। সকালবেলা চিত্তরঞ্জন এভিনিউর যে বাড়িতে তখনকার কয়েকজন ছাত্রনেতা থাকতেন, সেখানে গেছি। অজিত রায় তখনো ঘুমোচ্ছেন, আমি অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে কথা বলছি। এর মধ্যে সুকান্ত এসে বসল। নতুন কবিতা লিখেছে অন্নদাবাবুকে সেটি পড়ে শোনাবে। কোনো কিছু নতুন লিখলে অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের মতামত সুকান্তের কাছে ছিল পরম গুরুত্বপূর্ণ কেন জানি না। হয়তো বা সুকান্ত তার লেখাকে কখনও আন্দোলন ও সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ভাবত না। এবং তখনকার দিনে ছাত্রসংগ্রামের নেতা ছিলেন অন্নদাশঙ্কর।

আমার মনে আছে, কবিতা শুনে আমার মনে হল এ যেন পূর্ণবয়স্ক কোনো কবির অন্তর্দাহের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। সুকান্তর বয়স, চেহারা ওর স্বভাবের সঙ্গে যেন কোথায় একটা গরমিল আছে। অন্নদাবাবু কিছুক্ষণ থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, সুকান্ত কেন ওর বয়সের কিশোরদের পক্ষে যা স্বাভাবিক সে ধরনের কবিতা লেখে না: সুকান্ত দোষীর মতো মাথা নিচু ক'রে বলল, কেন জানে না, লিখতে গেলেই ওর যেন কি হয়। কেমন একটা বিস্ফোরণ ঘটে যায় মাথায় আর কলম হয়ে যায় অবাধ্য।

ছাত্র আন্দোলনের বাহ্যিক হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সুকান্ত হারিয়ে যেত। মাঝে মাঝে তার আত্মপ্রকাশ দেখতাম কবিতায়, আর 'স্বাধীনতা'র 'কিশোর সভা'র পাতায়। 'স্বাধীনতা' অফিসে সুকান্তর তন্ময় হয়ে কাজ করার চেহারা আজো মনে আছে।

অসুস্থ হয়ে যখন সুকান্ত হাসপাতালে তখন ওর চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছি আর মনপ্রাণে কামনা করেছি, ও ভাল হয়ে ফিরে আসুক, বাংলাদেশের সেই অস্থির দিনগুলি ওর লেখনীতে ভাষা পাক। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র 'দি স্টুডেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সুকান্তর উপর গৌতম

চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখা ছাপিয়েছিলাম, সুকান্তর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে মনে আছে ঐ লেখা পড়ে বিদেশ থেকে চিঠি এসেছে, কে এই তরুণ অনন্যসাধারণ কবি? অনুবাদের তাগিদ এসেছে ফ্রান্স থেকে, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে। কিন্তু উদ্যোগপর্বেই পুলিসের দৌরাত্ম্যে সংগঠনের অন্যান্য জরুরী কাজ সামাল দিতে এটি আর হয়ে ওঠে নি। কিন্তু উদ্যোগ কি আজ আবার নেওয়া যায় না?

লেখা-আঁকার খেলা ॥ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সুকান্ত আসছে—রাস্তার পাশ ধরে এক মনে—কোন সুদূরে হারিয়ে গেছে তার মনের ঠিকানা। পেছনে সূর্যের খর রোদের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে দিগ্বিদিক্, সে জ্বালার ভয়ে সুখী আর ভোগী সরে গেছে চলার পথ থেকে, তাপদগ্ধ প্রকৃতির ক্ষমাহীন অভিশাপকে এড়াবার জন্যে লুকিয়ে গেছে কোন অন্ধকার—বৃক্ষচ্ছায়ায় অথবা প্রাসাদগুহায়। সুকান্ত আসছে, যে তেজে ভীত ত্রস্ত হয়েছে ধনী, সেই তেজই তাকে উদ্ভাসিত করেছে, জ্যোতির্ময় করেছে, ভরা দুপুরে নীরব পথে ক্লান্ত দেহে স্থির পদক্ষেপে পদধ্বনির আলোড়ন তুলে এগিয়ে আসছে সে, সঙ্গী তার শ্রান্ত রিক্শাওয়ালা, ঘামে ভেজা ফেরিওয়ালা, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলা ঠেলাওয়ালা।

এমনি দুপুরে সে প্রায়ই আসত আমার কাছে—প্রাত্যহিক পার্টির কাজের প্রথম দফা সেরে, সে যখন ফিরত, তার সেই চলার পথের পাশেই ছিল আমার আস্তানা। তখন আমি ছবি আঁকার চৌকির সামনে বেহুঁশ হয়ে ব্যস্ত থাকতাম সৃষ্টির কাজে। হঠাৎ দরজার পাশে থমকে দাঁড়াত সে, পেছনে নিয়ে প্রচুর আলো, সামনে অন্ধকার ঝাঁকড়া চুল শীর্ণ দেহের রেখার রেখায় দৈহিক শ্রান্তি ফুটে উঠলেও, সতেজ মনের দীপ্তভঙ্গী বুঝিয়ে দিত শ্রান্ত কর্মী ক্লান্ত হলেও কবির মন অজেয়। অপরাহ্ণের দেহগত ক্ষুধা, সূর্যস্নানের শ্রান্তি এ-সবকে অবজ্ঞা ক'রে হয়তো কবি আসত, আমাকে উৎসাহিত করতে। আমার উৎসাহ থেকে তার কবিতাকে খুঁজে নিতে, পার্টির কাজ শেষ ক'রে নিজের কাজের প্রেরণা খুজতে। সমব্যথী সহকর্মীর কাজের মধ্যে হয়তো সে খুঁজে পেত শ্রান্তিজয়ের ঠিকানা।

তারপর ও যখন ঘরে ঢুকত, তখন প্রায়ই গুটিয়ে ফেলতে হত আমার কাজের পালা। টাকা-পয়সা লেন-দেনের তাড়নায় তখন যে ছবি আঁকতাম, ওর সামনে তাকে প্রকাশ করতে মনে মনে লজ্জা পেতাম আমি। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আর নির্লোভী কবিচেতনার সামনে আমার অবস্থা বিপাকজাত ব্যবসায়ী মনকে উঠিয়ে নিতাম দ্রুত। ঠাণ্ডা ঘরের মেঝেতে শরীর এলিয়ে দিয়ে সুকান্ত শুরু করত তার ছোটখাট দুষ্টুমী, মাঝে মাঝে শুরু করত এক মজার খেলা। বলত, "দাদা, রাস্তায় দেখে এলাম এক রিকশয় চেপে চলেছেন দুই পর্বত-প্রমাণ কর্তা-গিন্নী, ভারসাম্যের এদিক-ওদিক ঢেঁকি খেলার খেলুড়ের মতো উঁচুতে দোদুল-দোলে ঝুলতে লাগল রিকশাওয়ালা। আসুন, এর উপরে আপনি ছবি আঁকুন, আমি লিখি কবিতা—দেখি, কারটা কেমন হয়।" লেখা-আঁকার এমনি খেলায় খাওয়া-দাওয়া ভুলে কতদিন আমাদের দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে হুঁশই থাকে নি। আজ তার হারিয়ে গেছে সবই। ছবিগুলো হারিয়ে গেছে দুঃখ নেই, কেননা আমি এখনও আছি—ছড়াগুলো হারিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে অনেক কিছু কবির সঙ্গে। "মিঠে-কড়া" ছড়ার বইয়ের অনেক ছড়াই হয়তো এমনি ক'রে লেখা। তাই কবি যাবার আগে ওটা আমার কাছেই রেখে গেছল, ভালো ক'রে ছবি এঁকে সাজিয়ে দেবার জন্যে। বইটা সাজিয়ে দিয়েছি, প্রকাশও হয়েছে—কিন্তু যার সঙ্গে খেলতে গিয়ে এর আঁকা শুরু করেছিলাম, তাকে দেখাবার সুযোগ পেলাম না এবার।

সুকান্ত প্রসঙ্গ ॥ ভুপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সুকান্তর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই তার প্রতিভাকে বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় বলে মতপ্রকাশ করেছেন। সুকান্ত কবি হল কী করে এ-সম্বন্ধেও অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কারণ যাঁরা সুকান্তর সঙ্গে বেশী পরিচিত তাঁরাই দেখেছেন কী রূঢ় আর গন্ধময় জীবন এর। বাস্তবিক সুকান্তর আশে-পাশে এমন একটা মধুর আবহাওয়া ছিল না যা ওকে কবি হতে সাহায্য করেছে। এবং সেই জন্য পরবর্তী জীবনে ওর কবিতায় দুঃখীর দুঃখ এতখানি বাস্তব রূপ পেয়েছিল।

যাই হোক, আমার বলবার বিষয়বস্তুটা একটু ভিন্ন ধরনের হবে। কারণ সুকান্তর সঙ্গে আমার মেলামেশাটা একেবারে ছেলেবেলা থেকে। এবং সেই জন্যেই ওর মধ্যে ওর প্রতিভার বিকাশ আমি যেন লক্ষ্য করতে পেরেছি বলেই আমার মনে হয়। ওর প্রতিভা ঝপ্ ক'রে একদিনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি, ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। ছেলেবেলা থেকেই ও ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। খেলা-ধুলো মানে লাট্টু, ঘুঁড়ি, গুলি প্রভৃতি খেলা ও বিশেষ পছন্দ করত না, এমন কী আমরা যদি কখনো মেতে উঠতুম এসব খেলায়, ও মনে মনে চটে উঠত। যে বয়সে ছোট ছোট ছেলেরা সাধারণত খেলা-ধুলো নিয়ে মেতে থাকে সেই বয়সেই ওর বই পড়বার অসম্ভব রকম ঝোঁক ছিল।

এবং সেই সময়ের মধ্যেই ও পড়ে ফেলেছিল অনেক বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ এবং বাংলার অনেক নামকরা সাহিত্যিকের গল্প কবিতা ও ভ্রমণ-কাহিনী।

খুব অল্প বয়স থেকেই ও কবিতা লিখতে শুরু করে। তখনি ওর লেখাগুলোর শ্রোতা এবং উৎসাহদাতা ছিলুম আমরাই। ওর রচনা প্রথম প্রকাশিত হয় 'শিখা' নামে একটা ছোটদের মাসিক পত্রিকায়। এবং সেটা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর উপর একটি ছোট্ট গদ্য রচনা।

আমি প্রথমেই বলেছি, সুকান্তর প্রতিভা ঝপ্ করে একদিনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি, ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল। ওর রচনার ওপর দিয়ে সেই পরিবর্তন যেন বেশ ভালভাবেই লক্ষ করা যায়। ওর বেশ কয়েকটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করলেই একথা বোঝা যাবে। তার একেবারে প্রথম দিকের রচনার দুটো কবিতা তুলে দেওয়া গেল। এগুলো ১৯৪০ সালের লেখা। প্রথম কবিতাটি লেখা হয়েছিল সুকান্তর সম্পাদিত হাতের লেখা পত্রিকা 'সপ্তমিকা'য় আর দ্বিতীয়টি সে আমাকে দিয়েছিল আমার হাতের লেখা পত্রিকা 'নাগরিকে'র জন্যে।

১

সুচিকিৎসা ?

বদ্যিনাথের সর্দি হ'লো কোলকাতাতে গিয়ে,
আচ্ছা ক'রে জোলাপ দিল নস্যি নাকে দিয়ে।
ডাক্তার এসে, বলল কেশে, "বড়ই কঠিন ব্যামো,
এসব কি সুচিকিৎসা ?—আরে আরে রামঃ।

আমার হাতে পড়লে পরে 'এক্সরে করে দেখি,
রোগটা কেমন, কঠিন কিনা—আসল কিংবা মেকি।
থার্মোমিটার মুখে রেখে সাবধানেতে থাকুক,
আইস-ব্যাগটা মাথায় দিয়ে একটা দিন ত রাখুক।
'ইন্‌জেকশন' নিতে হবে 'অক্সিজেন'টা পরে,
তার পরেতে দেখবো এ রোগ থাকে কেমন করে।"
পল্লীগ্রামের বদ্যিনাথ অবাক হ'লো ভারী,
সর্দি হলেই এমনতর ? ধন্য ডাক্তারী ॥

২

ভবিষ্যতে

স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ থাকবে না বন্ধন,
আমরা সবাই স্বরাজ-যজ্ঞে হব রে ইন্ধন ?
বুকের রক্ত দিব ঢালি স্বাধীনতাবে,
রক্ত পণে মুক্তি দেব ভারত-মাতাবে।
মূর্খ যারা অজ্ঞ যারা যে জন-বঞ্চিত,
তাদের তরে, মুক্তি-সুধা করব সঞ্চিত।
চাষা মজুর দীন দরিদ্র সবাই মোদেব ভাই,
এক স্বরে বলব মোরা স্বাধীনতা চাই।
থাকবে নাকো মতভেদ আর মিথ্যা সম্প্রদায়
ছিন্ন হবে ভেদের গ্রন্থি কঠিন প্রতিজ্ঞায়।
আমরা সবাই ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর
আমরা হব মুক্তিদাতা আমরা হব বীর।

এগুলো পড়লেই বুঝা যায় এ সমস্ত কাঁচা হাতের লেখা এবং এর মধ্যে ছন্দ ভাব বা ভাষার কোনো বিশেষত্ব নেই। এগুলো নেহাতই সাধারণ রচনা। এর পরে এই কবিতার রূপ আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে। বলবার ভঙ্গীর মধ্যে আসে গাম্ভীর্য আর মিষ্টতা। ভাষা এবং ছন্দের বিশিষ্টতা চোখে পড়ে।

এই কবিতার জন্মটির একটা সুন্দর স্মৃতি আজও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। আমার ছোট ভাই সরোজ বলল, "সুকান্তদা আমায় একটা কবিতা লিখে দাও না।" ও বলল, "তোর কবিতা চাই তবে আমায় একটা কাগজ পেনসিল

দে।" কাগজ পেন্সিল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এই কবিতাটি লিখে ফেলল, যেন মুখস্থ ছিল। আমার বৌদি অমলা দেবী রসিকতা ক'রে বলল—মুখস্থ কবিতা লিখে বাহাদুরী নেওয়া হচ্ছে? সুকান্ত একটু হাসল মাত্র।

১ আজিকের দিন কেটে যায়—

আজিকার দিন কেটে যায়—
অনলস মধ্যাহ্ন বেলায়
যাহার অক্ষয় মূর্তি পেয়েছিনু খুঁজে
তারি পানে আছি চক্ষু বুজে।
আমি সেই ধনুর্ধর যার শরাসনে
অস্ত্র নাই, দীপ্তি মনে মনে,
দিগন্তের স্তিমিত আলোকে
পূজা চলে অনিত্যের বহ্নিময় স্রোতে
চলমান নির্বিবোধ ডাক,
আজিকে অন্তর হতে চিরমুক্তি পাক।
কঠিন প্রস্তরমূর্তি ভেঙে যাবে যবে
সেই দিন আমাদের অস্ত্র তাব কোষমুক্ত হবে।
সুতরাং রুদ্ধতায় আজিকার দিন
হোক মুক্তিহীন।
প্রথম বাঁশির স্ফূর্তি গুপ্ত উৎস হতে
জীবন-সিন্ধুর বুকে আন্তরিক পোতে
আজিও পায় নি পথ তাই
আমার রুদ্রের পূজা নগণ্য প্রথাই
তবুও আগত দিন ব্যগ্র হয়ে বারম্বার চায়
আজিকার দিন কেটে যায়।

২ পঁচিশে বৈশাখ—

বেলাশেষে শান্ত ছায়া সন্ধ্যার আভাসে
বিষণ্ণ মলিন হ'য়ে আসে

তারই মাঝে বিভ্রান্ত পথিক
তৃপ্তিহীন খুঁজে ফেরে পশ্চিমের দিক।
পথ প্রান্তে প্রাচীন কদম্ব তরুমূলে
ক্ষণতরে স্তব্ধ হ'য়ে শান্তি যায় ভুলে,
আবার মলিন হাসি হেসে
চলে নিরুদ্দেশ।

রজনীর অন্ধকারে একটি মলিন দীপ হাতে
কাদের সন্ধান করে উষ্ণ অশ্রুপাতে
কালের সমাধি তলে।

স্মৃতিরে সঞ্চয় ক'রে জীবন-অঞ্চলে
মাঝে মাঝে চেয়ে রয় ব্যথা-ভরে পশ্চাতের দিকে
নির্নিমিখে।
যেথায় পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে অমর অক্ষরে
সেথায় কাদের আর্তনাদ বারম্বার বৈশাখীর ঝড়ে।

আবার সম্মুখ পানে
যাত্রা করে রাত্রির আহ্বানে,
ক্ষীণদীপ্ত উর্বর আলোতে
চিরন্তন পথের সঙ্কেত
রেখে যায় প্রভাতের কানে।

অকস্মাৎ
আত্মবিস্মৃতির অন্তঃপুরে
অত্যুজ্জ্বল মানস মুকুরে
ভেসে উঠে উত্তর কালের আর্তনাদ,

কবিগুরু

আমাদের যাত্রা সুরু
কালের অরণ্য পথে পথে
পরিত্যক্ত তব রাজপথে।
আজি হতে শত বর্ষ আগে
কত গোধূলির সন্ধ্যারাগে

সুকান্ত স্মৃতি

যে দিগন্ত হয়েছে রক্তিম
সেথা আজ কারো চিত্ত-বীণা
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজে কি না
সে কথা শুধাও ?
শুধু দিয়ে যাও
ক্ষণিকের দক্ষিণ বাতাসে
তোমার সুবাস
বাণীহীন অন্তরের অন্তিম উল্লাস,
তোমার কাব্যের তাজমহল
আমাদের রিক্ত অশ্রুজল,
পরিখায় রেখেছে বাঁধিয়া।
বাধামুক্ত হিয়া
অজস্র উপেক্ষা ভরে বিস্মৃতির পশ্চাতে ফেলিয়া
ছন্ন বাধা বলাকার মত
মত্ত অবিরত
অনাগত প্রভাতের পুষ্প-কুঞ্জ-বনে
আজ শূন্য মনে।
ক্লান্ত আজ পশ্চাতের উৎসবের বাঁশী
নবীন প্রভাতে,
পুরবাসী বরমাল্য হাতে,
অস্তাচলে পথিকের মুখে মূর্ত হাসি ॥

আমাদের অনুরোধে পড়ে সুকান্ত কয়েকখানা গানও লিখেছিল, তার থেকে কয়েকখানা তুলে দেওয়া গেল।

ওগো কবি তুমি আপন ভোলা,
আমি তুমি নিথর জলে ঢেউয়ের দোলা।
মালাখানি নিয়ে মোর
এ কি বাঁধিলে অলক ডোর
নিবেদিত প্রাণে গোপনে তোমার কী সুর তোলা!

জেনেছো তো তুমি অজানা প্রাণের নীরব কথা।
তোমার বাণীতে আমার মনের এ ব্যাকুলতা—
পেয়েছো কী তুমি সাঁঝের বেলাতে,
যখন ছিলাম কাজের খেলাতে
তখন কী তুমি এসেছিলে—
ছিন্ন দুয়ার খোলা।

২

হে মোর মরণ, হে মোর মরণ!
বিদায় বেলা আজ একেলা
দাও গো শরণ।
তুমি আমার বেদনাতে
দাও আলো আজ এই ছায়াতে
ফোটার গন্ধে অলস ছন্দে
ফেলিও চরণ।
তোমার পায়ে কী আছে যে,
জীবন-বীণা উঠেছে বেজে?
আমায় তুমি নীরব চুমি
করিও হরণ।

৩

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী মঞ্জুল মঞ্জীর ধ্বনি
মম অন্তর-প্রাঙ্গণে আসন্ন হল আগমনী
ঘুমভাঙা উদ্বেল রাতে
আধ ফোটা ভীরু জ্যোৎস্নাতে
কার চরণের ছোঁওয়া হৃদয়ে উঠিল রণরণি।
মেঘ-অঞ্জন-ঘন কার এই আঁখিপাতে লিখা,
বন্দন-নন্দিত উৎসবে জ্বালা দীপশিখা।

মুকুলিত আপনার ভারে
টলিয়া পড়িছে বারে বারে
সংগীত হিল্লোলে কে সে স্বপনের অগ্রণী ॥

এগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব বেশী এবং এর মধ্যে সুকান্তর বিশেষত্ব বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। তবে লেখককে কবি বলে স্বীকার ক'রে নেবার মতো সম্পদ এতে যথেষ্ট আছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর শেষ দিকের কবিতাগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় সুকান্তর সত্যিকারের পরিচয়। এসব কবিতাগুলো সাধারণ পথ ছেড়ে নতুন পথে চলতে শুরু করে।

কনভয়

হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল
যুদ্ধ-ফেরত এক কনভয় :
ক্ষেপে ওঠা পঙ্গপালের মত
রাজপথ সচকিত করে।
আগে আগে কামান উঁচিয়ে,
পেছনে নিয়ে খাদ্য আব রসদের সম্ভাব।
ইতিহাসের ছাত্র আমি,
জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম
ইতিহাসেরই দিকে।
সেখানেও দেখি এক উন্মত্ত কনভয়
ছুটে আসছে যুগ-যুগান্তে রাজপথ বেয়ে।
সামনে ধুম উদ্গিরণরত কামান,
পেছনে খাদ্য-শস্য আঁকড়ে ধরা জনতা
কামানের ধোঁয়া আড়ালে দেখলাম
মানুষ।
আর দেখলাম ফসলের প্রতি তাদের
পুরুষানুক্রমিক মমতা।
অনেক যুগ, অনেক অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র পেরিয়ে
তারা এগিয়ে আসছে ঝলসানো কঠোর মুখ।

২

হে মহাজীবন

হে মহাজীবন, আর কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ লালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িতে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ॥

এগুলো থেকে সুকান্ত-প্রতিভা এবং ওর রচনার বিশেষত্ব বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো আবার ছন্দ এবং মিল ছাড়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুকান্তর রচনাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম অংশের কবিতাগুলোর মধ্যে ওর অপরিণত মনের সুস্পষ্ট ছায়া যেন দেখা যায়। মাঝের রচনাগুলিতে সাধারণ কবিদের মতো মিল ছন্দ প্রভৃতির প্রাধান্যই বেশী। আর শেষ দিকের কবিতাগুলোর মধ্যে সুকান্তকে যেন বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। এইসব রচনার মধ্যে বলবার বিষয়বস্তুর প্রাধান্যই আমরা লক্ষ্য করতে পারি। আর এগুলো থেকে কবির বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই যেন এসব কবিতার মূল প্রেরণা।

প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের রচনাগুলো এখন আর বিশেষ পাওয়া যায় না। এগুলো সুকান্তর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস। ওর শেষ দিকের রচনাই বেশী। সুকান্তর প্রথম দিকের রচনাগুলিকে শেষ দিকে ওর নিজের রচনা বলে মেনে নিতে ও লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হত।

কবি সুকান্ত এবং তাঁর পত্রগুচ্ছ ॥ মিহির রায়চৌধুরী

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের জীবন-সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গে ক্ষুব্ধ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এই প্রাচীন পৃথিবী তার বহুদিনের প্রচলিত বিশ্বাস, ঐতিহ্য আর সংস্কারের বোঝা বইতে বইতে ভারবাহী ক্লান্ত পশুটির মতন অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ালো। আর এগিয়ে যেতে পারল না। রক্ষণশীল আর সংস্কার-প্রিয় মানুষের দল তার পিঠের ওপর কড়া চাবুক চালালো। কারণ এতকাল ঐ চাবুকের মহিমায় বিবর্তনের পথ বেয়ে মানুষকে তারা কেবল আত্ম-বিক্রয়ের পথই দেখিয়েছে। কিন্তু এর প্রতিবাদ পর্বের সূত্রপাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই পৃথিবীর সীমানা ভাঙতে আরম্ভ করল। ভাঙতে আরম্ভ করল বিভেদের প্রাচীর। অত্যাচারিতের দল এবার প্রতিবাদের শক্তি খুঁজে পেয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শুধু সূচনা হল, পরিবর্তনের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল, যদিও সেই প্রতিবাদ তখনো সোচ্চার হয়ে ওঠে নি। সামাজিক আর নৈতিক জীবনে কেবল পরিবর্তনের অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। মার্কসের বৈপ্লবিক সাম্যনীতির প্রসার ঘটতে লাগল সে সময় থেকে আর অতীত আদর্শ তথা বিশ্বাসের ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়ে এক নতুন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হল। বলা বাহুল্য তখনই যে বীজ অঙ্কুরিত হল তার নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তির জন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

পশ্চিমী সভ্যতায় নতুন ভাবতরঙ্গের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের ভাবজীবন আর রোম্যান্টিকতার অতল সমুদ্রে ডুব দিতে রাজী নয়। সে চায় একটা স্থির লক্ষ্য। পায়ের নিচে একটা শক্ত জমি। যার ওপর দাঁড়িয়ে সে বাঁচার জন্যে লড়াই করতে পারে। পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম, নিয়ম, নীতি আর আচার-আচরণের প্রতি মানুষের সেই প্রাচীন মূল্যবোধ শিথিল হয়ে এসেছে। মানুষের মন আর ভাবের বন্যায় ভেসে যেতে রাজী নয়। সে পৃথিবীকে জানতে চায় যুক্তির আলোকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে করতে তার মন আর কোনো ক্ষেত্রে আপোস করতে চায় না। বিবর্তনের অনিশ্চিত পথ ত্যাগ ক'রে এবার বিপ্লবের পথে নিজের বাঁচার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

পশ্চিমী সভ্যতার এই সাগর উথলানো ঢেউ বাংলাদেশকে প্লাবিত করতে বেশী

সময় নেন নি। To be or not to be-র হ্যামলেটিয় অস্থিরতা ও সংশয়, মানুষের আদর্শগত দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধূম্রধূসর প্রেক্ষাপটে। এ কেবল বুদ্ধিজীবী বাঙালীর সমস্যা হয়ে ওঠে নি। এর সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের প্রাণের কথাও মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এক নতুন রাজনৈতিক সংগ্রাম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল। সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতির মধ্যে ভেদাভেদের সমস্ত রেখা লুপ্ত হয়ে একাকার হয়ে গেল। দুঃখ-দারিদ্র্যের পটভূমিতে অত্যাচারিত মানুষের সংগ্রামী মনোভাবের প্রকৃত পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটল।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তখনো বাংলা সাহিত্যের মধ্যগগনে মধ্যাহ্নের সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান। রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সমকালীন যুগভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে সে সময় যাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা কিন্তু কতটা শেষ রক্ষা করেছিলেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মার্কসীয় সাম্যবাদী চিন্তার পাশাপাশি ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের অবাধ সংমিশ্রণে যা পাওয়া গেল তা সত্য হতে পারে কিন্তু সংগ্রামী মানুষের প্রকৃত পরিচয় এদের সাহিত্যে একরকম পাওয়া যায় নি। সংগ্রামী মানুষের প্রকৃত পরিচয় বাংলা সাহিত্যে ব্যক্ত হতে আরো কিছু সময় নিয়েছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন কবি কবিতার ভাববাদী এই ফর্মকে ভেঙে দিয়ে মানুষের জীবন-কথাকে আরো গভীরভাবে ব্যক্ত করলেন।

বাংলা কাব্য-জগতে সুকান্ত ভট্টাচার্য যেমন আশ্চর্য তেমনি এক বিরল প্রতিভার কবি। মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কবিমাত্রেই সে বয়সে রোম্যান্টিকতার আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হন। এক অনির্বচনীয় আনন্দে কাব্যের ভাব-ভাষা-ছন্দ তখন লঘুপক্ষ বিস্তার ক'রে অনন্ত সৌন্দর্যলোকে উধাও হয়ে যায়। অথচ সুকান্তর মধ্যে এর এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সে রোম্যান্টিকতার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল মানুষের সংগ্রামী জীবনকে অমন প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করার দৃষ্টিকে সে কোথা থেকে পেয়েছিল তা ভাবতেও অবাক লাগে। অন্তত ঐ বয়সের কবিদের কাছে জীবন থেকে রোম্যান্টিক ভাবতন্ময়তার আলো-আঁধারির ব্যঞ্জনায় দূরগামী হওয়ার কথা। সুকান্ত কিন্তু সেই বয়সে শক্ত পৃথিবীর ওপর আরো বাস্তব কঠিন পাথুরে জমিতে কাস্তে হাতে কাব্যের ফসল ফলাতে মগ্ন। কলকারখানায়-ক্ষেত-খামারে ইতর-মজুর শ্রেণীর সঙ্গে নিজের জীবনকে একসূত্রে গেঁথে নিয়েছিল

সুকান্ত। এই কবি অকালে লোকান্তরিত না হলে বাংলাদেশ এই বিরল প্রতিভার কবির কাছে আরো বিস্ময় এবং ঐশ্বর্য খুঁজে পেত তা নিশ্চিন্তে বলা যায়। তার মধ্যে উগ্র রাজনৈতিক মতবাদ দিনে দিনে প্রবল হয়ে ওঠে এবং কবিতার ছত্রে ছত্রে বিদ্রোহের সুর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। সুকান্তর কবিতার শৌখিন মজদুরীর কোনো স্থান ছিল না। শ্রমিক কৃষকের জীবনকে দূর থেকে দেখা নয়, গা এলিয়ে মিথ্যাচারের আত্মমগ্ন হয়ে কপট আশ্রয় নয়। বরং শ্রমিক-কৃষকের জীবনের সঙ্গে জীবন মেলাবার এক হৃদ্যপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। সুকান্তর অকাল মৃত্যু না হলে বাঙালী পাঠক যে আরো স্থির রূপ প্রত্যক্ষ করতেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুকান্তর মৃত্যুকালীন কবিতাগুলো পাঠ করলে বোঝা যায় যে, ঠিক যে সময় তার কবিতা এক নতুন দিকে মোড় নিচ্ছিল সেই সময়ে তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

সুকান্তর কবিতায় রাজনীতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন নিছক রাজনৈতিক কবিতা লেখার ফলে সুকান্তর প্রতিভার যোগ্য পরিচয় পাওয়া যায় নি। কারণ কবিতায় রাজনীতির প্রভাব অনেকের অপছন্দ। বরং বাস্তবাতীত গতানুগতিক রোম্যান্টিক আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত এই কাব্যসাহিত্যকে কারা মানবজীবনের বাইরে বস্তু-সম্পর্করহিত অবস্থায় রেখেই তৃপ্ত। সুকান্তর রাজনীতি-ঘেঁষা কবিতা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠেছিল যে কবিতাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শপূর্ণ স্লোগান প্রধান হয়ে আছে। সুকান্ত কবিতাগুলো যদি একবার রাজনৈতিক স্লোগানে পরিপূর্ণ অভিহিত করা যায় তবে তাদের পক্ষে কিশোর কবিকে অকবি প্রমাণ করা কঠিন হবে না। কিন্তু কালের বিচারে সব যুক্তি ধোপে টেঁকে নি। মানুষের প্রাণের ভাষা, প্রাণের ব্যথা সুকান্তর কবিতায় প্রথম উচ্চারিত হতে দেখি। এবং বর্তমান জীবনের দিকে তাকিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কবিতায় রাজনীতি থাকবেই। সুকান্ত এদিক দিয়ে ছিল ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। আগামী দিনের পরিবর্তনশীল মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ সাহিত্যের রুচি কোন্ খাতে বইবে তা উপলব্ধি করার শক্তি ঐ বয়সেই সুকান্ত অর্জন করেছিল। উত্তরকালে সুকান্ত প্রদর্শিত পথে বাংলায় প্রচুর রাজনৈতিক কবিতা লিখিত হয়েছে। তাদের অনেকে পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। অতঃপর সুকান্ত যদি নিছক রাজনৈতিক স্লোগানধর্মী কবিতাই লিখে থাকে তবে তা মানব-সমাজের বৃহত্তর প্রয়োজনের স্বার্থেই লিখিত হয়েছে। আজ দ্বিধাহীন চিত্তে একথা বলা যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে সুকান্তর সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ ছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের সংস্পর্শে এসে সুকান্ত রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। কিন্তু প্রথম পর্বে ওর কবিতায় যে রাজনৈতিক মতবাদ উগ্ররূপ ধারণ করেছিল পরবর্তীকালে তার রূপ ততটা উগ্র ছিল না। তবে সুকান্তের রাজনৈতিক বিশ্বাস এতে শিথিল হয় নি। অন্যপক্ষে কবি সুকান্তর কবিতায় পরিণতির ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উত্তরকালে বঞ্চিত সর্বহারা শ্রেণীর কথা কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে সুকান্ত অপূর্ব পরিণত মননের পরিচয় দিয়ে অপূর্ব স্থৈর্যের সঙ্গে কবিতার ফসল ফলিয়েছে। দেশকাল সীমার অতীত জীবন-সমস্যার কথা কবিতায় তখন নতুন প্রাণের জোয়ার এনেছে। পৃথিবীর প্রতিটি বঞ্চিত মানুষের হাহাকারে কবিতাগুলো অপূর্ব সংযমের সঙ্গে, কখনো তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল।

কবি সাহিত্যিক মাত্রেই একটা ব্যক্তিগত জীবনে আছে। পৃথিবীর অজস্র কবি-সাহিত্যিকের এই ব্যক্তিগত চরিত্রটি ধরা যায় তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত কতকগুলো চিঠির মাধ্যমে। খুব সতর্ক কবির ব্যক্তিগত চিঠি আমরা ব্যক্তি কবির প্রকৃত পরিচয় জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে অনেকাংশ অবশ্য ব্যতিক্রম-হিসাবে গণ্য হতে পারে। ছিন্নপত্র অনেকটা ডায়েরীফর্মে লেখা এবং সাহিত্য-ঘেঁষা। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এমন অনেক কবিই আছেন যাঁদের ব্যক্তিগত অনেক কথাই আমরা তাঁদের চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানতে পারি। চিঠিগুলি অবশ্যই সাহিত্য সম্পর্করহিত অথবা সামান্য সম্পর্কযুক্ত। ফলে ব্যক্তি মানুষটির মনের প্রকৃত হদিশটি পাওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। সুকান্তর কয়েকটি চিঠি পর্যালোচনা করলে আমরাও কিশোর কবির ব্যক্তিগত জীবনের কিছু রহস্য আবিষ্কার করিতে পারি। আমরা সুকান্তর চিঠিপত্রের ছাপা অবস্থায় যা দেখতে পাই তার অধিকাংশ লিখিত হয়েছে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরুণাচল বসুকে। চিঠিগুলি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি সুকান্তর সঙ্গে কিশোর কবির যে আগাগোড়া একটা বোঝাপড়া ছিল এমন নয়। সুকান্তকে আমরা ওর কবিতার মধ্যে যে ভাবে খুঁজে পেয়েছি ওর লেখা চিঠির মধ্যে পরিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। রোম্যান্টিক কবিদের যেমন অরূপসৌন্দর্য অন্বেষণের একটা প্রবণতা আছে সুকান্তর কবিতায় তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু সুকান্তর চিঠিগুলো দেখলে বোঝা

যাবে কবিতার সঙ্গে সেগুলোর কী আশ্চর্য রকমের অমিল। চিঠিগুলোর মধ্যে রোম্যান্টিক কবিসুলভ উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। নিঃসন্দেহে ওর কবিতার বিচারে এ এক নতুন দিক।

রোম্যান্টিক কবিমাত্রেই প্রকৃতির মধ্যে অরূপসৌন্দর্যের অনুসন্ধান ক'রে থাকেন। কবিতার মধ্যে তাঁরা ভাবতন্ময় হয়ে এক রহস্যময় ছায়াচ্ছন্ন মায়াপুরীতে উত্তীর্ণ হন। চেতনাহীন সেই জগতে আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত মন এসে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, কারণ আমাদের পরিচিত বস্তুগুলি এখানে রহস্যঘন হয়ে ওঠে। কিন্তু সুকান্তর কবিতায় তেমন কোনো ইঙ্গিত নেই। অথচ সুকান্তর চিঠি পড়তে গিয়ে কৌতূহলী পাঠক নিশ্চয় তার প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় পেয়েছেন। এখানে দু'একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল। "...তখন ছিল গভীর রাত...আর সেই রাত্রির গভীরতা প্রতিফলিত হচ্ছিল সেই মৌনমূক বরাকরের জলে। কেমন যেন ভাষা পেয়েছিল সব কিছুই। সেই জল আর অদূরবর্তী একটা গম্ভীর পাহাড় আমার চোখে একটা ক্ষণিক স্বপ্ন রচনা করেছিল। বরাকর নদীর একপাশে বাঙলা, অপর পাশে বিহার আর তার মধ্যে স্বয়ং-স্ফূর্ত বরাকর, কী অদ্ভুত, কী গম্ভীর। আর কোনো নদী...আমার চোখে এত মোহ বিস্তার করতে পারে নি।...এই বেগ আর আবেগ কেবল আমাকেই প্রমত্ত করল।" আর এক জায়গায় প্রকৃতি বর্ণনা অপরূপ হয়ে উঠেছে; "...সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সেই অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ে বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশী।...তারপর গেলাম অদূরবর্তী প্রপাত দেখতে। গিয়ে যা দেখলাম তা আমার স্নায়ুকে, চৈতন্যকে অভিভূত করল। মুগ্ধ সুকান্ত তাই একটা কবিতা না লিখে পারল না।" ঐ চিঠিরই আর এক জায়গায় আছে; "...জোন্‌হা সারারাত বিপুল বেগে তার গৈরিক জলধারা নিষ্ঠুরভাবে আছড়ে আছড়ে ফেলতে লাগল কঠিন পাথরের উপর, আঘাতজর্জর জলধারার বুকে জেগে রইল রঙের লাল আর রুদ্ধ ঘরে শোনা যেতে লাগল আমাদের ক্লান্ত নিঃশ্বাস। প্রহরীর মতো জেগে রইল ধ্যানমগ্ন পাহাড় তার অকৃপণ বাৎসল্য নিয়ে, আর আমাদের সমস্ত ভাবনা ঢেলে দিলাম সেই বিরাটের পায়ে।" বিশ্বাস করতেও অবাক লাগে যে এমন এক রক্তমাংসের সংগ্রামী কবি প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, কবি মাত্রেই তা সে রোম্যান্টিক হোন আর না হোন সময় আর স্থান বিশেষে দুর্বল হয়ে যান। স্বভাব কবি সুকান্তর কাছে এ যেন ক্ষণিকের ভাবতন্ময়তা, মুহূর্তের স্বপ্নাবেশ। বাইরে থেকে একে চৈতন্যের

তাৎক্ষণিক মূর্ছিত অবস্থা বলা যেতে পারে। শহর জীবনের বাইরে প্রকৃতির নিকটে গিয়ে নাগরিক কবি (?) ক্ষণিকের জন্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেলেন মাত্র। কবির ব্যক্তিগত তথা কবিতার মূল বিশ্বাস কিন্তু পথভ্রষ্ট হয় নি। তাই প্রকৃতির মধ্যে কেবল সৌন্দর্য অনুসন্ধান ক'রেই সুকান্ত তৃপ্ত নয়। জীবনের দুঃখকে ভুলতে গিয়েও ভুলতে পারে নি সে। জীবন-পলাতক রোম্যান্টিক কবিদের মতন নিরুদ্দেশ যাত্রা সুকান্তর সম্ভব হয় নি। কেবল মানুষের হিংসা থেকে সাময়িকভাবে বিশ্রাম নিতে হিংস্র-প্রকৃতির মধ্যে বিশ্রামসুখ উপভোগ করতে চায় কবির মন…"বাস্তবিক, আমি কোথাও চলে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে মিলিয়ে যেতে চাই…কোনো গহন অরণ্যে কিংবা অন্য যে কোনো নিভৃততম প্রদেশে যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল সূর্যের আলোর মতো স্পষ্টমনা হিংস্র আর নিরীহ জীবেরা আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ।"

রোম্যান্টিক কবিরা যে অর্থে জীবন-পলাতক সে অর্থে পত্র-লেখক সুকান্ত কোনো-ক্রমেই জীবন-পলাতক নয়। রোম্যান্টিক কবি মাত্রেই নির্জন ইন্দ্রিয়বোধের কাছে আনুগত্য প্রদর্শন করেন। সুকান্তর চিঠির মধ্যেও তার একাকীত্বের প্রতি আকর্ষণ উপলব্ধি করা যায়; "…তবে একাকীত্ব অনুকূল নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করার পক্ষে। একাকী মানুষ যা চিন্তা করে সেইটাই তার নিজের চিন্তা। নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের প্রকৃতিকে কাছে পায়। সেই জন্যেই, একাকীত্বের একটা উপকারিতা আছে বলে আমার মনে হয়। তা দীর্ঘ হলেও আমার ক্ষতি নেই।" অবশ্য এ নির্জনতা তথা একাকীত্ব চিরকালীন ব্যাপার নয়, নেহাতই কবির সাময়িক mood-এর পরিচায়ক। আর একটি চিঠিতে সেটা স্পষ্ট ধরা যায়,… "আমরা নির্জনতাপ্রিয় একথা সম্পূর্ণ মিথ্যে। সাময়িকভাবে নির্জনতা ভাল লাগলে যে চিরকালই ভাল লাগবে এমন কথা আমরা বলি না…আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হব, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? যে কবি জনতার কথা একবারও নিজের সত্তা থেকে ভুলতে রাজী নয় তাকে কী একাকীত্ব আর নির্জনতা জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেত পারে? বরং এই নির্জনতা যেন তার সাধনাকে আরো তীব্র ক'রে তুলেছে।

সুকান্তর কবিমনের অন্তরালে একটি ব্যথা সতত সঞ্চারিত ছিল। সুকান্তর কবিতার তীব্র গতিবেগের স্রোতে এ ব্যথার সামগ্রিক পরিচয় এক সার্বজনীন স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। একটি চিঠির মধ্যে সুকান্তর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথার

পরিচয় পাওয়া যায়;—"এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আর কপটতার আশ্রয় নিলুম না এই জন্যেই যে, কথাটা গোপন হলেও ব্যথাটা আর গোপন থাকতে চায় না,…এ ব্যাপারটা আমার প্রাণের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে, তোর কাছেও তা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আবেগের বেগে সংযমের কঠিনতা গলে তা পানীয়রূপে প্রস্তুত হল তোর কৌতূহলে। তুই এ প্রেমে ফেনায়িত কাহিনী সুরা কি পান করবি না?—এই সুরার মূল্য যে শুধু সহানুভূতি ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস।" কিন্তু এই ব্যথার কি উৎস। তবে কী সুকান্ত প্রেমিক। তা অস্বীকার করা যায় না। প্রেমিক সুকান্ত কবিতায় কোনো প্রেমিকার উত্তপ্ত বাহুস্পর্শে গভীরভাবে ধরা দেয় নি। অথচ ব্যক্তিগত চিঠিতে সুকান্তর প্রেমিক মনটি প্রেয়সীর চিন্তায় আকুল; "—ওর নিঃশ্বাস অনুভব করতাম বুকের কাছে।—যখন সবে এসে দাঁড়িয়েছি যৌবনের সিংহদ্বারে—কেঁপে উঠল বুক যৌবনের পদধ্বনিতে।" প্রেমিক সুকান্ত তখন প্রেমের বাঁধনে ধরা দিয়েছে। আত্মসমর্পণ করেছে প্রেমিকার কাছে,—"নতুন করে ভালোবাসতে শুরু করলাম ওকে।" কিন্তু কবির মন স্থির থাকে নি এই প্রেমে,—তবে উপক্রমণিকাকে আমি একেবারে মুছে ফেলেছি মন থেকে, তার জায়গায় যে আসন নিয়েছে তার পরিচয় দেব পরের চিঠিতে।" একটি প্রেমের অন্তিমে আর একটি প্রেমের যাত্রা শুরু হল। প্রকৃত কবিহৃদয় থাকলেই এমন আবেগপ্রবণ হয়, মন এমন অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোথাও স্থির হয়ে নিজেকে ধরা দিতে পারে না কোনো কবি। সুকান্তর মধ্যেও এর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। অন্য আর একটি চিঠিতে প্রেমিক সুকান্তর মনোস্বভাবের আর একটি বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়, "বাস্তবিক আমার প্রেমের বেদনা বড় অভিনব। হয়তো আমি যে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি দেখি সেই সিঁড়ি দিয়েই ও নামছে, অবতরণকালীন ওর ক্ষণিক দৃষ্টি আমার চোখের ওপর পড়ে আমার বুকে স্নিগ্ধ মধুর শিহরণ জাগিয়ে যায়। একটু আনন্দ, কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় মুষড়ে পড়ি। একটি ঘরে অনেক লোক, তার মধ্যে আমি যখন কথা বলি, তখন যদি দেখি ও আমার মুখের দিকে চেয়ে আমারই কথা শুনছে, তাহলে আমার কথা বলার চাতুর্য বাড়ে আরও বেশী। আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ি, এমনি ওর প্রতি আমার প্রেম। কিন্তু বড় ব্যথা।"

কবি মাত্রেই জীবনে থাকে সংশয়। এই সংশয় থেকে জন্ম নেয় বেদনাবোধ, যা হয় মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা। সুকান্তর মধ্যেও এই সংশয় কখনো গভীরভাবে,

কখনো অস্পষ্ট রূপে দেখা যায়; "…আমি আজও জানি না, ও আমায় ভালবাসে কিনা। কতদিন আমি ভেবেছি, ওর কাছে গিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করব, এই কথার উত্তর চাইব। কিন্তু সাহস হয় নি। একদিন এগিয়েও ছিলাম; কিন্তু ওর শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কথা বলবার শক্তি হারিয়ে গেছল।" জীবন সম্পর্কে সুকান্তর সংশয় কেবল প্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সেই সংশয় সঞ্চারিত হয়েছে জীবনের নানা ক্ষেত্রে। সংশয়ী পত্রলেখক সুকান্ত একজায়গায় লিখেছে; "…কেবল আমার পৃথিবীতেই দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। বেশ স্কুলে যাচ্ছিলাম, রাজনীতির চর্চা করছিলাম, এমন সময় এল কালবৈশাখীর মতো বিনা নোটিশে এক ঝড়, যা আমার চোখে ধুলো ছিটিয়ে দিল, আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম, আর সে বিভ্রান্তির ঘোর এখনো কাটে নি।" আর একটি চিঠিতে কিশোর কবির ব্যক্তিগত সংশয় আরো প্রবলাকার ধারণ করেছে। জীবন তখন তার কাছে অর্থহীন। বিদায় নেওয়ার জন্যে কবির মন উন্মুখ। যে কবি কেবল সংগ্রামের আহ্বান জানায় সে যে এভাবে জীবন-পলাতক হয়ে যাবে তা ভাবতেও অবাক লাগে; "…পরিশেষে এই বলে বিদায় নিচ্ছি যে, একদিকে বাইরের খ্যাতি, সম্মান, প্রতিপত্তি লাভ করছি, অন্যদিকে আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যৎকে চূর্ণ করে দিচ্ছে। আমার শিক্ষা-জীবনের ওপর এতবড় আঘাত আর আসে নি, তাই বোধহয় এত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে, এই স্বাভাবিকতাকে, তাই সমস্ত শিরা—শিরায় রক্তে রক্তে ধ্বনিত হচ্ছে।" কিন্তু সুকান্ত সংগ্রামী জনতার কবি তা চিঠির ঐ শেষ একটি শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে, আহ্বান জানায় সংগ্রামের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে কবির হৃদয়। রক্তের মধ্যে তা দোলা লাগায়। আর একটি পত্রে দেখা যাবে; "…আগুনের মধ্যে পতঙ্গ হয়তো ঝাঁপ দিতে চাইবে; চঞ্চল মনের অঞ্চল হয়তো বসন্তের বাতাসে একটু দুলতে চাইবে; মনের মাদকতা হয়তো একটু বাড়বে কিন্তু শীর্ণ শাখায় সে দোলা সুখের দিনগুলোকে ঝরিয়ে দেবে। আজকাল মাঝে মাঝে অব্যক্ত স্পৃহা সরীসৃপের মতো সমস্ত গা বেয়ে সুস্থ মনকে আক্রান্ত করতে চায়। আমি এ সমস্ত সহ্য করতে পারি না।"

কবি সুকান্তর পত্রগুচ্ছের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে গিয়ে কবির বিপরীত মনোভাবের কথাই লিখেছি। কবিতায় সুকান্তর যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও তার পরিচয় নগণ্য নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন এই কবির ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তৎকালীন বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তার নিজস্ব মনোভাবের পরিচয়

পাওয়া যায়। ১৯৪২ সালের লেখা কয়েকটি পত্রে যুদ্ধ সম্পর্কে সুকান্তর মনোভাব জানতে পারা যায়; "...ম্লানায়মান কলকাতার ক্রমস্তম্ভমান স্পন্দনধ্বনি শুধু বারম্বার আগমনী ঘোষণা করছে আর মাঝে মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মতো সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক। কিন্তু আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ ক'রে উঠবে সাইরেন—সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে ধ্বংসকে দেখে।...১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর ..."। জাপানী বোমারু বিমানের আক্রমণের ভয়ে ত্রস্ত কলকাতার আর এক নতুন রূপ দেখা দেয় ওর লেখা আর একটি চিঠিতে;"...কলকাতা এখন আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত নাগরিকরা পলায়ন তৎপর।" আর একটি চিঠিতে বোমারু বিমান, আক্রমণের একটি চিত্র পাওয়া যায়; "...কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেল, ব্যাপারটা ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, —তাই আক্রমণের একটা ছোটখাট আভাস দিচ্ছি। প্রথম দিন খিদিরপুরে, দ্বিতীয় দিনেও খিদরপুরে, তৃতীয় দিন হাতিবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে,...চতুর্থ দিন ড্যালহৌসী অঞ্চলে...আর পঞ্চম দিন অর্থাৎ গতকালও আক্রমণ হয়। কালকের আক্রান্ত স্থান আমার এখনও অজ্ঞাত।" যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীর প্রতি মানুষেব অপরিসীম ঘৃণার কথা সুকান্তর কবিতায় বার বার ব্যক্ত হয়েছে; "...অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। হয়তো এইটাই মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টির সময়...। আজকাল চারিদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজাব হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার ভবিষ্যৎ আকাশ।" এই সাধারণ মনুষটির ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে যেমন অভিমানবস্তু নেই; তেমনি ওব অপরিসীম দরদী মনের সহজ স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশেরও কোনো ঘাটতি নেই। ক্লান্তি আর মৃত্যুর-চেতনা আধুনিক কাব্যের মূলসুর। রিল্‌কে-এলিয়ট প্রভৃতি কবিদের কবিতায় এই মৃত্যু-চেতনা স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। অবশ্য এ কেবল দৈহিক মৃত্যু নয় বরং যুগের বন্ধ্যা রূপ জীবনের অচরিতার্থতায়, আগামী দিনগুলোর ইচ্ছায় জীবনের সব আশা এর মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে। সুকান্তর

কাব্যেও মৃত্যুচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তবে রোম্যান্টিক কবিদের ন্যায় জীবন পলাতক মতন কেবল আত্মহননের ভঙ্গীতে মৃত্যুকে আহ্বান জানায় নি সুকান্ত। অথচ সুকান্তর কয়েকটি চিঠিতে মৃত্যু সম্পর্কে তার বিপরীত মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৪২ সালের লেখা একটি চিঠিতে মৃত্যু সম্পর্কে ওর বিচিত্র মনোভাব জানা যায়; "...বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র করছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে। "...শুধু তখন থাকব না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবুও জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম।" তারও আগে ১৯৩৯ সালের লেখা একটি চিঠিতে পাওয়া যায় "...আমাব চারিদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাসগুলো আমাকেই দগ্ধ করতে ছুটে আসে আর তার সে রোমাঞ্চকর বিশ্বাস আমাকে লুব্ধ করে। আশার চিতায় আমার মৃত্যুর দিন সন্নিকট। তাই চাই আজ আমার নির্বাসন। তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই, তোমাদের ভুলতে চাই; দীন হয়ে বাঁচতে চাই। তাই সুখের দিনগুলোকে ভুলে, তোমাদের কাছে শেখা মারণমন্ত্রকে ভুলে, ধ্বংসের প্রতীক স্বপ্নকে ভুলে মৃত্যুমুখী আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু পারব না, তা আমি পারব না;—আমার ধ্বংস অনিবার্য।"

পরিশেষে জানাই, কিশোর কবি সুকান্ত তার কবিতাগুচ্ছে পাঠকদের কাছে যে রূপে ধরা দেয়, ওর পত্রগুচ্ছের মাধ্যমে আমরা ব্যক্তি সুকান্তকে ভিন্ন এক রূপে দেখি। একজন কবিকে পূর্ণাঙ্গ জানতে হলে কেবল তার কবিতামাত্রেই নয় ব্যক্তিগত জীবনের যথার্থ প্রতিফলন রূপে পত্রগুচ্ছের অবদানও নেহাত কম নয়। বলাবহুল্য সুকান্তর পত্রগুচ্ছ আমাদের আর একটি ভিন্ন ধরনের সুকান্তকে অতি সহজেই চিনিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। নিছক ব্যক্তিগত কবিতা সুকান্ত কোনো অর্থেই লেখে নি। তাই বলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি তার যে চরম ঔদাসীন্য আর অবহেলা ছিল এ কথা ভাবার কোনো ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নেই। অন্তত তার পত্রগুচ্ছের দিকে তাকিয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে সুকান্ত ছিল আক্ষরিক অর্থে সাধারণ। আর সুকান্ত সাধারণ মানুষ বলেই পত্রগুচ্ছের মধ্যে অতি সাধারণ, পরিহাসতরল ভঙ্গীতে বন্ধুদের যখন সম্বোধন করছে তখন ভাবতে অবাক লাগে এমন মূর্তিমান বিপ্লবী জনতার কবি কত সহজে ভাব-গাম্ভীর্যের আবরণটুকু খসিয়ে নির্মল পরিহাসতরল ভঙ্গীতে চিত্ত জয় করতে পারে।

সুকান্ত ও সেদিনের দিনগুলো ॥ প্রসূন বসু

আমি গাঁয়ের ছেলে।

গ্রাম থেকে ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলকাতা শহরে পড়তে এসেছি। সব কিছুই নতুন-নতুন লাগে। ট্রাম-বাস, গাড়ি-ঘোড়া সবই কেমন নতুন-নতুন। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।

দেশ সে বছর স্বাধীন হয়েছে। তার আগের বিদ্রোহের স্পর্শ কিছুটা গ্রামে বসেই অনুভব করেছি। ইংরেজ হটাবার জন্যে গ্রামের পথে-পথে মিছিল করেছি। কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে। শহরের ঢেউ খুব সামান্যই তখন গ্রামে পৌঁছুলো। ভাসা-ভাসা কিছু নাম মনের মাঝে ভোরের রোদ্দুরের মতো স্পর্শ লাগিয়ে যেতো। সত্যি কথা বলতে কি সুকান্তের নাম তখন একবার মাত্র শুনেছি।

কলকাতায় এসে যখন সুকান্তকে মনের কাছাকাছি পেলাম, তখন সুকান্ত মারা গেছে। সুকান্তকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। জীর্ণ মলাটে সুকান্তর 'ছাড়পত্র' তখন আমাদের হাতে-হাতে ঘুরছে ক্লাসে বসে গড় গড় ক'রে সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি করি। গলা ফাটিয়ে। সমস্ত ক্লাসময় একটা উত্তেজনা আগুনের ফুলকির মতো অকস্মাৎ ছড়িয়ে পড়ে। সুকান্তই তখন আমাদের কাছে একমাত্র কবি। সুকান্ত ছাড়া ভাবতে পারি না। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় দল বেঁধে সুকান্তর কবিতা আবৃত্তি করি। কতোই বা আর তখন আমাদের বয়স। বছর ষোলো হবে। একটা বেপরোয়া ভাব। লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলি। বুক ফুলিয়ে হাঁটি। সব কিছুকে অস্বীকার করার কি অদম্য উৎসাহ।

তারপর নিজের অজান্তে কখন যে গ্রামের বোকা-সোকা ছেলেটি কিভাবে শহুরে হয়ে উঠলাম, ধীরে ধীরে কি ভাবে যে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম আজ আর মনে নেই। তখন রাস্তা-ঘাটে মিটিং করেছি। একটা পরিবর্তনের আশায় যেন মশগুল হয়ে আছি। সুকান্তর কবিতায় কি অসাধারণ জাদু। অন্য কাব্যের অনুভূতির কথা আমি বলতে পারবো না। আমার সেই কিশোর তরুণ বয়সের সমস্ত চেতনার মাঝে 'ছাড়পত্র' জাগ্রত থাকতো।

তারপর সঙ্গীনের মুখোমুখি হয়েছি, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড করেছি, পুলিসের হাতে ধরা পড়ে বেদম মার খেয়েছি, জেলে গিয়েছি, সর্বত্রই সুকান্ত। সুকান্ত ছায়ার মতো আমাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সেদিনের একটা ছোট্ট ঘটনা মনে আছে।

পুলিসের সঙ্গে লড়তে লড়তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে আমরা কয়েকজন ছাত্র ধরা পড়লাম। জালঢাকা কালো গাড়ি ভর্তি ক'রে আমাদের সটান লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হল। সাদা চামড়ার একজন বাঁদরমুখো সার্জেন্ট আমাদের একজনকে সার্চ করছে, আর পিছনে দশাসই বুটের লাথি মেরে দোতলায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। ব্যাটা বোধহয় ফুটবলার। মাঠে নামার সুযোগ হয় না বলে আমাদের উপরেই সে তার বাসনা চরিতার্থ করছে।

দোতলার একটা ঘর ঠাসাঠাসি ক'রে আমাদের বস্তাবন্দী করার মতো ঢুকিয়ে দিয়ে লোহার গরাদ লাগিয়ে দেওয়া হল। বাইরে বুটের আওয়াজ। ভিতরে আমরা প্রায় অর্ধশত তরুণ এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি।

হঠাৎ আমার নজর দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য লেখা। কোনোটা পেন্সিল দিয়ে, কোনোটা ছুরি দিয়ে কেটে, কোনোটা বা লাল ইটের টুকরো দিয়ে। কতো রকমের মানুষ এই চার দেওয়াল বন্দী এই বদ্ধ ঘরটাতে দিন কাটিয়েছে। তারা তাদের মনের চিহ্ন রেখে গেছে দেওয়ালে। কত বছর ধরে বলতে পারবো না। বিচিত্র ধরনের সব মনের প্রকাশ।

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল। সুকান্তর কবিতার দুটি লাইন। কে লিখেছে না জানলেও লোকটির মুখের ছবি যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল আমিই বুঝি সেই দেওয়ালের লেখক। গলা ছেড়ে শুরু করলাম, শোন্ রে মজুতদার; অন্ধকার ঘরটা যেন চকিতে জেগে উঠল। আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আরও অসংখ্য কণ্ঠে ধ্বনিত হল সেই অগ্নিগর্ভ কবিতার লাইনগুলো।

তারপর কতো দিন কেটে গেছে। সেদিনের গমগমে দিনগুলোর কথা প্রায় ভুলতে বসেছি। আজ যখন সার্জারী-টেবিলে ছুরি-কাঁচি, হাতে ক'রে সুকান্তর কবিতাকে বিচার করার আসর বসে, আমার মন যেন কিছুতেই তাতে সায় দেয় না। নিজের অজান্তে, পিছনের দিকে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে আমি কখন সেই ঝলমলে দিনগুলোর দিকে এগিয়ে যাই।

জীবন দিয়ে ছাড়া কি সুকান্তর কবিতাকে অনুভব করা যায়! যারা করে করুক আমি অন্তত তাদের দল থেকে হাজার হাত দূরে।

সুকান্ত স্মরণে ।। প্রাণতোষ ঘটক

অন্তর্দাহে জ্বলছে অহোরাত্র, কিন্তু কোনো রকম বহিঃপ্রকাশ নেই। অন্তরে দাউদাউ আগুন বাইরে সদাহাস্য। সারল্যের প্রতীক যেন সেই মুখ। দেখলেই মনে হবে, পার্থিব কলুষ থেকে সে যেন মুক্ত। হাসিমুখে কথা বলতে বলতে সহসা স্তব্ধতায় গম্ভীর হয়ে ওঠে। জানলার বাইরে প্রোজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি চালিত হয়। কী অমন নির্নিমেষ দেখছে কে জানে। কই কিছু তো নেই ঐ অদূরে। দুপুরের খটখটে শুভ্র আকাশে গোটা দুই চিল, স্থির ডানা মেলে ভেসে ভেসে পাক দিচ্ছে। লক্ষ্য করলাম ক্ষণেকের মধ্যে সেই নিষ্পলক চোখ দুটিতে যেন বিদ্যুতের ঝলক ফুটে উঠল। সুদূর শূন্যে হিমস্নিগ্ধ মেঘের বুকে ঐ আরামে আর আনন্দে ভাসমান চিল দু'টো যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, এমনই দৃষ্টিবাণ হানছে চিরকিশোর সুকান্ত। জন্মগত অধিকারে শুধু, ঐ হিংস্র আর রক্তপায়ী চিলজোড়াটা আসমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে, বিদ্রোহী কবিচিত্ত কী সহজে মেনে নিতে পারে? ধনতন্ত্রের দেশে আবার নরখাদক চিলই জাতীয়পক্ষীর সম্মানিত আসন পেয়েছে। কবিমানস তার, ধনুর্বাণ ধারণ করে না হাতে, তবে তীক্ষ্ণধার তরোয়ালের চেয়ে অধিকতর ক্ষুরধার লেখনীচালনার দক্ষতা সে দখল করেছে। বেশ খানিক নিঃসাড়, নিশ্চুপ সুকান্ত। মুক্ত জানলা থেকে নৈদাঘ তপ্তরৌদ্রের ধারালো এক খণ্ড রেখা ছড়িয়েছে সম্পাদকীয় দপ্তরের টেবিলে।

আজ মনে নেই, সুকান্তর সঙ্গে ছিল কে। ছিল কেউ একজন। কেন না সুকান্ত একা কোনোদিন আসে না। সঙ্গীসাথী কেউ একজন সহযাত্রী থাকে। শূন্য কলস নয়, প্রতিভাধর, অনন্ত কবিশক্তির অধিকারী। তাই সবাই যেন বিনয়নম্র, লজ্জা আর সঙ্কোচে একটু যেন বেশি সুস্থির। অহেতুক আত্মপ্রচারের ধান্দায় ঘোরাঘুরি করে না। কচিৎ কখনও নিঃশব্দে আসে সুকান্ত। সঙ্গে থাকে কোনোদিন তার দুই বন্ধুর যে কোনো একজন। নয় কবি অরুণাচল বসু কিংবা হয়তো কবি সিদ্ধেশ্বর সেন।

সুকান্তকে দেখলে, তাকে কাছে পাওয়া গেলে যেন এক অভিনব আবেগে প্রিয়সঙ্গ-সুখের আস্বাদ পাই। কিছুদিন দেখা না পেলে অদর্শনের ব্যথা বাজে মনে। কলকাতার শহরতলিতে সুকান্তদের বাসায় গিয়ে হাজির হই। দেখা

কই? তুমি কই? অবিশ্রান্ত শ্রাবণধারায় ডুবুডুবু বেলাঘাটা অঞ্চল। গাড়ি যাওয়ার পথ নেই আর। জলে জলময়; যেন এক বন্যাঞ্চল। হাঁটু-ভর্তি নোংরা জলে পথ-ঘাট নালা-নর্দমা থৈ থৈ। দেখে যেন বিশ্বাস করতে পারে না সুকান্ত, মধুর আপ্যায়নের হাসি ফোটে তার মুখে। লেখার খাতা বের করে। নতুন লেখা ধরিয়ে দেয় হাতে। শান্ত কণ্ঠে বলে,—আপনার যেটা পছন্দ হয়। বেশি তো লিখতে পারি না।

আমি বেছে নিলাম 'চারাগাছ'। গদ্য কবিতা, কিন্তু একটি অসাধারণ বলিষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি। নিপীড়িতদের চিরকালীন ক্ষুব্ধ অনুভূতির আত্মপ্রকাশ এই চারাগাছের ছত্রে ছত্রে। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :—

ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি :
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে,
সে প্রাসাদ কী দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায় :
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি
ঐ অট্টালিকার প্রতি ইটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের রক্তের আর চোখের জলের।

বসুমতীতে প্রকাশিত এই কবিতাটি সুকান্তর 'ছাড়পত্র' গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে।

কথায় কথায় বললাম,—এবার পূজায় কোথায় কোথায় লিখবে?

সলজ্জায় মাথা নামালো সুকান্ত। নম্রস্বরে বললে,—শারদীয়া আজকাল, স্বাধীনতা, পরিচয়, রংমশাল আর শারদীয়া বসুমতীতে যদি আপনি—

কথা শেষ করে না সুকান্ত। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দেয় আমাকে। একজন বর্ষীয়সী মহিলা, সস্নেহে বললেন,—বৃষ্টি-জল ভেঙে এসেছো, একটু চা খাও বাছা।

সুকান্ত বললে,—ইনি লেখিকা সরলা বসু। কবি অরুণাচলের মা। মা, যেন সর্বকালের তিনি। এঁর কিছু কিছু লেখা পরে বসুমতীতে ছাপা হয়েছে। তিনি আবার বললেন,—শুধু চা খেও না মিষ্টিমুখ করো একটু।

রেকাবীতে দুটি সন্দেশ। একটি নিজে খেলাম। অন্যটি সুকান্তর হাতে ধরিয়ে

দিলাম। সে কী লজ্জা তার। প্রচুর হাসলো সে। নিষ্পাপ সরল হাসি। একটা সন্দেশ খাবে, তাও কত সঙ্কোচ।

—কবে যাবে তুমি ?

চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলে প্রশ্ন করলাম।

সুকান্ত বললে,—আপনি বলুন কবে যাবো।

বললাম,—হেমেন্দ্রকুমার রায় তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।

আনন্দের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ফুটল সুকান্তর, বুদ্ধিদীপ্ত মুখে বললে,—

শিশু-সাহিত্যের দিক্‌পাল উনি। ওঁর অনেক লেখা আমি পড়েছি। ভীষণ ভাল লাগে। আলাপ হ'লে সুখী হবো।

—একটা ডেট দাও, হেমেনদাকে খবর দেবো। তিনি আসবেন বসুমতীতে।

—সামনের সোমবারে যদি যাই ?

—অসুবিধা হবে না। হেমেনদা বলতে গেলে প্রায় প্রত্যহই আসেন।

সুকান্ত বললে,—শুনেছি উনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর খুব বন্ধু।

বললাম,—হ্যাঁ, এক গেলাসের বন্ধু যাকে বলে।

ভাগ্য ভাল যে সরলা দেবী তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

আবার হাসল সুকান্ত। বিরাট একটা রসিকতা শুনেছে সে যেন। হাসি থামিয়ে সুকান্ত বললে,—শিশিরকুমাব একজন দুর্লভ প্রতিভা। বাংলাদেশের গৌরব। আসল নাটক দেখা যায় তাঁর অভিনয়ে।

'চারাগাছ' পকেটে রেখে বললাম,—তা হলে সুকান্ত, ঐ কথা রইল। সামনের সোমবারে তুমি আসছো।

—হেমেন্দ্রকুমার কখন আসবেন ?

—উনি সাধারণত দুপুরের দিকেই আসেন।

—আমিও যাবো ঐ সময়ে।

তক্তাপোশ ছেড়ে উঠতেই সুকান্ত অতি অন্তরঙ্গ সুরে বললে— সুকুমারদা ভাল আছেন? (সাংবাদিক সুকুমার মিত্র)।

—হ্যাঁ।

—বিমলদা ভাল আছেন? তাঁকে বলবেন আমার কথা। (কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ)।

—হ্যাঁ।

—বিনয়দা ভাল আছেন? (সাহিত্যিক সাংবাদিক বিনয় ঘোষ)।

—হ্যাঁ, সবাই ভাল আছেন। শুধু তুমিই ভাল নেই।

আবার নিঃশব্দ হাসি। হাসতে হাসতে বলে,—মাঝে মাঝে ভাল থাকি।

এখানে উল্লেখ্য, উল্লিখিত তিনজনেই তখন বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করছেন।

আগেই বলেছি অবরে-সবরে সুকান্তর আবির্ভাব হ'ত পত্রিকার কার্যালয়ে। লেখা দিতে আসতো, লেখার সম্মানদক্ষিণা নিতে আসতো। লক্ষ্য করেছি, উপস্থিত সকল খ্যাতিমান সাহিত্যিকরা মুগ্ধচোখে দেখতেন সুকান্তকে। যেন এক দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ। বয়স স্বল্প, লেখেও অল্প, তবু বয়স্কদের কাছে সে স্বীকৃত বরেণ্য।

সেদিনও সে এসেছিল মধ্যাহ্নবেলায়। সঙ্গে কে ছিল আজ মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে কবি অরুণাচল বসু।

ঘরে আরও অনেকে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন সজনীকান্ত দাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী। হাসি আর আড্ডার তুফান বইছে ঘরে।

একখানি চেয়ার দখল ক'রে বসে পড়ল সুকান্ত। যেন কত শ্রান্ত-ক্লান্ত। মুখখানি একটু বিমর্ষ।

—লেখা এনেছো কিছু?

বললাম সম্পাদকীয় কর্তব্যে।

এপাশে-ওপাশে মাথা দোলালো সুকান্ত। মুখে সেই অমলিন হাসি মাখিয়ে ধীরকণ্ঠে বললে,—না, দেখা করতে এসেছি। যাদবপুরে টি বি হাসপাতালে বেড পেয়ে গেছি একটা। আসছে সপ্তাহে ভর্তি হবো। এখন থেকে চিঠি, পত্রিকা, টাকাকড়ি সবই ওখানে পাঠাবেন। ভর্তি হয়ে চিঠি দেবো বেড নম্বর জানিয়ে।

সাহিত্যিক রসালাপ চলছিল। হঠাৎ যেন করুণরসের রাগিণী বেজে উঠল সুকান্তর কথায়।

বললাম,—কতদিন থাকতে হবে? ডাক্তার কী বলছেন?

আর কোনো জবাব নেই সুকান্তর মুখে। সে যেন মূক। নির্বাক। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। সকলেই স্তব্ধবাক্। কবি অরুণাচল বসু খানিক বাদে বললেন,—চল সুকান্ত, আজ ওঠা যাক।

উঠে পড়ল সুকান্ত। অরুণাচল চুপি চুপি আমাকে বললেন,—ও শুনতে পায় নি আপনার কথা। জানেন তো সুকান্ত ইদানীং আর কানে শুনতে পায় না। জবাব মিলল না সুকান্তর। কিছুকাল পরে জবাব এল এক চিঠিতে। লিখলে, 'ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন।'

তারপর আর হাসপাতাল থেকে ফিরল না চিরকিশোর সুকান্ত। কোথায় যে গেল কে জানে!

আজও মধ্যে মধ্যে সুকান্তর লেখা চিঠিগুলি পরশমণির মতো নাড়াচাড়া করি। বুঝতে পারি, কখনও কখনও চোখের জল কোনো বাঁধ মানে না।

একমাত্র সান্ত্বনা, সুকান্ত বাংলা সাহিত্যে তার নিজেরই প্রতিভার কৃতিত্বে স্থায়ী আসন অধিকার করেছে। এবং সে আসন অনড়, অটল, অক্ষয়, অব্যয়।

সুকান্ত-মানস ॥ অনিলেন্দু ভট্টাচার্য

সুকান্ত ভট্টাচার্য ইতিহাস। মাত্র একুশ বছর বয়সেই বাঙলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে। তাঁর আকস্মিক তিরোভাব আমাদের যেমন ব্যথিত করে, তেমনি স্বল্পসংখ্যক কাব্য গ্রন্থের ভিতর দিয়ে যে নবতর পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন, তা আজও আমাদের আদর্শস্বরূপ; তাঁর কাব্যপ্রতিভার অম্লানশিখার ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চেতনার গভীর প্রদেশ আলোকিত। তাই সুকান্ত ভট্টাচার্য শুধুমাত্র ইতিহাস নয়, তিনি নিয়তই ইতিহাস সৃষ্টি ক'রে চলেছেন।

সুকান্তকে নস্যাৎ করবার বহু প্রকার পরিকল্পিত চেষ্টা চলেছিল এবং আজও চলেছে। আবার ভক্তির আতিশয্যে (যা সুকান্ত-মানসবিরুদ্ধ) কেউ কেউ সুকান্তকে অতি মানবিকতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে তার বিপ্লবীসত্তার সঠিক মূল্যায়নকে কুয়াশাচ্ছন্ন করেছে। ফলে সুকান্তর কাব্যধারা যে অনুসরণযোগ্য (অনুকরণ নয়), তা আমরা ভুলতে বসেছি। তবুও সুকান্তকে যে আমাদের হৃদয় থেকে নির্বাসিত করা যায় নি, তার কারণ তাঁর কাব্যসত্তার অন্তর্নিহিত মৌলিক চারিত্র্য লক্ষণ অপর পক্ষে সেই সব ডলারের অনুগ্রহপুষ্ট সমালোচকবৃন্দও অক্ষম অনুকরণকারীদের জনগণ ক্রমাগত আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করছেন।

২

কাব্যবিশিষ্ট জীবনধারা ও যুগমানসের এক জটিল প্রতিফলন। তাই সুকান্ত কাব্যের অন্তর্নিহিত নবীনত্বের পরিচয় পেতে হলে তৎকালীন যুগ-মানসিকতার মৌল লক্ষণগুলি আমাদের জানা দরকার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীজাত মানবিকতা, নীতিবোধ ও সৌন্দর্য অনুভূতি প্রথম মহাযুদ্ধের সুতীব্র নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কবিকুল আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। পুরোনো প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে তারা আস্থা হারালেন। এই অবস্থা আরও মর্মভেদী হয়ে উঠল ১৯২৯-৩০ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে। যার ফলে ভারতীয় অর্থনীতি প্রচণ্ড ঘা খেল। বেকারসংখ্যা হুহু ক'রে বেড়ে চলল। দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগতি হল—দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্যকে নতুনভাবে ভাগ ক'রে নেবার জন্য আরেকটি মহাযুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসীবাদে রূপান্তরিত হল। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কাছে আর আশা করবার কিছুই রইল না। ভারতীয় আন্দোলনগুলির মধ্যেও দেখা দিল মত ও পথের বিভিন্নতা। গান্ধীবাদ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ পেল, তরুণ সমাজের মধ্যে দেখা দিল সন্ত্রাসবাদ। এই বিপুল ঘূর্ণিজালে পড়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনন সুতীব্র নৈরাশ্যে ও নৈরাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণার অন্ধকূপে নিমজ্জিত হল। অন্যদিকে পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক আবিষ্কারসমূহও বুদ্ধিজীবী মননে আরও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। তারা হতাশ্বাসকে জীবনের মূলধন করলেন।

ঠিক অন্যদিকে, এই গলিত অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় দেখা গেল। সোভিয়েটের জন্ম ও অগ্রগতি এই নতুন শক্তির প্রকাশ। ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীও এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ক্রমশ নিজেকে সংহত করতে লাগল। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য এদেশের শ্রমিকশ্রেণীকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা জনগণের মধ্যেও সাম্যবাদী আদর্শ সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করল। জনগণ নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে উঠে সক্রিয় গণআন্দোলনে আবার পূর্বের তুলনায় আরও গভীরভাবে নিজেকে উৎসর্গ করল। নতুন বিপ্লবী মতাদর্শ জনগণকে নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে উৎসাহিত করে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ক্ষেত্রে যখন এই ভাঙা-গড়ার সুতীব্র দোলা চলেছে, সুকান্ত ভট্টাচার্যের আত্মপ্রকাশ ঠিক সেই সময়েই। জীবনের জটিলতাই মানুষকে

অভিজ্ঞ ক'রে তোলে। তাই অতি অল্প বয়সেই যে সুকান্ত পরিণত মননের অধিকারী হয়েছিলেন, তা বিরল হলেও আশ্চর্যের নয়।

৩

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যচর্চার প্রথম দিকে হতাশাক্লিষ্ট, অত্যাচারিত মানবাত্মার প্রতিকারহীন ক্রন্দনধ্বনিই প্রতিফলিত হয়েছে। তখনও সহানুভূতিসম্পন্ন কবিমন প্রতিকারের কোনো পথ খুঁজে পায় নি—যে পথ অন্যায় অত্যাচার, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানবের মুক্তির পথ খুলে দিতে পারে। বেদনাদীর্ণ নিষ্ক্রিয় রোমান্টিক মনোভাব এই সময়কার কাব্যচর্চার পেছনে ক্রিয়াশীল। নতুনতর পথের সন্ধানী কবি অবশেষে পথের সন্ধান পেলেন, তিনি বুঝতে পারলেন, অসাম্যই সমাজকে শ্রেণীবিভক্ত করেছে; শোষণের পথ সুগম করেছে। তিনি নিরাশাকে দ্রুত কাটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন এবং সফল হলেন। তাঁর কবিসত্তা নিষ্ক্রিয় রোমান্টিকতা থেকে সক্রিয় বিপ্লবী কবিসত্তায় উত্তীর্ণ হল। তাঁর এই সংগ্রামী কবিমন সমস্ত অমানবিক নিষ্ঠুর শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল। তিনি জনগণের অংশভাক্ সাথী হিসেবে আহ্বান জানালেন শোষণের অবসান ঘটাতে এবং নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে। সক্রিয় রোমান্টিকতার ধর্ম নেতিমূলক নয়—তা ইতিবাচক; তা নতুন সৃষ্টির জন্যই পুরোনোর অবসান চায়। মানসিকতার এই নবউত্তরণে নিয়ামক ভূমিকাগ্রহণ করল সাম্যবাদী আদর্শ এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। পুরোনো দুর্বল দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে দেখা দিল নতুন বলিষ্ঠ প্রলেতারিয়েত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

৪

নিষ্ক্রিয় রোমান্টিক মনোভাব থেকে সক্রিয় মনোভাবে যখন সুকান্ত-মানস প্রতিষ্ঠিত এবং দ্রুত বিকাশের পূর্বেই সুকান্তের অকাল প্রয়াণ। এই বেদনা কোনোদিনই যাবার নয়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সঠিক বলেছিলেন, "জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্ত যখন কবিতার বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানায় খেতখামারে ঘরে ঘরে সবে পৌঁছে দিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।"

অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, নিজেকে সেই অত্যাচারিত মানবের অংশভাক্ সাথী মনে করে এবং অসাম্যের ও অত্যাচারের মূলোচ্ছেদে নিজেকে

নিয়োজিত করে। 'ছাড়পত্র' এবং 'ঘুম নেই' কাব্য গ্রন্থদ্বয় এই মৌল বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন ক'রে রয়েছে।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই বিপ্লবী রোমান্টিক মনোভাবই তাঁকে কালজয়ী করেছে; দুরন্ত শমনও তাকে পরাজিত করতে পারে নি, সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহীরা তো দূরের কথা।

দিনবদলের কবি ॥ ভবানী মুখোপাধ্যায়

মাত্র কয়েকটি বছর—

অঙ্ক কষে দেখলে টেনেটুনে মাত্র একুশ বছর। এই একুশ বছর থেকে আবার বছর দশেক বাদ যাবে। কারণ বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে প্রায় দশ বছরই লাগে। তাহলে বাকী রইল এগার বছর, এই এগার বছরের মধ্যে এক আশ্চর্য মানসিক পরিণতিলাভ করেছিলেন এযুগের স্মরণীয় বাঙালী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। মাত্র একুশ বছরের পরমায়ু হাতে নিয়ে এক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধকালে সুকান্ত এসেছিল এই বাংলায়। আর যে বাংলাদেশের মাটিতে অজস্র কবি, সেই দেশে এত অল্পকালের মধ্যে হৃদয়-মন অধিকার বড় কম কথা নয়।

বাংলার পাঠকসমাজ স্বভাবকৃপণ। প্রশংসা ও প্রশস্তি মেলে মৃত্যুর পর, সেই দেশে কিশোর বয়সেই সুকান্ত জনচিত্ত জয় করেছিলেন—এই ঘটনা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে আমরা যথোচিত স্বীকৃতিদানের আগেই তিনি অন্যলোকে সরে গেছেন। হাততালির লোভে আর মঞ্চে ফিরে আসেন নি।

ছাড়পত্র নিয়ে তিনি এক নতুন বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই পৃথিবীর আকৃতিতে রূপান্তর ঘটতে শুরু হয়েছে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে কবি করাঘাত হেনেছেন বিশ্বের দ্বারে। খর্বদেহ, নিঃসহায় তবু তার সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতে ছিল অমিতশক্তি, কণ্ঠে সুতীব্র হুংকার। ঘৃণা নয়, বিদ্বেষ নয়, নিন্দা নয়, কুৎসা নয়, সুকান্ত তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেছেন অতিশয় মার্জিত ভঙ্গীতে, বলিষ্ঠ ভাষায়।

এক প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি এসেছিলেন। এক যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব। স্বদেশে দুর্ভিক্ষ আর হাহাকার, আকাশে সাইরেনের ধ্বনি যখন তখন-আতংক সৃষ্টি করে। সারা বিশ্বে আগুন জলছে। পৃথিবী এক রূপান্তরের পথে নতুন

পৃথিবীর জন্মলগ্নের প্রসববেদনায় একটা কাতর গোঁড়ানিতে চারদিক থম্‌থম্ করছে, সেই মুহূর্তে আবির্ভাব ঘটল এই নতুন কবির। খর্বকায় নিঃসহায় বটে কিন্তু শিকড়ে ছিল অরণ্যের বিশাল চেতনা। সুকান্তের কাব্যসত্তার পাঠ করলে এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কি বিপুল সম্ভাবনা ছিল তাঁর মধ্যে। শিশুর মধ্যে এক বৃদ্ধ মহীরুহ।

সুকান্তের কবিতার মধ্যে বৈচিত্র্য অনেক। চমক দেওয়ার চেষ্টা ছিল না, ছিল না শব্দাড়ম্বর, তাঁর কবিতা অগ্নিগর্ভ। ঠিক যে প্রচারধর্মী বা জনমতের পৃষ্ঠপোষকতার মুখ চেয়ে লেখা তাও নয়। সুকান্তর কবিতার মধ্যে এক আশ্চর্য কাব্যাদর্শের সন্ধান পওয়া যায়। নজরুল একদিন যে ভাবে কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, জন সমর্থনে তাঁর কাব্য প্রতিষ্ঠা সহজ হয়েছিল। সুকান্ত কিন্তু ব্যতিক্রম। তিনি চমক জাগানো কথা ব্যবহার করেন নি, কবিতার কোনো-ক্ষতি না ক'রেও কথ্যছন্দের ধ্বনি-মাধুর্যের সাহায্য নিয়ে সুকান্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে যে ভাবে কাব্যরচনা করেছেন তার নিদর্শন বাংলা ভাষায় বেশী নেই। তাঁকে পাঠকগণের কাছে পরিচিত হতে কোনো কসরত করতে হয় নি। রুশদেশে মায়কোভস্‌কীয় কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অতি সহজেই সুকান্তর দ্রুত কাব্য প্রতিষ্ঠার হেতু বুঝবেন। মায়কোভস্‌কী যেমন অতি সহজে অল্পকথায় নিজস্ব বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সুকান্তও তেমনিই অনায়াসে পাঠকের সামনে তাঁর কথা বল্‌তে পেরেছেন। সহজ ভঙ্গীতে হালকা চালে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনিয়েছেন। পাঠকের করতালির মুখ চেয়ে নয়, নিছক প্রাণের আবেগ, অন্তরের তাগিদে এইস্থানে আরেকটি কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, সুকান্ত হয়তো সজ্ঞানে বা অবচেতন সত্তায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' বা অন্য কবিতা পড়ে প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। তবে সেই প্রভাব আর কোথাও নয়। মৌলিকত্বে সুকান্ত অদ্বিতীয়, মৌলিক চিন্তায় তুলনাহীন। তা নইলে যে প্রাসাদে রাশি রাশি খাবার সেই প্রাসাদে খাবার হয়ে একদিন প্রবেশ করার মতো কথা তাঁর মনে জাগতো না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাল্‌কা চাল এবং কথ্যছন্দের প্রতিধ্বনি যেন সুকান্তের প্রথম দিকের কিছু কিছু কবিতায় পাওয়া যায়।

সুকান্ত পার্টিকে ভালোবাসতেন প্রাণ মন দিয়ে, তাই পার্টির মুখ চেয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন এই কথা শোনা যায়, কিন্তু পার্টির মুখ চেয়ে লিখলেও সুকান্তর কবিতা পার্টির প্রচারপত্র নয়। সিঁড়ি বা কলম নামক কবিতা দুটির মধ্যে যে

বক্তব্য আছে তা কি শুধু পার্টির বক্তব্য। সর্বকালের শোষিত বঞ্চিত মানুষের হাহাকার নয়? ১৯৪০ আর ১৯৪৬-এ লেখা দুটি কবিতা 'অনুভব' প্রথমটির প্রথম লাইন 'অবাক পৃথিবী' এবং দ্বিতীয়টির প্রথম লাইন 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে—' এই দুটি কবিতায় কেউ প্রচারধর্মিতার পরিচয় পেয়েছেন? কিন্তু এই ১৯৭০-এ পৌঁছেও এই দুটি কবিতা গায়কের কণ্ঠে যখন গীত হয় তখন কি শরীরে শিহরণ জাগে না? সুকান্তকে তাই প্রচারমুখী কবি বলে যাঁরা এড়িয়ে যান তাঁদের রসজ্ঞান পক্ষপাতহীন নয় এই কথাই মনে হয়।

'আমি একটি দেশলাই কাঠি' কিংবা 'প্রার্থী' নামক কবিতা দুটি কি সকল সমাজের মানুষের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে না? এইভাবে 'রানার', 'বোধন' প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে যে বক্তব্য ফুটে উঠেছে সুকান্ত-পূর্ব কবিদের মধ্যে তা অনুপস্থিত। যে কবিতাটিতে সুকান্ত লিখেছেন 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' সেই 'হে মহাজীবন' কবিতাটির মধ্যে যুগযন্ত্রণা কি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে নি? যুগ সচেতন কবি সুকান্ত একুশ বছর বয়সেই বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ মুখর যুগান্তরের অশান্ত কলরোল শুনেছিলেন, তাই তাঁর কাব্যে যে সুর প্রধান হয়ে উঠেছে সেই সুর পালা-বদলের নয়, দিন বদলের পালার সুর।

ব্যক্তি সুকান্তকে অল্পই দেখেছিলাম, মাত্র তিন দিন। এর মধ্যে দুটি দিনের সঙ্গী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অবমতারণ অজাতশত্রু সেবক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথমদিন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পবিত্রদা ভবানী দত্ত লেনের কিশোর বাহিনী অফিসে। দ্বিতীয়বার দেখা বন্ধুবর স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের ঘরে। তখনই শরীরে মৃত্যুর পদধ্বনি এসে পৌঁছেছে, আর শেষবার এবং সর্বশেষ দেখা মৃত্যুর পূর্ব দিন যাদবপুর হাসপাতালে…পবিত্রদা সেদিনটিতেও আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন খারাপ সংবাদ পেয়ে। দেখা হল, সেদিন আর কথা হল না, আর তারপর দিনই এল সেই সর্বনাশা সংবাদ। সুকান্ত বলেছেন—

> "অবশেষে সব কাজ সেরে
> আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
> করে যাব আশীর্বাদ,
>
> তারপর হব ইতিহাস।"

সুকান্ত আজ ইতিহাস, বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস, তাই স্মরণীয়।

একটি দুর্যোগময় সন্ধ্যা ॥ বিমল ভট্টাচার্য

সুকান্ত আমার সেজদিদির মেজ ছেলে। সম্পর্কে আমি তার ছোট মামা। কিন্তু যে হেতু আমি ওর চেয়ে মাত্র বছর খানেকের বড় তাই ওর মুখে মামা ডাক আমার শোনার সৌভাগ্য হয় নি। অবশ্য সেজন্যে আমি আদৌ দুঃখিত নই। ও ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয়জন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওর জন্ম হয় আমাদের ৪২ মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়িতে। খুব ছেলেবেলা থেকেই আমাদের দুজনের বন্ধুর মতো মেলামেশা ছিল। ওর অকাল মৃত্যু আমার মনে আঘাত দিয়েছে গভীরভাবে। ছেলেবেলায় আমার জীবনে যে কটি উজ্জ্বল স্মরণীয় দিন এসেছিল, যাদের কথা অপরকে বলার মতো, তার প্রত্যেকটি দিনের সঙ্গে জড়িত ছিল সুকান্ত। ওর সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করতে গেলে এত কথা একসঙ্গে আমার মনে ভিড় ক'রে আসে যে তাদের গুছিয়ে লিখতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলি। ওকে চিন্তা করলে আমি আবার আমার কৈশোরের সজীবতা ফিরে পাই, ফিরে পাই আমার ফেলে আসা দিনগুলিকে। ওর কবিতা পড়লে অনেক হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি আমাকে উদ্বেল ক'রে তোলে। ওর মৃত্যুতে আমি শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম অন্ধকার নির্জন গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায় দু'যুগ আগে। এখনও সে কান্নার রেশ আমার অন্তরে প্রবহমান।

সুকান্তর কথা ভাবলে আমার মন বৃষ্টিভেজা সরস মাটির মতো নমনীয় হয়ে ওঠে। তখন অনেক মূল্যবান জিনিসকে তুচ্ছ বলে মনে হয়, মিথ্যে মনে হয় জীবন ধারণের গ্লানি। বৃষ্টির দিনে যখন ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যায় তখন হেঁটে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে হয় সুকান্তর কথা। ওর সেই পদব্রজে সারা কলকাতা পরিক্রমার কথা মনে পড়ে কারণ এ ধরনের পথচলায় তার সঙ্গী হয়েছি বহুবার। পথ চলার কষ্ট তখন ভুলে যাই।

নিজের জন্যে সুকান্ত কারো কাছে কোনোদিন কিছু চায় নি। কিন্তু আশ্চর্য! আমাদের জন্যে ওর চিন্তার শেষ ছিল না। নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সুকান্ত যখন আমার চুলে একটু বেশী তেল দেখে তিরস্কার করত তখন অবাক হতাম। আমার চুল আঁচড়ানো ওর পছন্দ হত না বলে একদিন নিজের হাতে চুল আঁচড়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কেমন ক'রে চুল আঁচড়ানো দরকার। ও ছিল

আমার এবং আমার আরেক ভাগ্নে ভূপেনের বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে শোধরাবার জন্যে সুকান্ত সব সময়েই সচেষ্ট থাকত। সুকান্ত বালক বয়সেই সাবালক হয়ে উঠেছিল। এ সমস্ত দিক দিয়ে এত দ্রুত পূর্ণতা লাভ করছিল যে আমরা ওর নাগাল পেতাম না। ওর বহু কথার অর্থ বুঝতে বেশ সময় লাগত। বয়সে ছোট কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ সুকান্তকে আমরা সমীহ ক'রে চলতাম। এটা যেমন সত্য তেমনি ওর সাহচর্য আমাদের মনে পুলক সৃষ্টি করত তাতে কোনো ভুল নেই।

সুকান্তর জীবদ্দশায় আমাদের পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানগুলোর কথা মনে পড়ে মনে পড়ে সুকান্তর চোখের সেই ঝিলিক যার মধ্যে থেকে ঠিকরে পড়ত হাসি আর কৌতুকের ছটা। ওর বুদ্ধিদীপ্ত হাস্য-পরিহাস সমস্ত আবহাওয়াকে চকিতে পরিবর্তিত ক'রে দিত। আমরা যেন এরই জন্যে দিন গুণতাম।

একবার মাত্র ওর মধ্যে এই হাস্য-পরিহাসের অভাব দেখেছিলাম। সেদিনকার কথা আমার বেশ পরিষ্কার মনে আছে। আমরা তখন ২৫/এ; হাজরা লেনের বাড়ি চলে এসেছি মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে। এ বাড়ির ছাদের ওপর চিলেকোঠার ঘরটা আমার খুব প্রিয় ছিল। এখানে অনেক উজ্জ্বল প্রভাত, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর আর অনেক বিষণ্ণ সন্ধ্যা একা একা কাটিয়ে দিয়েছি। সেদিন আকাশের অবস্থা ভাল নয় দেখে বাড়ি থেকে বেরোই নি। এই ঘরেই বসে কি একখানা বই পড়ছিলাম। হঠাৎ সুকান্ত এসে হাজির হল। আমি অত্যন্ত খুশী হয়ে ওকে পাশে বসালাম। তারপর দুজনে কথাবার্তা গল্পগুজব শুরু করলাম বটে কিন্তু কী জানি কী কারণে তেমন যেন জমছিল না। সুকান্ত সে সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকত। নিছক গল্পগুজব করবার জন্যে ও সময় নষ্ট করত না। ওর হঠাৎ আসায় যেমন খুশী হয়েছিলাম তেমনি অবাকও হলাম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কেমন অস্বস্তি বোধ করলাম। মেঘে ঢাকা আকাশের মতো সুকান্তর মুখও কেমন যেন থমথম করছিল। একটু পরেই গাছপালা কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে দারুণ ঝড় উঠল। সুকান্ত ঝড়ের আঘাতে বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত একটা শিমুল গাছের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইল। ঝড়ের বেগ ক্রমশ বাড়তে লাগিল। তারপর ঝড়ের তাণ্ডবের সঙ্গে শুরু হল প্রবল বর্ষণ। সুকান্ত হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, মানুষ শুধু এক তরফা ভালবেসে কি তৃপ্তি পেতে পারে।" আমি বললাম, "সবাই হয়তো পায় না কিন্তু এমন কিছু লোকও নিশ্চয়ই আছে যারা এক তরফা প্রেমে সুখী।" কথাগুলো বিজ্ঞের মতো বলছিলাম

বটে কিন্তু এটাও মনে মনে বুঝছিলাম যে এ আলোচনা বেশীক্ষণ চালাবার মতো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আমার নেই। সুকান্ত জানতে চাইল "যে আমার মনে প্রেমের সৃষ্টি করল তার মনের গভীরে কি আছে তা জানার ইচ্ছা কি অস্বাভাবিক?" ওর কথা বলার ভঙ্গীতে আমি রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ওর মধ্যে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে। এ যেন আমার এতকালের দেখা সুকান্ত নয়, অন্য মানুষ। আমি সুকান্তর একটা হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, "সত্যি ক'রে বলত ব্যাপারটা কি?" সুকান্ত ওর হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে ধরা গলায় বলল, "তোর মতো শ্রোতা খুব কম আছে। আজকে তোকে একটা ঘটনার কথা বলতে চাই।" বাইরে তখন ঝড়বৃষ্টি আর বিদ্যুতের বিরাট আয়োজন। বৃষ্টি আর মেঘগর্জনে কান পাতা দায়। বাইরে প্রকৃতির এই তাণ্ডব কবির মনেও এনেছে বিরাট পরিবর্তন। সুকান্ত ধীরে ধীরে যা বলল তা মোটামুটি এইরকম।

ছেলেবেলা থেকে ও একটি মেয়ের সংস্পর্শে আসে। একরকম খেলার সাথীই বলা যায়। নিষ্পাপ দুটি শিশু একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে। আগে ওকে দেখলে সুকান্ত এক এক সময় বিরক্ত হত, ছেলেবেলায় দুয়েকটা চড়-চাপড়ও দিয়েছে হয়তো। কিন্তু আস্তে আস্তে ওর চোখের সামনে মেয়েটি বেড়ে উঠতে লাগল, একটা ফুলের কলি যেমন ক'রে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তারপর সুকান্ত একদিন অকস্মাৎ আবিষ্কার করল তার প্রতি ওর গভীর প্রেমকে। আনন্দ বেদনায় মেশা সে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি।

মেয়েটির মনের কথা জানবার জন্যে এরপরে সে দারুণ আগ্রহী হয়ে উঠেছে কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেমন ক'রে তা জানা সম্ভব। ঘটনাটা বিবৃত করার পর সুকান্ত আমার দিকে ভাববিহ্বল দৃষ্টি মেলে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, "কি করা যায় বলত?" ঝড়ের বেগ তখন কমে এসেছে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে অঝোর ধারায়। আমি প্রশ্ন করলাম, "মেয়েটা কে তা তো বললি না।" মেয়েটির নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম। তাকে খুব ভাল ক'রেই চিনি। সুকান্তর পছন্দকে তারিফ না ক'রে পারলাম না। কে একজন বলেছিল স্ত্রীলোক যদি বুদ্ধিমতী না হয় তাহলে তার সমস্ত সৌন্দর্যই ব্যর্থ। সুকান্তর প্রেমিকা শুধু সুন্দরী তাই নয়, তার মধ্যে এমন একটা সংযত রুচিস্নিগ্ধ বুদ্ধির দীপ্তি আছে যা সুকান্তর শিল্পীমনকে আকৃষ্ট করবে এটাই স্বাভাবিক।

আমি সব কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সুকান্ত যে নিদারুণ মানসিক

যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে বললাম, "তুই ওকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে পারিস তো। ওর সঙ্গে তোর মেলামেশা এত স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে যে সংকোচের কোনো কারণই নেই।" সুকান্ত বলল, "ওরে বাপ্‌রে। তা আমি পারব না।" তখন আমি বললাম, "এক কাজ কর, একটা চিঠি লিখে ওর মনের কথা জেনে নে। অনর্থক এই সংশয়ের দোলায় দুলে লাভ কি?" সুকান্ত বলল, "তুই বলছিস চিঠি লিখতে?" আমি সভয়ে বললাম, "না না, আমি কিছুই বলছি না। শুধু তোকে চিন্তা ক'রে দেখতে বলছি, লিখ্‌লে কেমন হয়।" সুকান্তকে পরামর্শ দেবার মতো ধৃষ্টতা আমার কোনোদিন হয় নি। আমাদের বহু সমস্যার সমাধান ও ক'রে দিয়েছে বহুবার। আসলে সুকান্ত আমার কাছে সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত ক'রে হয়তো তার মনের ভাব কিছুটা লাঘব করতে চেয়েছিল।

ওর মুখের সেই বিষণ্ণ থমথমে ভাব আর কখনও আমার চোখে পড়ে নি। কিছুদিন পরে ওর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে সুকান্ত সাহস সঞ্চয় ক'রে মেয়েটিকে চিঠি দিয়েছিল। সে চিঠির উত্তর এসেছিল কিছুটা, ভর্ৎসনা আর নিদারুণ বিস্ময় বহন ক'রে। মেয়েটি ওকে খুবই ভালবাসে এই স্বীকৃতির সঙ্গে জানানো হয়েছিল ভাইকে বোনেরা যেমন ভালবাসে এ তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

এ চিঠি পাবার কিছুদিন পরে সুকান্তকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোর মনের অবস্থা এখন কি রকম?" সুকান্ত স্বাভাবিক পরিহাস তরল কণ্ঠে বলেছিল, "মনের ব্যাকুলতাকে আমি এখন আর বেশী মাথাচাড়া দিতে দিই না। এখন আমি যন্ত্রের মতো শুধু কাজ ক'রে যাই উদয়াস্ত।"

আমি ভাবতাম সুকান্ত এত খাটত কেন? এত হাঁটতই বা কেন? মনের সব বেদনা কামনাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে কাজই কি একমাত্র আশ্রয়? কাজের মধ্যে থাকলে মানুষ মনের অস্থিরতার তোয়াক্কা করে না। সুকান্তর দারুণ পরিশ্রম করার পেছনে কি এই বাসনাটাই কাজ ক'রে যাচ্ছিল।

মাঝে মাঝে আজও ভাবি সেদিনের সেই দুর্যোগভরা সন্ধ্যার কথা, ভাবি প্রকৃতির সেই অস্থির উদ্দমতার কথা। প্রথমে উঠেছিল ঝড় ধুলো উড়িয়ে গাছপালা কাঁপিয়ে এক প্রকাণ্ড আলোড়ন তুলে। তারপর শুরু হল বৃষ্টি আর বিদ্যুতের মাতামাতি। মনে মনে ভাবি এই দুর্যোগময় পরিবেশই কি কবিকে প্রভাবিত করেছিল তার হৃদয় দুয়ার উন্মোচন করতে?

সুকান্ত ।। রাখালদাস চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ—নজরুল—সুকান্ত। বাংলার কাব্যসাহিত্যের একটি সুপরিচ্ছন্ন সুনিয়মিত ধারাবাহিকতা। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ যেন ভগীরথ—সুউন্নত আত্মসমাহিত সংস্কৃত-শিবের শিরোপরি জটা-জলের বন্ধন থেকে কাব্য-মন্দাকিনীকে নিজের সাধনার বলে মুক্ত করলেন; নজরুলের কাব্যে সেই মন্দাকিনী গিরিবক্ষের উপলভঙ্গে উদ্দাম বেগে বয়ে চলল, আর মন্দাকিনী গঙ্গা হয়ে সুকান্তের কাব্যে গাঙ্গেয় উপত্যকার সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

কথাটা আরও পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে বলতে হয়—প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে বাংলার কাব্যসাহিত্যের ভিত্তি ছিল রোমান্টিকতা। সংস্কৃত সাহিত্যের রোমান্টিক চিন্তাধারায় তখনকার দিনের বাংলা কাব্যসাহিত্য প্রভাবিত ছিল। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগেই ভারতের রাজনৈতিক জগতে স্বাদেশিকতার চিন্তাধারা আবির্ভূত হয়। বাংলার সাহিত্যিকরাও স্বভাবতই এই চিন্তাধারায় আপ্লুত হন। বাংলার শিক্ষিতসমাজ তখন ইউরোপের সাহিত্য রাজনীতি—সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে চলেছেন। সেই পরিচিতিই ধীরে ধীরে এই:দেশে স্বাদেশিকতার চিন্তাধারার জন্ম দিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যায় এই চিন্তাধারা রোমান্টিকতায় মণ্ডিত। তার প্রভাব সাহিত্যেও প্রতিফলিত হল। আর তাই তখনকার বাংলা কাব্য-রোমান্টিক প্রধান। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখ বাংলা-সাহিত্যের দিক্‌পালদের সাহিত্যে এই রোমান্টিকতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত।

এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সাহিত্যেও এই রমান্টিকতা ছিল। মধ্যজীবনে রোমান্টিকতার সঙ্গে এসে মিশল মিষ্টিসিজম—রহস্যময়তা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না; পৃথিবীর অগ্রগমনের সঙ্গে সভ্যতাও এগিয়ে চলল, আর সেই সঙ্গে চলল রাজনৈতিক ও অর্থনীতির রূপান্তর। দেশে দেশে সেই রূপান্তর প্রতিফলিত হতে লাগল। মানুষের চিন্তাধারাতেও তার আঘাত এসে লাগল। রবীন্দ্রনাথও তার থেকে সরে থাকতে পারলেন না। বিশেষ ক'রে রাশিয়া ভ্রমণ করার পর থেকেই তাঁর চিন্তাধারা থেকে, এবং তার ফলশ্রুতিকে তাঁর সাহিত্য থেকে রোমান্টিকতা ও মিষ্টিসিজমের ধোঁয়াশা পর্দা টুটে যেতে লাগল—বাস্তবতার ওপর পদসঞ্চার করল

রবীন্দ্রকাব্য। কবির এই বাস্তবোপলব্ধি আরও দৃঢ়ভিত্তিক হল, কবি সচেতনতায় উত্তীর্ণ হলেন।

এদিকে ভারতের রাজনৈতিক গগনে এক নতুন ঝঞ্চা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে, বিশেষ ক'রে ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় অর্থনীতিক সঙ্কট মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতেও তা পরিস্ফুট। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলেছে। বাংলাদেশের মানসিকতায় তখন 'মারো না হয় মরো'-র ধ্যানধারণা এই মনসিকতার পরিপূর্ণ চিত্র কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে— 'বিদ্রোহী' কবিতায়।

এই সময়ে ভারতে একটি নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারা দানা বাঁধতে লাগল— এই চিন্তাধারা হল আন্তর্জাতিকতাবাদ। ভারতের মানুষ, বিশেষ ক'রে বাংলার মানুষ দেশবিদেশের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল। নজরুলের কবিতায় তার পরিচিতিই আমরা পাই।

সাম্যবাদের ধ্যানধরণাও এই সময়ে দেখা দিতে লাগল। সোভিয়েত বিপ্লব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারের ফলে এদেশবাসীর মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল—রুশ ভল্লুকের তীক্ষ্ণ নখর-দশনের চিত্রই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম তখন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ আমাদের সে আতঙ্ক থেকে মুক্ত করল। এই ভয়মুক্তির ফলেই আমরা সোভিয়েত দেশের রাজনীতি, তথা মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলাম। মার্ক্সবাদ দেশের মানুষের কাছে নতুন পথের সন্ধান দিল। নজরুলের কাব্যেই তার বন্দনা প্রথম দেখতে পেলাম। নজরুলের কাব্যেই পেলাম সাম্প্রদায়িক দেষ-বিদ্বেষের সঙ্গে কঠোর লড়াইয়ের প্রেরণা। আবার, নজরুলের সমসময়েই জাগল সাধারণ মানুষের প্রতি সমত্ববোধ—মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার প্রথম ফলশ্রুতি।

ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর ঘটতে লাগল। সেই সঙ্গে কবিরাও নেমে এলেন কঠিন মাটির ওপর। নৈসর্গিক চিত্রের বর্ণনা ছেড়ে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, হর্ষ-বিষাদের কথা তাঁদের কাব্যে ফুটে উঠতে লাগল। শুধু তাই নয়, সমাজ-সংসার সম্পর্কে যে নিস্পৃহতা তাঁদের একদিন ছিল তা পরিহার করে মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামের অংশভাগী তাঁরা হলেন। আর তাই টেনে নিয়ে এল তাঁদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে।

এই ধারাবাহিকতাই জন্ম দিল সুকান্তকে। রবীন্দ্রনাথের একান্ত কামনা—

"এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক্ মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।"

তাই মূর্ত হল সুকান্তের মধ্যে। বিশ্বকবি উত্তরাধিকারীদের কাঁধে যে দায়িত্ব দিলেন সুকান্ত তা পালন করার জন্য এগিয়ে এল। সে গাইল—

"যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।"

শিশুর মুখের খবরের সূত্র ধরে কবি নিস্পৃহ থাকতে পারে নি। কঠিন প্রত্যয়-ভরা মন নিয়ে সে বলছে—

"এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

এই অঙ্গীকার পালনের সংকল্প নিয়ে কবি নিঃসঙ্গ জীবন গ্রহণ করল না, কঠোর কঠিন রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ক'রে নিল—এ রাজনৈতিক সংগ্রাম সমগ্র সমাজের অর্থনীতিক মুক্তি ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে কবির ভূমিকা চারণ কবির ভূমিকা।

"ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো, হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে ;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন॥"

জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়েই কবির কলমে ফুটল—

"শুধু আমরা দৈনন্দিন ইতিহাস লিখি!
তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের—
কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে ?
কিন্তু মনে রেখ তোমাদের আগেই খবর পাই

মধ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমাদের তন্দ্রার অগোচরেও।"

কিন্তু জনতা নির্জীব চেতনাহীন জড়পিণ্ড নয়। পদদলন আর নিপীড়নের হিমশীতল ভার গলে গলে পড়বে—
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব!
শুধু তাই নয়—

"আমার দিন পঞ্জিকায় আসন্ন হোক
বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি ॥"

এমনি ক'রে সুকান্তর অজস্র কবিতায় মানুষের মর্ম-বেদনা প্রকাশিত হল,—গণসংগ্রাম এগিয়ে চলল আর প্রত্যয় আর প্রতিজ্ঞায় তারা কঠোর কঠিন হয়ে উঠতে লাগল, 'সিগারেট' 'দেশলাই কাঠি' 'বিবৃতি', 'সেপ্টেম্বর ৪৬', 'ঐতিহাসিক', 'বোধন'—এই রকম আরো সব কবিতায় জনতার নবচেতনার সাড়া সুপরিস্ফুট। সুকান্তের আর একটি বিখ্যাত কবিতা 'রানার'—মেহনতী মানুষের প্রতীক, যে মানুষ বিপ্লবের বার্তাবহ, সৈনিক প্রতিনিধি। এমনি ক'রেই কবি এগিয়ে চলেছে অগ্রগমনের পথে। তার চলার শেষ নেই। শেষ নেই, কারণ জনতার মুক্তি এখনও অনেক দূরের পথের শেষে। স্বল্পকালের জীবনে সুকান্ত অগ্রগমনের পথের সন্ধান দিয়েছে তার কবিতায়। সেই পথ ধরে এগিয়ে যাবে কোন সে কবি? বাংলা সাহিত্যের বিকৃতমনা স্খলিতচরিত্র তথাকথিত কবিকুলের কাঁটা-ঝোপের বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসবে যে কবি তার জন্য বাংলাসাহিত্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে।
তার আবির্ভাবের উষা কবে?

অমল প্রার্থনার দিনগুলি ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।"—সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুকান্তর সমস্ত জীবনটাই আমার কাছে এই কবিতার সঙ্গে একাত্ম বলে মনে হয়। তাঁর সমস্ত বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত একটিই, শিশু-মানুষের প্রার্থনা, আলো এবং উত্তাপের জন্য, যে উত্তাপে রাস্তার উলঙ্গ ছেলেটাও আবার নতুন ক'রে বেঁচে উঠবে। এই শিশু-মানুষের পৃথিবীকে কোনোদিনই সে অতিক্রম করতে পারে নি। যে বয়সে পারতো, অর্থাৎ যে বয়সের অভিজ্ঞতায় সেও আমাদের মতোই বুড়িয়ে যেতে পারতো, তার আগেই সুকান্ত এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। ফলে, তাঁর কবিতায় রূপকথার পরশপাথর সকল সময় লেগে আছে। সে বিদ্রোহী, কিন্তু ঐ বিদ্রোহ অনেক সময়েই অতিশয় সরলরেখায় অগ্রসর হয়; তাতে আশাভঙ্গের তিক্ততা ততটা নেই, যতটা আছে স্বপ্ন দেখার আনন্দ। কিন্তু বয়েস বাড়লে কবিরও এই অভিজ্ঞতা হয় যে প্রার্থনা শেষ পর্যন্ত ভিক্ষা, বিদ্রোহ বহু সময়ে শিশু-মানুষের দিবাস্বপ্ন।

সুকান্তর বয়স বাড়ে নি। সময়কে ফাঁকি দিয়ে চিরদিনের জন্যই অমর। তাঁর প্রার্থনা শেষ পর্যন্ত প্রার্থনাই; কোনো দিনই তা নিজের এবং পারিপার্শ্বিকের অস্তিত্ব-রক্ষার জন্য ভিক্ষা হবে না। দ্বিখণ্ডিত দুই বাংলায় কুড়ি বছরের শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস তাঁর লেখনীতে কখনোই সেই ক্লান্তি আনবে না যা তাঁর সমকালীন সকল কবিকেই মাঝেমধ্যে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে।

এই জন্যেই সুকান্তর কবিতা, আমাদের এত বেশী ভাল লাগে, বিশেষ ক'রে ক্লান্তির দুঃসহ দিনগুলিতে। কেননা ঐ সকল কবিতা অমল মানুষের রচনা, যে মানুষের বয়েস কোনোদিনই রূপকাহিনীর বয়েস ছাড়িয়ে বুড়ো হয় না। কিশোর সত্যকামের মতোই যে যমকে প্রশ্ন করার স্পর্ধা রাখে; এবং যম যাঁকে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অমর করে।

সুকান্ত ॥ সুকুমার মিত্র

শীর্ণ শ্যামবর্ণ একটি ছেলে। বাংলাদেশের পথেঘাটে হামেশাই এমন ধরনের কত ছেলেই চোখে পড়ে। প্রতিভার কোনো বহির্লক্ষণ নেই। কে বলবে এই সেই সুকান্ত, যে কৈশোরেই সারা বাংলা দেশে চমক লাগিয়ে দিয়েছে আগুন-ঝরানো কবিতা লিখে! তাকে দেখলেই আমার মনে পড়ত জঁা ক্রিশতফের সেই পঙ্গু

কিশোরকবির কথা। বাইরে থেকে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু অগ্নি-আখরে লেখা তার কবিতার লাইন বিদ্রোহ আর বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিত প্রাণ থেকে প্রাণে, দিক থেকে দিগন্তরে।

কিশোর কবি চ্যাটারটন আত্মহত্যা করেছিল নৈরাশ্যে, ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ে। সুকান্ত মশাল হয়ে জ্বলে গিয়েছিল জীবনের জয়গান গেয়ে, মানুষের জয়যাত্রার পথকে আলোকিত করতে।

এত অল্প বয়সে এত পরিপক্ক কবিতা পৃথিবীতে কেউ কখনো লেখে নি। এত প্রচণ্ড অথচ এত সংযত সংহত ও কবিতা-কীর্তি সুদুর্লভ। "মনে হয় আমিই লেনিন"—এই লাইনটির মতো প্রচণ্ড আবেগবিধৃত ও তাৎপর্যসহ লাইন রবীন্দ্রনাথের "পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ" ছাড়া সমগ্র বাংলা কাব্যসাহিত্যে বোধহয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুকান্ত-জীবন ও রচনা পঞ্জী ॥ দেবকুমার বসু

সেদিন ছিল শ্রাবণ মাসের শেষদিন অর্থাৎ ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৩ সাল। দাদামশাই সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ৪২নং মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ির দোতলার ছোট্ট একটা ঘরে সেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। বাবা নিবারণ-ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতি দেবীর দ্বিতীয় পুত্র তিনি।

শিশুকাল কেটেছে বাবা জেঠামশায়ের একান্নবর্তী পরিবারে বাগবাজারে নিবেদিতা লেনের একটি বাড়িতে।

'রমলা'-খ্যাত সাহিত্যিক মণীন্দ্রলাল বসুর গল্প 'সুকান্ত'র নামেই তাঁর নাম রেখেছিলেন জেঠতুতো দিদি রাণীদি।

এরপর বাগবাজারের নিবেদিতা লেনের বাড়ি ছেড়ে বেলেঘাটার ৩৪নং হরমোহন ঘোষ লেনে নিজেদের বাড়িতে আগমন। সুকান্তর সাত-আট বছর বয়সে বাড়ির সকলের প্রিয় রাণীদির অকস্মাৎ মৃত্যু এবং সুকান্তর বাবা ও জেঠামশায়ের পরিবার পৃথক হয়।

ন-দশ বছর বয়সে প্রচুর ছড়া লিখে আত্মীয়স্বজনের কাছে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। এই সময় স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় কমলা বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হন।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররা হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছিল যার নাম রেখেছিলেন সুকান্ত—'সঞ্চয়'। এরজন্য একটি ছোট হাসির গল্পও দিয়েছিলেন তিনি।

বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিখা' পত্রিকায় সুকান্তর প্রথম মুদ্রিত লেখা প্রকাশিত হয়। গদ্য লেখা। বিবেকানন্দের জীবনী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠকালে, 'ধ্রুব' নাটিকায় নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন সুকান্ত।

এর কিছুকাল পর সুকান্ত তাঁর মাকে হারান। এই সময় সুকান্ত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

এগারো বছর বয়সে 'রাখাল ছেলে' নামক একটি রূপক গীতিনাট্য রচনা করেন। 'হরতাল' গ্রন্থে সংকলিত। বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় 'সপ্তমিকা' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকার সম্পাদনা করেন সুকান্ত। সহযোগিতা করেন কবি অরুণাচল বসু।

১৯৪১ সালে রেডিওতে গল্পদাদুর আসরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। রবীন্দ্রপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে রেডিওতে গল্পদাদুর আসরেই সুকান্তর নিজের লেখা কবিতা পঠিত হয়েছিল। সম্ভবত তিনি নিজেই পাঠ করেছিলেন। এছাড়া গল্পদাদুর আসরের সভ্যদের লেখা গান হিসাবে সুকান্তর লেখা গান পঙ্কজকুমার মল্লিক গেয়েছিলেন।

ব্যাডমিণ্টন খেলা সুকান্তর খুব প্রিয়খেলা ছিল এবং খেলতেনও বেশ ভালই।

বেলেঘাটার স্টুডেন্টস লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সুকান্ত।

১৯৪১-৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কসবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। সেই থেকে তিনি আজীবন এই চিন্তাধারায় বিশ্বাস রেখে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে উৎসর্গীত হয়েছিলেন। রাজনীতি-কর্ম শুরু হয় ১৯৪২-এর গোড়ার দিকে।

গোলাম কুদ্দুস সম্পাদিত 'একসূত্রে' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সুকান্ত'র 'জনযুদ্ধের গান'।

১৩৫০-এর মন্বন্তর-এ দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ।

১৩৫১ সালে মন্বন্তর-এর পরিপ্রেক্ষিতে 'আকাল' নামে একটি কবিতা সংকলন সম্পাদনা করেন।

এই সময়েই 'কিশোর বাহিনী' নামে সারা বাংলাদেশে কিশোর সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন সুকান্ত এবং স্বাধীনতা পত্রিকার 'কিশোর সভা'র বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

১৯৪২-এর শেষে হরমোহন ঘোষ লেন ছেড়ে ২০ নং নারকেলডাঙ্গা মেন রোড-এ উঠে আসেন সুকান্তরা। ১৯৪৪-এর শেষে কাশী যান। এই সময়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন সুকান্ত।

১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন।

১৯৪৫ ও ১৯৪৬-এ যতগুলি গণআন্দোলন হয়েছে সবগুলিতেই সুকান্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯৪৬-এর মাঝামাঝি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন সুকান্ত। কমিউনিস্ট কর্মীদের বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র রেড-এড্ কিওর হোমে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। ১০নং রডন স্ট্রীটে। ১৯৪৬-এর পূজাসংখ্যা স্বাধীনতায় "সেপ্টেম্বর ১৯৪৬" নামে একটি কবিতা লেখেন।

১৯৪৬ আগস্ট-এ বিখ্যাত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ চট্টগ্রাম লুণ্ঠনের বীর বিপ্লবীরা ছাড়া পেয়ে (গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ) হাসপাতালে সুকান্তের সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তাঁকে অভিনন্দন জানান। এর কিছুদিন পর পার্ক-সার্কাস রেড-এড্ কিওর হোম থেকে বাড়ি আসেন। সেখান থেকে তাঁর মেজদা রাখাল ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে ও মেজবৌদির শুশ্রূষাধীনে শ্যামবাজারে থাকেন কিছুদিন। সেখান থেকে যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল।

আধুনিক বাংলা কবিতার ইংরেজী সিগনেট প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন ও ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত "ঘুম তাড়ানো ছড়া"য় সুকান্তর কবিতা সংকলিত হয়েছিল।

যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে পেয়েইং বেডেই ছিলেন সুকান্ত। এল. এম. এইচ. ১নং বেড। সেখানেই ১৩৫৪ সালের ২৯শে বৈশাখ অর্থাৎ ইংরেজী-১৯৪৭ মে মাসে সুকান্তর মৃত্যু হয়।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত বইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কবিতার নাম এবং তার আরম্ভের লাইনগুলি দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ রচনাপঞ্জী এখানে উল্লেখ করা হল।